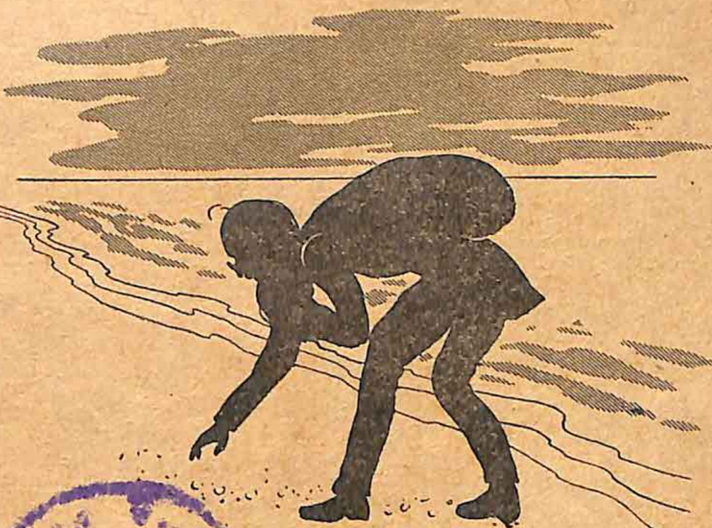
স্বপনবুড়োর
গল্প-সঞ্চয়ন

স্বপনবুড়োর গল্প-সঞ্চয়ন



স্বপনবুড়ো

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দাম : সাড়ে তিন টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস লিমিটেড
১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা-৬

ডাঃ সুশীল দাশগুপ্ত
শ্রীমতী শান্তি দাশগুপ্তা
প্রীতিভাজনেষু

শুভার্থী
রাঙাদা

স্বপনবুড়োর অন্যান্য বই

সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে	২॥০	বন-পলাশীর ক্ষুদে ডাকাত	২৲
এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গ ভরা	২।০	এশিয়ার নৃত্য ছন্দ	১।০
স্বপনবুড়োর ছড়া	১॥০	বেপরোয়া	২৲
স্বপনবুড়োর হাসির গল্প	১॥০	শ্রেষ্ঠ গল্প	২৲
ধন্যি ছেলে	২৲	প্রতিশোধ	১৲
পঙ্ক থেকে পদ্ম জাগে	২৲	আত্মহত্যা	১৲
বাস্তুহারা	৪৲	শশী শ্যামলের সাঁকো	২॥০
		স্বপনবুড়োর হুল্লোড়	২॥০
		বাপ্পাদিত্য	১৲
		মহাপূজা	১৲

ছোটদের গান ও স্বরলিপি (যন্ত্রস্থ)

সূচীপত্র

বৈজ্ঞানিক কাহিনী ঃ ... ...

গ্রহে উপগ্রহে ১

শিক্ষামূলক কাহিনী ঃ

প্রতিশোধ ৫২

আকাশ পাতাল ৭০

বন-মহোৎসব ৭৮

কৌতুক কাহিনী ঃ

বরযাত্রীর বিপদ ৮৬

বদলে গেল থঞ্চা ৯১

গান বনাম নাক ৯৬

অভিযান কাহিনী ঃ

নিশিপট ১০৩

রূপকথা ঃ

পরীর দৃষ্টি ১৪৫

বিদেশী রূপকথা ঃ

মিশরের উপকথা ১৭০

করুণ কাহিনী ঃ

স্বপ্ন ১৭৭

দিদিমার পদ্মকাঁথা ১৮৭

সভাপতির গলার মালা ১৯৭

স্রোতের ফুল ২০৮

পিদিম ২০৮

ভূতুড়ে গল্প ঃ

নিশির ডাক ২৩১

বৈজ্ঞানিক অভিযান কাহিনী

গ্রহে উপগ্রহে

এক

অরুণের আজ কার মুখ দেখে ঘুম ভেঙেছিল কে জানে ? খুব সকালেই ওর ঘুম ভাঙে ! তখনো আকাশের আলো-আঁধারী ভাব কাটেনি।

দরজা খুলে বেরুতে যাবে পা পড়ল গিয়ে চৌকাঠের ধারে শোয়া বেড়ালটার ল্যাজের উপর। ফ্যাস করে ও এমন আঁচড়ে দিয়েছে পায়ে—যার জন্যে তখনও অরুণের পা-টা জ্বলছে। তারপর পিসিমার যেমন কাণ্ড। পূজা করবে করো—কিন্তু সিঁড়ির ওপর কে তাকে কলার খোসা ফেলে রাখতে বলেছিল ? ফলে একেবারে 'পা পিছলে আলুর দম' ! মাথাটা সেজন্যে এখনো ঝিম্‌ঝিম্ করছে !

তারপর ক্ষ্যান্ত ঝিরই বা কি বুদ্ধি! রোজ দাঁতন থাকে চৌবাচ্চায় ডোবানো—তাই বা ও আনতে যাবে না কেন? কিন্তু ক্ষ্যান্ত ঝি সেই চৌবাচ্চায় যে আবার সিঙ্গি মাছ জিয়িয়ে রেখে গেছে তা অরুণ জানবে কেমন করে? যেমন দাঁতনের জন্যে হাত ডোবানো অমনি এমন জোরে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছে—যে ও মনে করল বুঝি বা সাপেই কামড়ালো! হাত তুলে দেখে রক্ত ঝরছে। কোন রকমে ন্যাকড়া দিয়ে সেটা বেঁধে ফেলে ভাবলে পাশের বাড়ীতে গিয়ে দেবলের সঙ্গে খানিকক্ষণ লুডো খেলবে!

খেলার কথা মনে হতেই বেশ একটা উৎসাহ পেলো। স্কিপিংএর দড়িটা নিয়ে লাফাতে লাফাতে যেই খানিকটা এগিয়েছে অমনি পেছন থেকে ডাক এলো—অরুণ, তোকে আজ বাজারে যেতে হবে—চাকরটার আবার জ্বর হয়েছে। ডাকছে তার মা—মা নয় সৎমা। মা তার মরে গেছে ছেলে বয়সেই।

কিন্তু বাজারে যেতে সে ছাড়া আর কেউ নেই? ওই ত বাইরের ঘরে বসে সরকারমশাই ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে তামাক টানছেন। ইচ্ছে করলেই ত' তিনি বাজারের থলিটা নিয়ে বেরুতে পারেন। তার ত' দেবলের মতো বন্ধু নেই—আর লুডো খেলবার ঝোঁকও নেই। এক তামাক খাওয়া! তা বাজারে গেলে অনেক ভালো ভালো তামাক মিলবে।

বাজারে যেতে যে অরুণের খুব আপত্তি তা' নয়—তবে ফিরে এলেই সৎমা এসে হুমকি দিয়ে বলবে, কটা পয়সা চুরি করেছিস শিগ্‌গীর বের কর।

পয়সা চুরি করা ওর স্বভাব নয়—তবু কেন ওকে চোর অপবাদ দেয়া! সেই জন্যেই ত ও বাজারে যেতে চায় না। মায়ের কথাটা

যেন ওর কানে পৌঁছয়নি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে লাফাতে লাফাতে অরুণ এসে দেবলের বাড়ী হাজির হ'ল।

সেখানে খেলা জমতেও বেশীক্ষণ দেরী হ'ল না! দেবলের দুটো ঘুঁটি ও খেয়ে দিয়েছে—নিশ্চয়ই এ বাজীতে ওর জিৎ! এমন সময় শোনা গেল ওর বাবার হুমকি।

ওর বাবা বৈঠকখানা ঘর থেকে ডাকছেন, অরু—

পড়ে রইল খেলা—বাবার ডাকের ভেতর এমন কিছু লক্ষ্য করেছিল—যাতে ওর মনে হ'ল যে একটা বিপদ হয়ত ঘনিয়ে এসেছে।

কিন্তু পণ্ডিতমশাই যে ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তা সে কি করে জানবে বল?

ও ত আর গণৎকার নয় যে হাত গুণে আগে থেকেই সাবধান হয়ে থাকবে!

খবরটা যে এত খারাপ তা নিজেও জানত না। আর সব ছেলেই জানে যে সাতদিন পর প্রমোশন।

পণ্ডিতমশাই যাচ্ছিলেন বাজারে, সরকারমশায়ের তামাকের গন্ধ পেয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। এমন সময় বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি অরুণের পরীক্ষার কথা জিজ্ঞেস করতেই পণ্ডিতমশাই বলে দিয়েছেন, আপনার ছেলে যে সংস্কৃতে মোটে ১৩ পেয়েছে—ও প্রমোশন পাবে কি করে?

এর পরেই বাবার যে হাঁক তাতে বিপদের আভাস থাকবে বৈকি! সে যখন গিয়ে বলির পাঁঠার মতো বাবার বৈঠকখানা ঘরে হাজির হ'ল—পণ্ডিতমশায় তখন দুঃসংবাদ দিয়ে নারদ মুনির মতো সরে পড়েছেন। ওপাশের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সৎমা বল্লে, আমি বল্‌লাম বাজারে যেতে, তা নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে গেল। তবু

যদি বুঝতাম লেখাপড়ায় ভালো ! অমন ছেলেকে ছাই বেড়ে দিতে হয়। বাবা বল্‌লেন, আমি আর পড়াতে পারবো না—এইবার যাও—মাঠে মাঠে লাঙ্গল ঠেলে বেড়াও গে।

অরুণের বুক ঠেলে কান্না আসতে লাগলো। আজ যদি তার মা বেঁচে থাকতেন, তবে সে তাঁর বুকে মুখ রেখে একটু কাঁদতে পারত। বেশ মনে আছে—ও যখন খুব ছোট তখন একবার পড়ে গিয়ে ওর কপালটা কেটে যায়। ওর মা কত যত্নে ওকে বুকে টেনে নিয়ে কপালে পট্টি বেঁধে দিয়ে কত আদর করেছিলেন। সেই আদর, সেই স্নেহের জন্যে ওর প্রাণ হু-হু করে কাঁদতে লাগলো। বাবা বললেন লাঙ্গল চষ্‌তে। লাঙ্গল ঠেলাটাকে ও অপমানের কাজ বলে মনে করে না। কিন্তু জীবনের কামনা যে অন্য রকম। রোজ রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখে—ও হবে প্রকাণ্ড দিগ্বিজয়ী বৈজ্ঞানিক। জান্‌লার ফাঁক দিয়ে দেখে আকাশে কত তারা। ঐ তারার রহস্য সে জান্‌বে—তাদের আবিষ্কার করবে। একবার ইস্কুলের তর্কসভায় সেই কথা ও বলেছিল বলে ছেলের দল ওকে দুয়ো দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে ক্লাসের ছেলেরা অরুণের নাম রেখেছিল "তারকা রাক্ষস"।

কিন্তু সে কথা যাক্—; আজকের দিনের সমস্ত বিপদ কি বিধাতা পুরুষ তার কপালেই লিখে দিয়েছিলেন ? ও বুঝতে পারলে এ বাড়ীর কেউ আর ওকে ভালবাসে না। বাবা বলেছে লাঙ্গল চষতে, মা বলেছে—ছাই খেতে। কি করে আর এখানে ও থাকবে ?

জীবনের ওপর তার আর কোন মায়া থাকলো না। ভাবলে যে দিকে দু' চোখে যায় সেই দিকেই চলে যাবে—

শুধু হাতে, এক কাপড়ে অরুণ চুপি চুপি বাসা থেকে বেরিয়ে

পড়ল। দেবল ওকে দেখতে পেয়ে জানলার ভেতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, অরু খেলাটা শেষ করে যাবিনে? কোথায় যাচ্ছিস এখন? অরুণ কি বলতে যাচ্ছিল···কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না, শুধু ঠোঁট দুটোই একটু কেঁপে উঠল। সে ছুটে এক রকম ওখান থেকে পালিয়েই এলো। কিন্তু কোথায় সে যাবে? এক মাসিমা আছেন, তিনি থাকেন পাটনায়। কিন্তু পরীক্ষায় ফেল করে কোন মুখে তার সামনে গিয়ে হাজির হবে? না, তা' সে কিছুতেই পারবে না। অরুণ আপন মনে পথ চলতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেলে এক জায়গায় কিসের একটা ভিড় জমেছে।

কাছে গিয়ে দেখলে—একটা কাগজের অফিসের সামনের দিকটা। কাগজের নাম "বিশ্বদূত"। গেটের সাম্‌নে একখানা কাগজ টানিয়ে দিয়েছে, যারা পয়সা দিয়ে কাগজ কিনে পড়তে পারে না···তারাই ভিড় করে কাগজ পড়ছে···আর কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন নোট বুকে টুকে নিচ্ছে।

কিন্তু তাকে কে চাকরী দেবে? ম্যাট্রিকও পাশ নয় সে—এই সবে সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে। তবু সে এগিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে কাগজ পড়তে লাগল।

কত রকম খবর বেরিয়েছে কাগজে—

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব। ছেলেমেয়েরা সারবন্দী হয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে চলেছে—তার চমৎকার ছবি—!

সে যদি ম্যাট্রিক পাশ করত আর কলেজে পড়ত, এমনি ব্যাণ্ড বাজিয়ে, নিশান উড়িয়ে সে-ও ত' যেতে পারত। নিখিল ভারত বয়স্কাউটদের জাম্বরী···হবে দিল্লীতে···ছেলেরা স্পেশাল ট্রেনে চলেছে ···চোখে মুখে তাদের কি উৎসাহ···তারো ছবি! সে এর কারো

দলেই নেই! বুকের ভেতর থেকে প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনের দিকে তার চোখ পড়ল। এ ধরণের বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞাপনটি এই :—

যদি কোনো বালক কিম্বা যুবক বিজ্ঞানের জন্যে জীবন উৎসর্গ করিতে চান—নিম্নলিখিত ঠিকানায় সত্বর নিজে আসিয়া দেখা করুন।

সম্পাদক
বিজ্ঞান-মহামণ্ডল
৩৭।১।১এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অরুণের প্রাণ নেচে উঠল।

সে ত এই-ই চায়। সমস্ত জীবন সে বিজ্ঞানের সেবায় কাটিয়ে দেবে। তারপর যখন সে হবে প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক—দেশ-বিদেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়বে—তখন এসে সে তার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করবে। দেখি—মা তাকে ছাই খেতে বলে কি না…বাবা তাকে লাঙ্গল ঠেল্‌তে পাঠায় কি না!

উৎসাহে সে এগিয়ে চল্লো।

এতক্ষণ হয়ত এই বিজ্ঞাপন পড়ে অনেক ছেলে সেখানে হাজির হয়েছে। দেরী হওয়ার জন্যে তাকে যদি তারা না নেয়! তবে কি আবার সে ফিরে ঐ বাড়ীতে ঢুকবে? না—না তার চেয়ে মরে যাওয়াও ভালো…

অরুণের পা ঝড়ের বেগে যেন উড়ে চল্লো…হ্যাঁ এই ত ক্লাইভ ষ্ট্রীট! এই যে সাইত্রিশ নম্বর। কিন্তু ওর চাই…একের—একের এ। বাড়ী খুঁজে নিতে ওর খুব দেরী হ'ল না। কিন্তু দেখ্‌লে এরি

মধ্যে সেখানে বেশ ভিড় জমে গেছে। ইস্কুলের ছেলেদের চাইতে কলেজের ছেলেদেরই ভিড় বেশী। কিন্তু দমবার ছেলে অরুণ নয়··· ভিড় ঠেলে সে দোতলায় একটা ঘরে গিয়ে হাজির হ'ল।

এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে হয়ত সকলের নাম টুকে নিচ্ছিলেন। কিন্তু লোক ক্রমেই বাড়ছে দেখে তিনি একটু বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—আমরা এমন লোক চাই···যে আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে চিরজীবনের চুক্তিতে আমাদের সঙ্গে অন্যত্র চলে যাবে। যাঁর তিন কুলে কেউ নেই···এমন যদি কেউ থাকেন ত' তিনি এগিয়ে আসুন!

এই কথা শোনবার পর ভিড় আস্তে আস্তে কমে এলো। কিন্তু হট্‌লো না অরুণ।

সে ভদ্রলোকের টেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর মাথা উঁচু করে বল্লে, হ্যাঁ, আমি আছি কোথায় যেতে হ'বে বলুন—

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দুই

তারপর হঠাৎ পাগলের মতো হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তুমি এক রত্তি দুধের ছেলে—বিজ্ঞানের জন্যে প্রাণ দিতে এসেছ? কিন্তু তোমার বাবা জান্‌তে পার্‌লে আমাদের জেল হ'বে তা জানো?

অরুণ বড় অভিমানী।

একে সকাল-বেলাকার সেই সব প্রাণে দাগা-দেয়া ব্যাপার, তার ওপর ভদ্রলোক আবার তাকে বল্‌ছেন—'একরত্তি দুধের ছেলে'।

বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে সে বলে উঠল—আমি এক রত্তি দুধের ছেলে নই। দেখেছেন আমার কব্জি! ক্লাসের সব ছেলেকে আমি পাঞ্জায় হটিয়ে দিয়েছি। তারপর তক্ষুনি আবার কি ভেবে তার চোখ দুটো জলে ভরে এলো। বল্লে, আর তা ছাড়া আমার কেউ নেই··· বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে যদি একটা জীবন যায় ত' আমি হাসি মুখে মরতে পারি।

তার মুখে একটা মৃদু-ম্লান হাসি।

ভদ্রলোক খুসী হয়ে উঠলেন। অরুণের পিঠ চাপড়ে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, হ্যাঁ ঠিক এই রকম ছেলেই আমরা চাইছিলুম—বুঝলে?

অরুণও সঙ্গে সঙ্গে খুশী হয়ে উঠল। বল্লে, প্রাণ ত দেবো—কিন্তু কি করতে হবে আমায় বলুন। হঠাৎ কেন যেন ভদ্রলোকের মুখ আমশির মতো শুকিয়ে গেল। তিনি অরুণকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন: দেখো, ঠিক তোমারই মত আমার একটি ছেলে আছে—কোন্ প্রাণে আমি তোমাকে সেখানে পাঠাব?

অরুণ তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললে, না না সেজন্য আপনি কিছু মনে ভাববেন না—মরতে আমি ভয় পাইনা বলেই ত এসেছি ···আর তা' ছাড়া আমার ত কেউ নেই, কেই বা আমার জন্য কাঁদবে বলুন? সব চাইতে বড় কথা এ ত আর অন্য কোনো ব্যাপারে মরতে যাচ্ছি না—যাচ্ছি বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে। সবাই ত একদিন মরবে···কিন্তু আমি মরে অমর হবো—কত বইতে আমার ছবি ছাপা হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা···আমার মরণে যে আবিষ্কার হবে—তার নাম যেন আমার নামে হয়···সেই হবে আমার সত্যিকারের গৌরব।

এতটুকু ছেলের মুখে এইসব কথা শুনে ভদ্রলোকের চোখ আবার জলে ভরে এলো—তিনি দু'হাতে তা' মুছে ফেলে অরুণকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলেন। অরুণ এইবার মুখ তুলে বললে, চুপ করে থাকলে ত আমি ছাড়বো না—কোথায় আমায় যেতে হবে সব খুলে বলুন। ধরা গলায় ভদ্রলোকটি বললেন—সব বলব রে—সব বলব ;—আমার একটু দম নিতে দে—পাছে ভদ্রলোক আবার চোখের জল ফেলেন—এই ভয়ে অরুণ তাকে ভোলাবার জন্য বললে—দেশ-ভ্রমণ করতে আমার খু-উ-ব ভালো লাগে—; আপনি যদি আমায় কোথাও পাঠিয়ে দেন ত আমি আরো খুশী হব।

ভদ্রলোক বল্লেন, হ্যাঁ। কলকাতার বাইরেই তোকে পাঠাবো। আমিও সঙ্গে যাবো—তবে কোথায় নিয়ে যাবো সেটা আজকে বলতে পারবো না! সন্ধ্যের সময় আমার কাছে টেলিগ্রাম আসবে···তারপর সব ঠিক হবে!

আজ খাওয়া দাওয়া করে এইখানে আমাদের অফিসেই তুই থাকবি···তারপর যা হয় আমিই সব জানাবো।

অরুণ তখন এক লাফে তার কাছ থেকে নেমে বললে, বেশ মজা হবে···আচ্ছা, অফিসে আপনারা কি খান?

ভদ্রলোক বল্লেন, কেন আমাদের এক বাচ্চা বামুন আছে—সেই পাশের ঘরে রান্না করে।—বাচ্চা বামুন? অরুণ খুসী হয়ে উঠলো।—আমার সঙ্গে তার ভাব করিয়ে দিন না। ভদ্রলোক হাঁকলেন, রামহরি—

অফিসের স্প্রিঙের দরজা ঠেলে ন্যাড়া মাথা একটি ছেলে ঘরে ঢুকল। অরুণ এগিয়ে গিয়ে বললে, ও! তুমিই বুঝি রামহরি? চল তোমার রান্না ঘরে—এই বলে ভদ্রলোককে আর কোনো কথা

বলবার সুযোগ না দিয়ে রামহরির হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে অফিস ঘরের বাইরে চলে এলো।

সমস্তটা দিন অরুণ রামহরিকে নিয়েই মেতে রইল।

—দূর বোকা! এই বুঝি তোর ইলিস মাছের ঝোল রান্না হচ্ছে? সরে দাঁড়া দেখি আমি রান্না করে দিচ্ছি। রামহরিও তেমনি ...বল্‌লে, তুমিই রান্না করে দাও খোকাবাবু—ঠিক হয় না বলে রোজ বাবু আমায় বকবে—

আজ কেমন বকে দেখি। কিন্তু খবরদার। আমি যে রান্না করেছি তা বাবুকে কিছু বলবিনে, বুঝলি?

সে হামি কুচ নেই বলবে! একদিন পুড়বে—একদিন ত নিমক নেই হোবে, ত' হামি কি করবে খোকাবাবু?

—কিচ্ছু তোকে করতে হবে না—আজ শুধু তুই দেখ কি করে আমি রান্না করি—রোজ সেই রকম রাঁধবি আর তোকে বকুনি খেতে হবেনা—বকুনির কথায় ওর সৎমায়ের বকুনির কথা মনে পড়ে।

আহা বেচারী রামহরি।

সে ওকে এমন রান্না শিখিয়ে দেবে যে জীবনে আর কারো কাছে বকুনি না খেতে হয়।

সমস্তটা দিন ত' এমনি ছুটোছুটি করে কাটল। কিন্তু সন্ধ্যের ঠিক পরেই এলো সত্যিকারের খবর। ছেলেটিকে নিয়ে আজ রাত্রেই সুন্দরবনে রওনা হতে হবে। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে আছে এক মান-মন্দির। এইখানে বসে লোক-চক্ষুর অন্তরালে এক বাঙালী বৈজ্ঞানিক দিনের পর দিন সাধনা করে চলেছেন—বাইরের সভ্য-জগৎ তাঁর কোন খোঁজ রাখে না।

ভদ্রলোকের কাছে সব কথা শুনে অরুণ লাফাতে লাগলো! বল্লে, এই ত' আমি চাই। আমিও করতে চাই বিজ্ঞানের সাধনা—আর আমিও কলকাতা থেকে বহু দূরে চলে যেতে চাই। হঠাৎ কেন যেন তার মনটা ভারী হয়ে এলো।

ভদ্রলোক কিন্তু মহা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং সবাইকে বল্লেন, রওনা হবার জন্যে গোছ-গাছ করতে। তারপর অরুণের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, এইবার তোমার জীবনে সত্যিকারের অভিযান সুরু হল। অরুণ জিজ্ঞেস করলে, কিসে আমরা রওনা হব? ভদ্রলোক জবাব দিলেন, নৌকো আমাদের তৈরীই আছে—তাতেই আমরা উঠে পড়বো।

তিন

অবশেষে নৌকো এসে পৌঁছুলো সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে। লোক চক্ষুর আড়ালে সেখানে যে এক মান-মন্দির থাকতে পারে তা না দেখলে ধারণা করা মুস্কিল। খালের ধারে উঁচু সেই মান-মন্দির। চারদিকের গাছপালা দিয়ে ঢাকা, বাইরে থেকে হঠাৎ কারো নজরে আসে না।

অরুণদের নৌকো সেই মন্দিরের পেছনে একটা বিরাট বটগাছের সঙ্গে নোঙর করলে।

সেখানকার রাস্তাটা অতি দুর্গম। বটগাছের সব ঝুরি নেমেছে—তাই ধরে ধরে এক রকম ঝুলে ঝুলেই উঁচু পাড়ের ওপর উঠতে হবে।

অরুণের স্কুলের "জিম্‌নাসিয়ামে" নানারকম কসরৎ শেখা ছিল—তার উঠতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না, কিন্তু গোলমাল লাগলো

ভদ্রলোকের নামা নিয়ে। এদিকে ছু'জন মাঝি পাড়ে নেমে রইল আর পেছনে নৌকো থেকে ছু'জন মাঝি···দোলনার মতো ঠেলে দেবে। ভদ্রলোক একটা ঝুরি বেশ করে দেখে নিয়ে বল্লেন, হ্যাঁরে ছিঁড়বে না ত'? মাঝিরা জবাব দিলে, আজ্ঞে না কর্ত্তা, ও খুব শক্ত আছে—আপনি ঝুলে পড়ুন মা দুর্গা বলে—

সত্যিই দুর্গা নাম উচ্চারণ করে ভদ্রলোক ঝুলে পড়লেন, নৌকোর মাঝিরা প্রাণপণে দিলে ঠেলে—কেন-না অত বড় দেহটাকে পাড়ের ওপর আনলে তবে না ওপরকার মাঝিরা লুফে নেবে!

দেহটা কিন্তু ওপর পর্য্যন্ত পৌঁছুল না—তার আগেই খালের জলে ঝপাং!

সঙ্গে সঙ্গে কাশেম আলি চীৎকার করে উঠল—ইয়া—আল্লা!

ভাগ্যিস ভদ্রলোক সাঁতার জানতেন—জোরালো চুবন্ খেয়ে তাড়াতাড়ি একটা দড়ি পাক্‌ড়ে ধরলেন। মাঝির দল তখন আবার তাঁকে টেনে নৌকোয় তোলে।

যাক্ অনেক কষ্টে ত অবতরণ পর্ব্ব শেষ হলো। ওপরে উঠে আবার আর এক ফ্যাসাদ। তখন নিশুতি রাত বল্লেই হয়।

সব নিঝ্‌ঝুম। গাছের পাতাটি নড়ছে না। কিন্তু মান-মন্দিরের দরজায় ও একটা কি জানোয়ার ঘোরাঘুরি করছে?

ভদ্রলোক বল্লেন—সর্ব্বনাশ! ওযে বাঘাটা। অন্যান্য বার দিনের বেলায় এসে নৌকো পৌঁছে। কিন্তু বাঘাটা রাত্তিরে ছাড়া রয়েছে দেখছি। ও যদি হুমকি দিয়ে একবার আসে তবে আর রক্ষা নেই।

যে কথা সেই কাজ!

ভদ্রলোকের ভিজে কাপড়। বেশিক্ষণ দাঁড়াতেও পারেন না।

এক পা, দু' পা করে খানিকটা এগুতেই বাঘাটা র‍া—র‍া শব্দে লাফিয়ে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের কি বিকট চীৎকার! জানোয়ার আর মানুষের সমবেত চীৎকারে বুঝি ওপরকার ঘুম ভেঙে গেল।

অরুণ চেয়ে দেখলে হঠাৎ দোতলার একটা জান্‌লা গেল খুলে। ভেতর থেকে একটা মাথা উঁকি মারলে। চাঁদের আলোতে যেটুকু দেখা যায় তাতে বোঝা গেল, এ রকম থুত্থুড়ে বুড়ো অরুণ জীবনে দেখেনি। বুড়ো মোটা গলায় শুধোলেন—কারা ওখানে দাঁড়িয়ে?

ভদ্রলোক শীতে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লেন, আজ্ঞে আমি "X2"

অরুণ বুঝলে, ভদ্রলোক নিজের নাম বল্‌লেন না—হয়ত বল্‌লেন একটা সাঙ্কেতিক সংখ্যা।

ওপর থেকে আওয়াজ এলো, আচ্ছা দাঁড়াও—তারপর সঙ্গে সঙ্গে আবার জানালা বন্ধ হয়ে গেল।

কি রকম যেন থম্‌থমে ভাব। সময় যেন আর কাটতে চায় না। মনে হচ্ছিল—অনেকক্ষণ তারা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড এই যে, ওপর থেকে গলার আওয়াজ পেয়ে বাঘাটা শান্ত হয়ে গেছে···আর আক্রমণ করবার চেষ্টা করে নি!···তবে সদর দরজার সামনে শুধু টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আরো কিছুক্ষণ সময় কাটলো।

তারপর নীচের সদর দরজার ফাঁক দিয়ে একটা ক্ষীণ আলোক দেখা গেল।

তারপর—না এবার সত্যি সত্যিই সেই বিশাল দরজাটা খুলে গেল।

থুত্থুড়ে এক বুড়ো—বয়েস তার আশীও হতে পারে দু'শও হ'তে পারে। ঠাহর করা মুস্কিল। কিন্তু অত বয়সেও দেহের বাঁধন চমৎকার আছে, যদিও মাথার চুলে, গোঁফ দাড়িতে—ভ্রূর চুলে এক ফোঁটা কালোও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু দেখবার মত তার চোখ দুটি। মনে হয় কত বছর ধরে এই নির্জ্জন অরণ্যের ভেতর কি সাধনায়ই না মগ্ন রয়েছে।

এই চোখ দুটোতে যেন পৃথিবীর কিছু চোখে পড়ে না—অসীম অনন্তে, কি অনাবিষ্কৃত রহস্যে সে মগ্ন তা কে বল্‌তে পারে?

বৃদ্ধের হাতে একটা মোমবাতি। শেষ রাত্তিরের মৃদু বায়ুতে তা কাঁপছে...

বাঘাটা একবার গিয়ে তার পায়ের কাছে ল্যাজ নাড়লে। বৃদ্ধ মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আদর করলেন। তারপর ভদ্রলোককে নীরবে তাঁর অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করলেন। প্রথমে চল্‌লেন বৃদ্ধ, তাঁর হাতে কম্পিত দীপশিখা, দেওয়ালের গায়ে দীর্ঘ ছায়া ফেলে চলেছে—তার পশ্চাতে ভদ্রলোক—ভেজা কাপড়ে কাঁপছেন—আর সবার পেছনে কম্পিত-মনে অরুণ।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বৃদ্ধ কাউকে কোনো প্রশ্ন করলেন না। ভদ্রলোককে ভিজে কাপড়ে থাক্‌তে দেখেও তাঁর মুখ থেকে যেমন কোনো কথা বেরুলো না—তেমনি নবাগত কিশোর-তরুণও হয়ত তার মনে কোনো রেখাপাত করতে পারে নি!

বৃদ্ধের মন কোন্ গভীর রহস্যের পারে পারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে বলতে পারে?

কতকগুলি প্রাঙ্গণ আর অলিন্দ পার হয়ে এসে সামনের একটি খোলা কক্ষ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ আবার কোন্

দিকে চলে গেলেন—দেখে অরুণের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না।

কক্ষের ভেতরটা আলো-আঁধারীতে একটা থম্‌থমে ভাব।

যতটুকু চাঁদের আলো এসে ভেতরে পড়েছে তাতে দেখা গেল—ঘরের ভেতর দুটি বিছানা পাতা আছে।

দেহের চাইতে অরুণের মন পরিশ্রান্ত হয়েছিল বেশি। বিশেষ করে এখানকার রহস্য-জনক আবহাওয়াকে সে ভয়ের চোখেই দেখতে লাগলো।

হঠাৎ দেখা গেল, ঘরের দরজা ঠেলে একটা কালো ও কুৎসিত লোক মেঝের ওপর দুটো ডাব আর সামান্য কিছু ফলমূল রেখে আবার অদৃশ্য হলো।

কিন্তু এরা কথা কয় না কেন?

অরুণের মনে হলো, এই নীরবতার চেয়ে ভীষণতর বুঝি আর কিছু হতে পারে না।

আস্তে আস্তে অরুণ গিয়ে একটা বিছানার ওপর দেহ এলিয়ে দিলে।

কিন্তু মনে যখন প্রচণ্ড ঝড় বইছে—তখন চোখের পাতায় ঘুম আসবে কি করে?

সে ভেবেছিল ভদ্রলোক এখুনি জামা কাপড় ছেড়ে এই ঘরে চলে আসবেন! কিন্তু তাঁরও আর দেখা নেই। বাইরে দূরে একটানা ঝিঁ-ঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে।

সে উঠে একবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালে—; বনের ভেতর অসংখ্য জোনাকী কেবল জ্বলছে আর নিভছে। যেন আগুনের হরির-লুট চলছে।

কিন্তু এ কাল-রাত্রির কি শেষ নেই?

খানিকক্ষণ বাদে অরুণের মনে হতে লাগলো, এই নীরবতায় ধীরে ধীরে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এরকম অবস্থায় সে জীবনে কখনো পড়ে নি! হয়ত ডাক ছেড়ে কিছুক্ষণ কাঁদতে পারলে ওর শরীরটা সুস্থ হ'ত! কিন্তু কান্নাও ত আসে না।

ও চীৎকার করবার চেষ্টা করলে—গলা দিয়ে কেমন একটা বিকৃত সুর বেরুল—যা শুনে ও নিজেই চমকে উঠল। অরুণ আস্তে আস্তে উঠে বস্‌ল! আকাশে রাশি রাশি তারা। সে অবাক হয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল। ওরা বুঝি অনেক নীচে নেমে এসেছে। ওরা বুঝি অরুণের সঙ্গে কথা কইতে চাইছে!

সে অবাক হয়ে দেখলে—এক-একটা তারার ভেতর এক-একটা চেনা মুখ।

তার মা, বাবা, পাশের বাড়ীর ছেলেরা, স্কুলের মাষ্টারমশাই, ক্লাশের দুষ্টু ছেলেটা···সবাই যেন তারার জান্‌লা ফাঁক করে উঁকি মেরে তাকে দেখছে।

এ সব সত্যি না স্বপ্ন?···না সে ভূতুড়ে বাড়ীতে এলো?

অরুণের মাথার ভেতরটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।

ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো—চীৎকার করে কাকে ডাকতে গেল—কিন্তু গলা দিয়ে এতটুকু শব্দ বেরুল না!

প্রাণপণে ছুটলো সে সোজা বারান্দা দিয়ে!

যত সে পা ফেলছে—পা দুটো যেন আর কিছুতেই এগোতে চায় না।

ঝড়ের বেগ এলো তার সমস্ত দেহে। বারান্দার পর বারান্দা সে পেছনে ফেলে ছুটল।

কিন্তু এ বাড়ীরও কি শেষ নেই ? সে পায়ের গতি আরও বাড়িয়ে দিলে। হঠাৎ একখানা কালো কুৎসিত হাত তার গতি রোধ করে দাঁড়ালো।

অরুণ চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলে, সেই বিকৃত চেহারার লোকটা, যে তাদের ঘরে ডাব আর ফলমূল দিয়ে এসেছিল !

মাথাটা কেমন যেন ঝিম্-ঝিম্ করে উঠলো। পরক্ষণেই অরুণ সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল !

চার

পরদিন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক অরুণকে এক নির্জ্জন ঘরে ডেকে পাঠালেন। আজ দিনের আলোতে তার দিকে তাকিয়ে অরুণ অবাক হয়ে রইল। পাঠ্য-পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের ছবি ওরা কত দেখেছে ! আজ যদি কেউ বলে দিত যে, এই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথের ভাই তবে অবিশ্বাস করবার একেবারেই যো ছিল না। এমন অপরূপ সৌম্য মূর্ত্তি তাঁর ! প্রথমে বৃদ্ধই কথা বললেন, সে কথা যেন পৃথিবীর কথা নয়—সুদূর নক্ষত্র-লোক থেকে সে কথা যেন ভেসে এলো। বৈজ্ঞানিক বললেন, তোমারই মতো এক কিশোরকে আমি এতদিন ধরে কামনা করছিলাম, তাই বহু উৎসাহী তরুণকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। শোনো তোমায় বলি। তোমার এখন স্বপন-পুরীর স্বপ্ন দেখার বয়েস, আর আমি স্বপ্ন দেখি নীলাকাশের নক্ষত্র-লোকের। কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলি শোনো। আমার দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সাধনায় মঙ্গল গ্রহ থেকে এমন ইঙ্গিত পেয়েছি যাতে মনে হয়েছে যে, মঙ্গল গ্রহে মানুষের চাইতে বুদ্ধিমান জীব বাস করে। আমি অদ্ভুত

এক হাউই জাহাজ তৈরী করিয়েছি, তারই ভেতর দিয়ে পৃথিবীর এক কিশোরকে সুদূরের মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়ে দিতে চাই। তোমার সব কথাই আমি এর মধ্যে জেনে নিয়েছি, এখন আমার জিজ্ঞেস করবার কথা হচ্ছে, তুমি রাজী আছ কি না ?

অরুণের মনে হল সে এমন জোরে চীৎকার করে ওঠে যে, পৃথিবীর সমস্ত লোক এক সঙ্গে শুনতে পায়। তারা জানতে পারে যে, অরুণ হচ্ছে সেই ভাগ্যবান বাঙালী কিশোর যে, মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটিয়ে মঙ্গল-গ্রহ-অভিযানে রওনা হবে। গ্রহে-গ্রহে তারায়-তারায় জাগবে কম্পন! সৌরজগতের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে সে হয়ে থাকবে অমর। এত কল্পনা, এত আবেগ তার কণ্ঠের কাছে এসে ঠেলাঠেলি সুরু করে দিল যে, মুখ দিয়ে তার কোন কথাই বেরুল না, শুধু মাথা নেড়ে সে জানালে যে তার মত আছে।

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। তাঁর দু'চোখ জলে ভরে উঠল। তিনি শুধু মৃদুস্বরে বললেন, আমার আজীবন সাধনায় তুমি সিদ্ধি আনো আজকের দিনে শুধু এই কামনাই করি।

খানিকক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক বললেন, অবশ্য রওনা হবার আগে এক বছর তোমায় শিক্ষা দেবো—আকাশের গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে একটা পরিচয় করিয়ে দেবো—তারপর সুরু হবে কিশোর-বাঙালীর সত্যিকারের অভিযান। আজ সে অভিযান লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকবে বটে কিন্তু সমগ্র সৌরজগৎ একদিন তোমায় অভিনন্দন জানাবে এ বিশ্বাস আমার আছে।...হয়ত তখন আর আমি বেঁচে থাকবো না!

তার পরদিন থেকে সুরু হল—জ্ঞান-বৃদ্ধের কাছে কিশোরের শিক্ষা।

*　　*　　*　　*

এই ঘটনার এক বছর পরের কথা। বৃদ্ধ-বৈজ্ঞানিক অরুণকে ডেকে বললেন, শোন কিশোর, তোমায় একটি নূতন খবর দিচ্ছি। আগামী কাল মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর খুব কাছে আসবে। এই দিনই তোমায় যাত্রা করতে হবে। এই এক বছর তোমায় আকাশের গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছি। আমার হাউই জাহাজ তৈরী করাই আছে, এক বছর আগে সে কথাও তোমায় জানিয়েছি। এইবার তুমি মন স্থির করো।

অরুণ বললে, মন আমার স্থির করাই আছে গুরুদেব। এক বছর ধরে আমি এই শুভদিনেরই প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমার সমস্ত দেহ-মন বৈজ্ঞানিক অভিযানের জন্য দেবতার পায়ে উৎসর্গ করা নৈবেদ্যের মতো রচনা করা আছে, আপনি তাকে আপনার মঙ্গল হাতে তুলে নিন। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক অরুণকে মুখে কিছু বললেন না, শুধু তার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন।

পরদিন এলো সেই শুভ-মুহূর্ত্ত।

কোন খবরের কাগজে এই অভিযানের ব্যাপার নিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হল না। ছেলেদের মাসিক পত্রিকায় অরুণের কোন ছবি ছাপা হল না ; ছেলের দল এক বিরাট শোভাযাত্রা করে অরুণের গলায় মালা ছুলিয়ে দিল না, সুন্দরবনের এক গভীর অরণ্যের মাঝখান থেকে একটা হাউই-জাহাজ পৃথিবার সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে উল্কার বেগে মঙ্গল গ্রহের দিকে ছুটে চললো।

পাঁচ

অসীম শূন্যের একটা বিন্দুর মতো অরুণ নিশ্চিহ্ন হয়ে হঠাৎ করে যেন একটা পাহাড়ের তলদেশে থমকে দাঁড়ালো।

হঠাৎ তার মনে হ'ল কি একটা অদৃশ্য-শক্তি তাকে সামনের দিকে টানছে।

চুম্বক যেমন করে লোহাকে টানে এ ঠিক তেমনি। অরুণ বুঝতে পারলো না, এ শক্তির উৎস কোথায়। সেই আকর্ষণ তাকে পাহাড়ের আরো ওপরে ওঠাচ্ছে না, নীচের দিকে নামাচ্ছে।

সে ক্রমাগত এগিয়ে চল্লো—আরো খানিকটা নামবার পর সে একটা পাকা বাঁধানো রাস্তা পেলে, ধাপে ধাপে তার সিঁড়ি নেমে গেছে একেবারে তলা অবধি।

অরুণ অবাক হয়ে দেখলে সেই অদৃশ্য-শক্তি তাকে সিঁড়ি দিয়েই নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বিপথে আকর্ষণ করছে না।

তার পায়ের তলা থেকে সর্ব্ব শেষ সিঁড়ি যখন ফুরিয়ে গেল সে এসে দাঁড়াল এক সম জমির ওপর—লাল সিমেণ্টের মতো কি একটা পদার্থ দিয়ে রাস্তা বাঁধানো তা যে সিমেণ্ট নয়—সেটা অরুণ বেশ বুঝতে পারল।

নীচে ছুঁচোলো মুখওয়ালা অদ্ভূত ধরণের গাড়ী অপেক্ষা করছিল। মনে হ'ল কে যেন তাকে সেই গাড়ীর ভেতর তুলে দিলে।

সে ওঠবামাত্র গাড়ী বিদ্যুৎবেগে ছুটল। কতক্ষণ গাড়ীর ভেতর ছিল ভালো করে ঠাহর করবার আগেই অরুণ অবাক হয়ে দেখলে, সে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়ে।

অট্টালিকার আকৃতিও অদ্ভূত ধরণের। চারদিকটা গোল, একেবারে সোজা ওপরে উঠে গেছে। তার যে কটা তালা মাথার ওপর তাকিয়ে তা ঠিক বোঝবার যো নেই।

অরুণ সেই অদৃশ্য টানে ভেতরে ঢুকে গেল—একটা যায়গায় পৌঁছুতেই সেই আকর্ষণটা একটু মন্দীভূত হ'ল বলে মনে হ'ল। সে একটা আসনে বসে বিশ্রাম করতে লাগলো।

এতটা রাস্তা সেই রহস্যজনক চুম্বক-শক্তি তাকে নিয়ে এসেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনো প্রাণীকে দেখবার সৌভাগ্য অরুণের হয়নি।

সে বসে বসে ভাবতে লাগলো মঙ্গল গ্রহে জীবিত প্রাণী আছে কিনা এবং তারা দেখতে কেমন!

যখন এই সব কথা ভাবছিল—ঠিক তার পর-মূহূর্ত্তেই সে তাকিয়ে দেখলে, তার বসবার ঠিক দু'হাত দূরে একটি জীবিত প্রাণী তারই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জীবটির আকৃতি দেখে প্রথমটা সে ভারী ভড়কে গিয়েছিল।

মাথাটা দেহের অনুপাতে একটু বড়। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের ছোট, আর নাকটা একটা শুঁড়ের আকৃতি নিয়ে খানিকটা দূর ছুঁচোলো হয়ে নেমে এসেছে।

পৃথিবীতে ঠিক এই ধরণের একটি লোকের দেখা পেলে তাকে হয়ত অরুণ গণেশ ঠাকুর বলে ঠাট্টা করত, কিন্তু এই মূহূর্ত্তে সে যেন হাতে স্বর্গ পেল।

কেন-না মঙ্গল গ্রহে আসার পর থেকে সে কোনও জীবিত প্রাণী দেখেনি এবং জীবিত প্রাণী না দেখা মানে জীবন সম্বন্ধে প্রতি মুহূর্ত্তে সংশয়!

জীবিত প্রাণীর দেখা যখন ও পেলে, একটা বিষয়ের ভাবনা ওর কেটে গেল।

এখন সমস্যা দাঁড়ালো—কথা বলা নিয়ে। মঙ্গল গ্রহে আর যাই চলুক না কেন—বাঙলা অথবা ইংরেজী ভাষা যে চলবে না এটা

ঠিক। এক ইসারা করে মনের ভাব প্রকাশ করা যেতে পারে, কিন্তু সে কতটুকু সম্ভবপর হবে ?

কিন্তু অরুণ যখন এই সব কথা ভাবছে মঙ্গলের সেই লোকটি তার দিকে এগিয়ে এলো, তারপর ধীরে ধীরে তার শুঁড়োলো নাকটা ওর মাথায় ঠেকাল। আশ্চর্য্য !

অরুণ দেহের-শিরায় একটা তীব্র শিহরণ বোধ করল। ইলেক্‌ট্রিক 'শক্' লাগলে যেমন হয় ততটা জোরালো নয়—তার চাইতে মৃদু এবং অনুভূতি সম্পন্ন !

অরুণের আরো বিস্ময় লাগলো যখন সে বুঝতে পারলে এই শিহরণের ভেতর দিয়ে ভাবের আদান-প্রদান চলতে পারে।

কেন না তার বোধ হতে লাগলো মঙ্গলের বাসিন্দা ঐ ভাবে তার মনের কথা জানতে চাইছে। অরুণ সত্যই পুলকিত হয়ে উঠল। অরুণ বুঝতে পারলে এবং বেশ ভালো রকমেই জান্‌তে পারলে মঙ্গলবাসী জানাচ্ছে—সে কোথা থেকে এসেছে তা তাদের অজানা নেই।

অরুণ ভারী বিস্মিত হল।

অরুণকে অবাক হতে দেখে মঙ্গলবাসী আবার তার দেহে নিজের চিন্তা প্রবাহিত করে দিয়ে জানালো যে, বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে মঙ্গলবাসীদের পক্ষে এমন সব কাজ করা সম্ভব যা অন্য গ্রহ-উপগ্রহবাসীদের একেবারে অদ্ভুত বলেই ঠেকবে।

মঙ্গলবাসী সকলের আগে অরুণের ভাষা শেখবার আগ্রহ প্রকাশ করলে এবং এ-কথাও তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, তার ভাষা শিখতে ওর খুব বেশী সময় লাগবে না।

এই কথা জানিয়ে সে তাকে পাশের আর একটা ঘরে আসবার জন্যে ইঙ্গিত করলে।

অরুণের বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। কোথায় সে মনে করেছিল—অজানা-অচেনা গ্রহে এসে পদে-পদে বিপন্ন হবে—অপরিচিত প্রাণী এবং হিংস্র বন্যজন্তুদের কবলে হয় ত ওর বাঁচাই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

শুধু তাই বা কেন? পৃথিবী থেকে এতটা পথ শুধু বিজ্ঞানের বলে সে অক্ষত দেহে এসে পৌঁছেচে—সেই বিজ্ঞান মঙ্গল গ্রহে অসাধ্য-সাধন করেছে ভেবে অরুণের কিশোর-মন ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল।

মঙ্গলবাসীর আহ্বানে সে পাশের ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইল।

সৌর-জগতের সব পরিচিত গ্রহ-নক্ষত্রের মানচিত্র—তার ক্ষুদ্রতম বিষয়ের উল্লেখ করে একটির পর একটি দেয়ালের গায়ে টাঙানো রয়েছে। তার ভেতর তাদের পৃথিবীর মানচিত্রও বাদ যায় নি।

তাতে বলবার কথা এই যে, সে মানচিত্র যেমন সুন্দর তেমনি নির্ভুল। পৃথিবীর মানচিত্র যখন এখানে এমনভাবে বিজ্ঞানের বলে ধরা পড়েছে তখন আশা করা যায় অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মানচিত্র গুলিও সত্যকেই প্রকাশ করেছে।

এইবার অরুণের ভাষা শেখবার পালা। মঙ্গলবাসীদের মস্তিষ্ক এত প্রখর! অরুণের শুধু বলতে যতক্ষণ লাগে। সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত কথা আয়ত্ব করে নেয়—এমনি তার স্মৃতিশক্তি।

ভাষা যখন শেখা হয়ে গেল তখন কথা আদান-প্রদানের পক্ষে আর কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না।

হ্যাঁ, এইখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, অরুণ মঙ্গলবাসীকে বাঙলা ভাষাই শিখিয়ে দিলে।

কেনই বা দেবে না? নিজের মাতৃভাষাকে সর্ব্বপ্রথম অন্য গ্রহে শ্রবণ করার যে প্রচণ্ড গৌরব তার অধিকারী হবে অরুণ। একি কম সৌভাগ্যের কথা!

এখন সুরু হল কথাবার্ত্তা।

অরুণ বল্‌লে, সর্ব্বপ্রথম তার নতুন পরিচিত বন্ধুটির নাম জানা আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে নিজের পরিচয় দিয়ে জানিয়ে দিলে যে তার নাম অরুণ···বাড়ী বাঙলা দেশে।

সঙ্গে সঙ্গে সে পৃথিবীর ম্যাপে যায়গাটা নির্দ্দেশ করতেও ভুলল না।

অরুণ যেন নিজেকে নিজে বিশ্বাস করতে পারছিল না। পৃথিবীর বাইরে গিয়ে—অন্য গ্রহে বসে মানচিত্রে নিজের দেশ দেখিয়ে মনে যে কি বিপুল আনন্দ—তা প্রথম উপভোগ করল বাঙলা দেশে একটি ছেলে, নাম অরুণ।

হয়ত এমন দিন দূর ভবিষ্যতে আসবে যে দিন আকাশ-যান ছুটবে—গ্রহে-গ্রহে তারায়-তারায়—অরুণ হবে তারই অগ্রদূত।

এতক্ষণ ধরে মঙ্গলবাসী অরুণের বিস্মিত মুখখানার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছিল।

হঠাৎ অরুণ তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কৈ ভাই, তুমি তোমার নাম ত' আমায় বললে না!

মঙ্গলবাসী ঠিক তেমনি হাসতে লাগলো। তারপর বললে, দু'হাজার বছর আগে আমাদের এখানেও ব্যক্তি বিশেষকে নাম ধরে

ডাকার প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজ দু'হাজার বছর হতে চললো সে প্রথা উঠে গেছে।

অরুণ কতক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর জিজ্ঞেস করলে, তা' হলে কি বলে তোমাদের পরিচিতদের ডাকো ?

মঙ্গলবাসী জবাব দিলে, এখানকার রাষ্ট্রের ব্যবস্থা অনুসারে সংখ্যা ধরে সবাইকে ডাকা হয়। এই যেমন ধর না—আমি বৈজ্ঞানিক আমার সংখ্যা হচ্ছে বি ৯৭৫৩। যেমন তুমি যদি হও চিকিৎসক তোমার সংখ্যা হয়ত হতে পারে চ ৩২৮৪। এমনিভবে কাজের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে ব্যক্তি-বিশেষের সংখ্যা চিহ্নিত হয়ে থাকে, সেইটে তার পরিচয়। কে বৈজ্ঞানিক, কে ঐতিহাসিক, কে দার্শনিক আর কে কবি তা বোঝবার পক্ষে এতটুকু অসুবিধা নেই।

অরুণ উৎসাহিত হয়ে বললে, এ ত খুব চমৎকার ব্যবস্থা। আমিও তোমাদের দলে ভিড়ে পড়ব।

মঙ্গলবাসী হাসতে হাসতে বললে, আগে আমাদের গ্রহকে চেনো —জানো, দেখবে কত রহস্য লুকিয়ে আছে,...

অরুণ খুসী হয়ে বললে, এ ত আমার জীবনের পরম কামনার কথা। আর এই জন্যেই তো পৃথিবী ছেড়ে আমি এসেছি এই দূর নক্ষত্রলোকে...শুধু বিজ্ঞান-সাধনার সঙ্কল্প বুকে নিয়ে।

কথায় কথায় বহুক্ষণ সময় কেটে গেল। তরুণ জিজ্ঞেস করলে আচ্ছা ভাই, তোমাদের এই গ্রহে পা দিয়েই আমি একটা অদৃশ্য আকর্ষণ অনুভব করেছি। এটা কি ?

মঙ্গলবাসী বললে, এ-ও আমাদের বিজ্ঞানের কথা। একটি মৃদু বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে আমরা আমাদের গ্রহকে সুরক্ষিত রেখেছি।

বাইরের কোনো আক্রমণ যাতে আমাদের গ্রহের কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেইজন্য এই ব্যবস্থা। এই আকর্ষণকে আমরা ইচ্ছে মত বাড়াতে বা কমাতে পারি। যে আকর্ষণে তোমাকে এখানে আনা হয়েছে তা অতি সামান্যই ছিল—কারণ তোমাকে চালিত করার পক্ষে ঐ শক্তিই ছিল যথেষ্ট। যদি কোনোদিন বিজ্ঞানের বলে অন্য কোনো গ্রহের অধিবাসিগণ আমাদের আক্রমণ করে ত' আমরা ঐ অদৃশ্য আকর্ষণকে অসম্ভব রকম বাড়িয়ে দেবো—যা থেকে নিষ্কৃতি পাবার ক্ষমতা কারো থাকবে না।

বাইরের যে কোনো তুচ্ছতম জিনিস এই গ্রহে এসে পড়বে··· এই আকর্ষণী শক্তি এত সচেতন যে সেই মুহূর্ত্তে সে তা টের পাবে। নইলে তুমি এখানে এত তাড়াতাড়ি কি করে পৌঁছুলে? কেননা যেখানে তুমি প্রথম নেমেছিলে এখান থেকে সে জায়গাটা হাজার হাজার মাইল দূরে। এমনি ভাবে আলাপ-আলোচনায় অনেক সময় কেটে গেলে পর অরুণের হঠাৎ মনে হল তার একটু একটু ক্ষিদে পেয়েছে।

একবার ভাবলে এতক্ষণ ধরে যখন কথাবার্ত্তা হচ্ছে এবং সে ভিন্ন গ্রহের লোক—তখন খাবারের ব্যবস্থা এরা নিশ্চয়ই করবে! তবে সে খাবার কি রকম হবে সেইটেই হচ্ছে সমস্যা।

নাঃ—আরো অনেকক্ষণ কেটে গেল—খাবারের কোনো কথাই নেই! আর এখানকার দিনগুলোও এত লম্বা। শেষকালে লজ্জার মাথা খেয়ে অরুণ বলেই ফেল্‌ল যে তার ক্ষিদে পেয়েছে।

প্রথমটা মঙ্গলবাসী তার কথার মর্ম্মই বুঝতে পারলে না।

তখন অরুণ ডানহাতের আঙ্গুলগুলো একসঙ্গে জড়ো করে কিছু মুখের ভেতর পুরে দেবার ইঙ্গিত করলে। তাতেও কিছু বুঝতে না

পেরে মঙ্গলবাসী একটি প্রাচীন গ্রন্থ টেনে বের করলে। তারপর খানিকক্ষণ তার পাতা উল্টে হো-হো করে হেসে উঠল।

অরুণ একটু অপ্রস্তুতেই পড়ল। তখন মঙ্গলবাসী বল্‌লে, পেয়েছি। পাঁচ হাজার বছর আগে আমাদের দেশের লোকেরা খেয়ে জীবন ধারণ করত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দল বহুদিনের সাধনায় সূর্য্য-রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে এমন এক অলৌকিক-আভার সৃষ্টি করেছে যে, তাতে অবগাহন করে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহু বর্ষ ধরে এই খাওয়ার হাত থেকে মুক্তি নিয়ে—নিরোগ হয়ে অনেকদিন ধরে বেঁচে আসছে। এখন আমাদের দেশে খাওয়া বলে কোনো কথা অভিধানে নেই। আমি প্রত্নতাত্ত্বিক পুঁথি পড়ে বিষয়টা জানতে পারলাম।

অরুণ এই কথা, শুনে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার চোখ দুটো দেখলে—তখন তোমাদের পক্ষেও হাসি আটকে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ত।

ছয়

সে-দিন মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক অরুণকে বল্লে, পৃথিবীর লোকের সঙ্গে তুমি কথা বলতে চাও ?

কিছুদিন আগে মঙ্গলগ্রহে খাওয়ার হাঙ্গামা নেই শুনে অরুণ যেমন হাঁ করেছিল বৈজ্ঞানিকের মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনে আজকের মুখের হাঁ-টা আয়তনে আরো বড় হয়ে গেল। বললে, সেটা কি করে সম্ভব ? বৈজ্ঞানিক হেসে বললে, তুমি সে-দিন আমার কাছে

তোমাদের দেশের আলাদিন ও আশ্চর্য্য-প্রদীপের গল্প করলে না? মঙ্গলগ্রহেও আলাদিন ও আশ্চর্য্য-প্রদীপ আছে। সে আশ্চর্য্য-প্রদীপ হচ্ছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান সাধনায় মঙ্গলগ্রহ আজ এতটা এগিয়ে গেছে যে কোন কিছুই আর তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

অরুণের কাছে বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার কথা—ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর পিঠে চেপে রাজপুত্রের তেপান্তরের মাঠ পার হওয়ার কাহিনীর মতোই রোমঞ্চকর মনে হচ্ছিল।

বিস্ময়ের ভাবটা তখনো মন থেকে কাটেনি। জিজ্ঞেস করলে, সত্যি বলছ—আমি এই মঙ্গলগ্রহে বসে পৃথিবীতে আমার গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ করতে পারবো?

বৈজ্ঞানিক মৃদু হেসে জবাব দিলে,—নিশ্চয়ই পারবে। যারা বিজ্ঞান সাধনা করে তারা কখনো পরিহাস করেও মিথ্যা কথা কয় না। সত্যই যে তাদের একমাত্র আশ্রয়।

অরুণ ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কখন আমি কথা বলতে পারবো?

ইচ্ছে করলে এখনই পারবে। তবে তোমার গুরুদেবের মস্তিষ্ক যদি ঠিক ভাবে তোমার চিন্তাধারা গ্রহণ করতে পারে তবেই তা সম্ভবপর হবে—নইলে আমাদের দিন কয়েক অপেক্ষা করতে হবে।

এই বলে বৈজ্ঞানিক অরুণকে প্রকাণ্ড রিফ্লেক্টারের (Reflector) সামনে নিয়ে দাঁড় করালে।

সুন্দরবনের মান-মন্দিরে বসে বৃদ্ধ গুরুদেব আপন মনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছিলেন, হঠাৎ তা'র মনে হলো যে, মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে কি যেন একটা প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। প্রথমটাতে মনে হল অত্যধিক মাথার পরিশ্রম করার জন্যে তাঁর ভয়ানক মাথা ধরেছে।

কিন্তু খানিকক্ষণ বাদেই গুরুদেব বুঝতে পারলেন যে, সে-প্রবাহ এমন ধারাবাহিক যে তাকে কোন গোলযোগ বলে ভুল করা চলবেনা।

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক তখন তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে তাঁর সহকর্ম্মী একজনকে বসিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য সে-ও ঠিক একই রকম প্রবাহ মস্তিষ্কের ভেতর অনুভব করলে।

'গুরুদেবের' মতো প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের তখন এ-টুকু বোঝা কিছু মাত্র কষ্টকর হল না যে, বাইরের কোনো একটা অদৃশ্য শক্তি তাদের মস্তিষ্কে কাজ করছে!

তখন তাঁর আদেশে প্রকাণ্ড একটি 'রিফ্লেক্টর' এনে তাঁর চেয়ারের সামনে বসানো হ'ল। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের এই ধারণা হল যে—যে-ভাবে তীব্র আলোক স্রোত বিকীর্ণ করা চলে—ঠিক সেই প্রথায় কোনো রিফ্লেক্টর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে মস্তিষ্কে কোনো রকম অনুভূতি দেবার চেষ্টা চলছে।

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করলেন যে, যখনি তিনি রিফ্লেক্টরের দিকে পেছন ফিরে বসেন—পশ্চাতের একটা স্নায়ুতে এই প্রবাহ অনুভূত হয়। আবার তখনি সামনে ফিরলে এই ভাবটা মুহূর্ত্তে কেটে যায়।

তখন বৃদ্ধ একেবারে স্থির নিশ্চয় হলেন যে, মস্তিষ্কের পেছনকার কোনো গোপন কোষ এই অদৃশ্য-প্রবাহ গ্রহণ করবার ক্ষমতা রাখে। যাকে ইংরেজীতে বলে (Receiver)! খানিকক্ষণ বাদে বৃদ্ধের মনে হ'ল সেই প্রবাহের গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হঠাৎ বৈজ্ঞানিকের চোখের সামনে একটা অঘটন ঘটল।

বৃদ্ধ দেখলেন, মুহূর্ত্তে তাঁর বিজ্ঞান-গবেষণাগার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। তার পরিবর্ত্তে দেখা গেল গলা পারার মতো তরল শুভ্র

একটা পদার্থে সারা আকাশ ভরে গেছে। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বৃদ্ধ দেখলেন, সেই তরল পদার্থের ওপর মঙ্গলগ্রহের একখানি ছবি ভাসছে!

একটু বাদেই সিনেমার ছবির মতো মঙ্গলগ্রহের মানচিত্র মুছে গেল আর তারই জায়গায় দেখা গেল আমাদের পৃথিবীর একখানি চিত্র।

এইবার আবার সে ছবিও চলে গিয়ে মঙ্গলগ্রহ এবং পৃথিবীর মান৷চত্র পাশাপাশি দেখা গেল এবং আরো দেখা গেল যে, মঙ্গলগ্রহ থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পৃথিবীর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের মতো অভিজ্ঞ লোকের পক্ষে এই সমস্ত দেখে একথা বুঝতে মোটেই কষ্ট হলোনা যে, মঙ্গলগ্রহ থেকে মঙ্গলের কোনো বাসিন্দা পৃথিবীতে বার্ত্তা প্রেরণের চেষ্টা করছে।

কিন্তু কি করে এ জিনিসটা সম্ভবপর হল তা বৃদ্ধ গুরুদেব কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। কেননা পৃথিবীতে বিজ্ঞান যতদূর উন্নতির পথে উঠেছে তাতে এই ব্যাপারটার আশু কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হঠাৎ বৃদ্ধের মনে একটা কথার উদয় হল! যদি অন্য গ্রহের বার্ত্তা তার মস্তিষ্ক গ্রহণ করতে পারে তবে তার চিন্তাধারাই বা অন্য গ্রহে প্রেরিত হতে পারবে না কেন?

এই কথা ভেবে গভীর মনোযোগ সহকারে তিনি নিজের মান-মন্দিরের দৃশ্যের কথা ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ এক সময় উর্দ্ধে তাকিয়ে দেখলেন সেই গলিত পদার্থের ভেতর তাঁর মান-মন্দিরের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।

আনন্দে তিনি লাফিয়ে উঠলেন। কেননা তিনি বুঝতে পারলেন

যে, তাঁর চিন্তাধারার প্রবাহ' বেয়ে মান-মন্দিরের ছবি মঙ্গলগ্রহে যথারীতি পৌঁছে ছিল এবং তারই প্রতিচ্ছবি এই গলিত প্রবাহে পুনরায় প্রতিফলিত হয়েছে—যেমন নাকি ইতিপূর্ব্বে মঙ্গলগ্রহের ও পৃথিবীর ছবি তিনি দেখতে পেয়েছেন ওরই ভেতর।

তিনি আজ কত বড় ভাগ্যবান এই কথা ভেবে এই অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোকও আনন্দে শিশুর মতো লাফাতে সুরু করলেন।

তাঁর সহকারিগণ দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে তাঁর মস্তিষ্কের গোলমাল হয়েছে মনে করে সবাই জোর করে তাঁকে ধরে রাখতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু আনন্দে যার জীবনী-শক্তি বেড়ে গেছে তাকে আটকে রাখা কি সোজা?

যাই হোক অনেকক্ষণ উন্মাদের মতো লাফানোর পর তিনি ধীরে ধীরে শান্ত হলেন এবং সবাইকে জানালেন যে, তিনি মোটেই পাগল হননি। তবে এমন কিছু আবিষ্কার করেছেন যা মানুষকে আনন্দে উন্মত্ত করে তোলে। শান্ত সমাহিত ভাবে তিনি তাঁর অসম্ভব আবিষ্কারের কাহিনী সহকারীদের কাছে জ্ঞাপন করলেন। বহু বর্ষ পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধ যেমন একদিন নির্ব্বাণের কাহিনী তাঁর ভক্তদের গোচর করেছিলেন। তাঁর আবিষ্কার যে একেবারে নির্ভুল এই কথা নিঃসংশয়ে জানবার জন্যে তিনি আবার গিয়ে চেয়ারের ওপর বসলেন এবং নিজের আকৃতির কথাই একান্ত মনোযোগের সঙ্গে চিন্তা করতে লাগলেন। প্রমাণ পেতে বেশী হ'ল না! বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক তাকিয়ে দেখলেন, আগের মতো সেই শুভ্রগলিত পদার্থের ওপর তাঁর নিজের আকৃতি ভাস্‌ছে। তারপর তিনি নিজে খানিকক্ষণ নিশ্চেষ্ট থেকে মঙ্গল গ্রহের নতুন কোনো সংবাদ পাবার আশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে ফুটে উঠল মঙ্গলের সেই বৈজ্ঞানিক

বাসিন্দার ছবি, যিনি···এতক্ষণ ধরে ওখান থেকে বার্ত্তা-পরিচালনা করছিলেন।

আমরা সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই অরুণের দৌলতে বেশ ভাল রকমে পরিচিত আছি। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক অপূর্ব্ব বিস্ময়ের সঙ্গে তার অবয়ব নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং স্থির-নিশ্চিত জানতে পারলেন যে, ইনিই মঙ্গলের বৈজ্ঞানিক....যার কৃপায় সর্ব্ব প্রথম মঙ্গল ও পৃথিবীতে যোগসূত্র গ্রথিত হ'ল।

দেখতে দেখতে একটা ব্যাপার বৃদ্ধের চোখে পড়ল। মঙ্গলের বৈজ্ঞানিকের যে ছবি প্রতিফলিত হয়েছিল তার পেছনে তিনি এমন অদ্ভুত সব যন্ত্র দেখলেন যার প্রবর্ত্তন বা প্রচলন এখনো পৃথিবীতে হয় নি। এই যন্ত্রগুলি যে কি এবং তার কার্য্যকারিতাই বা কি অনেক ভেবে-চিন্তেও গুরুদেব স্থির করতে পারলেন না! যাই হোক তাঁর মান-মন্দির আর মঙ্গলগ্রহের মধ্যে যাতে শব্দ-গ্রহণ ও বার্ত্তা-প্রেরণ সহজসাধ্য হয় তজ্জন্য বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক দুটি রিফ্লেক্টর পরস্পরের ৯০° তে স্থাপন করলেন। প্রথম কিছুক্ষণ ছবির সাহায্যে ভাবের আদান প্রদান চলল। তারপর মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে চলল শব্দের মৃদু-গুঞ্জন। সে যে কোন্ দেশী ভাষা তা বৃদ্ধ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না।

হঠাৎ কয়েকটি বাঙলা শব্দ শুনে বৃদ্ধ একেবারে চমকে উঠলেন। এ কি করে সম্ভবপর হল? অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে দৃষ্টি পড়তেই বৃদ্ধের চোখ পড়ল নতুন আরেকখানি ছবির ওপর। এ যে তাঁরই প্রেরিত—তাঁরই শিষ্য কিশোর অরুণের মুখ। গুরুদেব যেন কিছুতেই আর নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলেন না!

সত্যই কি আজ তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন?

অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তিনি প্রশ্ন করলেন, অরুণ তুমি ? তুমি নিরাপদে গিয়ে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছুতে পেরেছ ? তক্ষুণি তার জবাব এল মঙ্গলগ্রহ থেকে। হ্যাঁ গুরুদেব, আপনার কৃপায় আমি অক্ষত দেহে এসে পৌঁছেই তারপর এমন এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু পেয়েছি যার চেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের একটা স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। আমার মনে হয়, সে বিরাট যজ্ঞের পৌরোহিত্য করতে হবে আপনাকেই।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সেই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক জবাব দিলেন, তুমি যে আশার বাণী শোনাচ্ছ, সে হচ্ছে আমার স্বপ্ন। আমারি দ্বারা সে স্বপ্ন যদি সত্যে পরিণত হয় ত' তার জন্যে দেহপাত করতেও আমি বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হব না।

* * * *

চমকপ্রদ খবরের যে হাওয়ার আগে ছোট্বার ক্ষমতা আছে সে কথা জানা গেল তার পরদিন সকালবেলা, যখন কলকাতার প্রত্যেকটি দৈনিকে মোটা শিরোনামা দিয়ে বেরুল :

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের বিস্ময়কর আবিষ্কার,
মঙ্গলগ্রহের সহিত বার্তা আদান-প্রদান !
সুন্দরবনে রহস্য-জনক মান-মন্দিরের সন্ধান !

এই ঘটনা প্রকাশিত হবার পর বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের বড় অসুবিধা হতে লাগল ! কে যে এই গোপন খবর বাইরে ছড়িয়ে দিলে সে কথা বৃদ্ধ কোনোমতেই জানতে পারলে না ! কিন্তু তাতে ফল হল এই যে, ক্রমাগত বাইরের লোক এসে তাঁর নির্জ্জন গবেষণাগারকে সাধনার অনুপযুক্ত করে তুললো। শুধু তাই নয়, যে সব ভদ্রলোক এসে দেখা করতে চান তাঁদের না হয় বোঝা যায়,

কিন্তু যারা অলক্ষ্যে মান-মন্দিরে প্রবেশ করে গবেষণাগারের গোপন কাগজপত্র হাতড়ে বেড়ায় তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বৃদ্ধ একেবারে উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠলেন! যাঁরা দর্শন-প্রার্থী তাঁদের সঙ্গে দেখা না করলেও চলে, কিন্তু যাঁরা ভদ্রতার ধার ধারে না তাদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার বোধ করি কোন উপায় নেই! মঙ্গলগ্রহের লোক যে বিজ্ঞানে কতটা এগিয়ে গেছে তার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণী কাগজে বেরিয়েছিল। তারপর বহু স্বার্থান্বেষী ভদ্র-চোর গবেষণাগারের জিনিষপত্র প্রতিরাত্রে তচ্‌নচ্‌ করে রেখে যেতে লাগলো।

সেদিন গভীর রাতে বৃদ্ধ যখন খুব সন্তর্পণে মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে বার্তা আদান-প্রদান করছিলেন ঠিক সেই সময় মান-মন্দিরের বারান্দায় অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে একটি বেঁটে আধ-বয়সী জাপানীকে ওঁৎ পেতে বসে থাকতে দেখা গেল।

প্রথমে লোকটা জানলায় কান পেতে কথাবার্ত্তা বোঝবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা হচ্ছিল বলে সে কিছুই ঠাহর করতে পারলে না। কিছু কিছু কথা হচ্ছিল বাঙলা ভাষায়! কিন্তু বাঙলা ভাষা সম্পর্কে ওই জাপানী লোকটির কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না।

আলোচনা হচ্ছিল বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কথা নিয়ে।

আধুনিক পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক দান—যেমন রেডিয়াম, আনবিক-বোমা প্রভৃতি মঙ্গলগ্রহের পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন বলে জানা গেল। আজ মঙ্গলবাসী বিজ্ঞানের বলে এত বলীয়ান যে, গ্রহে-গ্রহে যুদ্ধ সুরু হলে তাদের স্থান সকলের আগে।

নিশুতি রাত—বাইরে একটানা ঝিঁ ঝিঁর ডাক···ঘরের ভেতর

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা চলছিল এগিয়ে, হঠাৎ মঙ্গলের ডাকে পৃথিবী থেকে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মঙ্গলগ্রহ ক্রমাগত বার্ত্তা প্রেরণ করতে লাগলো কিন্তু সুন্দরবনের মান-মন্দির রইল নীরব-নিস্তব্ধ।

এখানে কি অঘটন ঘটল?

সাত

কলকাতার ক্যানিং ষ্ট্রীটের একটি শাখা-গলি। এই গলিরই একটা বাড়ীর তেতলায় জন কয়েক জাপানী গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিল।

চিংফু বললে, এই বাঙালী বৈজ্ঞানিক যে মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে খবর চালাচালি করতে পারে এ সম্বন্ধে আমার আর কোন সংশয় নেই।

লুংচা বললে, আমি কর্ত্তার কাছ থেকে খবর পেয়েই সোজা সুন্দরবনে চলে যাই; সেখানে গিয়েই দেখলাম, যা শুনে গিয়েছিলাম সবই সত্যি। আমি যখন গিয়ে সেই বুড়োর ঘরে ঢুকলাম তখন সে রীতিমত কথাবার্ত্তা চালাচ্ছে।

চিংফু বললে, তুমি বুড়োটাকে ধরে নিয়ে এসে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। তবে এক্ষুনি একটি ভালো জাপানী-বৈজ্ঞানিককে সুন্দরবনে পাঠাতে হবে, যাতে সে আমাদের তরফ থেকে মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে আলোচনা সমানে চালিয়ে যেতে পারে। এক বুড়ো জাপানী এক কোণে বসে আপন মনে চুরুট টানছিল আর মিটমিটে চোখে তাকিয়ে ওদের কথা শুনছিল। সে হঠাৎ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের যে কি হবে আমি মোটেই

বুঝতে পারছি না। চিংফু বললে, বুঝতে না পারবার কোনোই কারণ নেই। মঙ্গলগ্রহ বিজ্ঞানে এতটা এগিয়ে গেছে যে, আজ ওদের অসাধ্য কিছু আছে বলে মনে হয় না। আমরা যদি এই বাঙালী বৈজ্ঞানিককে সরিয়ে দিয়ে মঙ্গলের সঙ্গে একটা সোজাসুজি সম্পর্ক করে নিতে পারি ত' তাদের কাছ থেকে বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য ক্ষমতা আস্তে আস্তে শিখে নিতে পারবো। ফলে এই হবে যে, বর্ত্তমান চীন-যুদ্ধ ত' ছার—গোটা পৃথিবী আমাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। আমরা আজকের দিনে পৃথিবীতে যুদ্ধে যে সব গ্যাস-বোমা বা বিষাক্ত-গ্যাস নিয়ে কারবার কচ্ছি মঙ্গলগ্রহে তার আবিষ্কার হয়েছে পাঁচ হাজার বছর আগে। ভেবে দেখো দেখি, এদের এখনকার আবিষ্কারগুলো কত জোরালো এবং ভয়ঙ্কর হওয়া সম্ভবপর। এইবার বুড়ো জাপনীর কুতকুতে চোখ ছুটো একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে একটু ছুলিয়ে মুখটাকে ফাঁক করে অনেকগুলো ধোঁয়া একসঙ্গে ছেড়ে ঘরটাকে প্রায় অন্ধকার করে দিয়ে বললে, হ্যাঁ, শুনে মনে হচ্ছে বুদ্ধিটা বেশ ভালই করেছ তোমরা।

চিংফু উল্লাসের সঙ্গে টেবিল চাপড়ে বললে, হ্যাঁ, বুদ্ধি আমাদের কখনো খারাপ হয় না।

বুড়ো জাপানীর সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল, সে বললে, বাঙালী বুড়োটাকে তোমরা কোন্ ঘরে রেখেছ? ওর কাছে চমৎকার সিগার আছে, একটা চেয়ে নিয়ে আসি

লুংচা বললে না ওর সঙ্গে আমাদের খাতির জমাবার দরকার নেই। ধরে নিয়ে এসে আটকে রাখবার হুকুম হয়েছে, আমরা তা-ই করেই খালাস। ওর সঙ্গে আমাদের কথা কওয়া পর্য্যন্ত

বারণ। আর তুমি যাচ্ছ সিগার চাইতে? জানো, ও বুড়ো বৈজ্ঞানিক ইচ্ছে করলে সিগারের ভেতর এমন জিনিষ দিয়ে দিতে পারে যার জন্য তোমার প্রাণ নিয়ে পর্য্যন্ত টানাটানি হবে? বুড়ো জাপানীটা এই কথায় ভারী ভয় পেয়ে গেল। বললে, তাহলে ত' সাঙ্ঘাতিক কথা বলতে হবে। ও বাবা! না হয় জন্ম-জন্ম অমন সিগার নাই খেলাম, তবু ওই বুড়ো বাঙালীর সঙ্গে কথা বল্‌ছিনে! বলেই সে আধপোড়া সিগারেটটা আবার মেঝে থেকে তুলে নিয়ে ঠোঁটে চেপে তাতে দেশলাই লাগিয়ে দিলে! বুড়ো জাপানী এখানে আধপোড়া সিগারেটে তেষ্টা মেটাতে থাকুক, আমরা বরঞ্চ ততক্ষণ দেখে আসি বাঙালী বৈজ্ঞানিক কি করছেন।

একটি নোংরা ঘরে ছেঁড়া জাপানী-সুজনীর ওপরে বসে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক আকাশ-পাতাল কি সব ভাবছিলেন। কেন যে জাপানীরা তাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছে তা এই জ্ঞান-বৃদ্ধের বোঝবার বাকী নেই। এই কষ্টকে তিনি কষ্ট বলে মনে করছেন না— কিন্তু সারা জীবনের চরম সাধনার সিদ্ধি যখন এসে সম্মুখে উপস্থিত হল তাকে পুরস্কৃত করতে, সেই মুহূর্ত্তে এই অচিন্ত্যনীয় বিপদ বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে একেবারে মূহ্যমান করে ফেললে। সুরের সঙ্গে যখন অসুরের যুদ্ধ বাধে তখন বোধ করি এমনিই হয়ে থাকে। এই বিপদ থেকে তিনি যে সহজে মুক্তি পাবেন—এদের ভাব-ভঙ্গী দেখে তা মোটেই মনে হয়না। এই রকম নানা কথা যখন বৃদ্ধের মস্তিষ্ককে উত্তপ্ত করে তুলেছিল ঠিক সেই সময় হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে গেল আর তার ভেতরে এসে ঢুকলো বেঁটে-খাটো চিংফু, সঙ্গে তার আর দুটি অনুচর। চিংফু বললে,—

দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকারী কথা ছিল। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক উদাস দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বললে, দরকারীই হোক আর অদরকারীই হোক কথা না শুনলে কি তোমরা আমায় ছাড়বে? সুতরাং ভণিতা রেখে কি বলতে চাও বল?

চিংফু যথেষ্ট বিনয় করে জানালো, দেখুন, কেন মিছে কষ্ট পাবেন এই বুড়ো বয়সে? আপনি আমাদের সঙ্গে জাপানে চলুন, সেখানে আপনার প্রয়োজন মতো আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম গবেষণাগার তৈরী করে দেবো! শুধু একটি কাজ আমাদের জন্যে আপনার করতে হবে।

বক্র দৃষ্টিতে চিংফুর দিকে তাকিয়ে বৈজ্ঞানিক বললেন, সে দরকারটি কি শুনি? চিংফুর মনে একটু আশার সঞ্চার হল। বললে, মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে এমন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আপনি জেনে নেবেন যার জোরে আমরা গোটা পৃথিবীতে যুদ্ধে হবো অজেয়। চিংফু আরো কতকগুলো গালভারী কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বুড়ো তাকে এক ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। বললে, চুপ করো নেংটি ইঁদুরের দল। বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম আলাদা। প্রভূত ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও সে পৃথিবীর লোকের সর্ব্বনাশ করবে না! বৈজ্ঞানিক যা করে তা সকলের হিতের জন্য···তোমরা রাজ্য-লোলুপের দল তাই দিয়ে পৃথিবীর বুকে আনো হিংসা, আনো দ্বেষ, আনো পরশ্রীকাতরতা; কিন্তু আনতে পারো না পবিত্র শান্তিময় জীবন।

চিফুং একথা শুনে রাগে লাল হয়ে উঠলো, বললে, এখানে আমরা তোমার বক্তৃতা শুনতে আসিনি···সেজন্য তোমাদের দেশে রয়েছে টাউনহল। বাঙালীরা শুধু কথা বলতেই ভালবাসে কিন্তু সত্যিকারের কাজের কথা যদি বলা যায় অমনি তারা বেঁকে বসে।

বেশ', রাজভোগ তোমার পছন্দ হল না এখন কিছু দিন আরামে বসবাস করো।

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক ঘৃণায় তার কথার কোনো জবাব দিলে না—পরমুহূর্তেই চিংফুর দল বেরিয়ে যেতে দড়াম করে দরজাটা তাদের পেছন দিকে বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ হতাশভাবে বসে থেকে বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করলেন, ঘরের যে দেওয়ালটা রাস্তার দিকে তারই ফাঁক দিয়ে একটুখানি সূর্য্যের আলো ঢোকবার চেষ্টা করছে। বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধ বটেন, কিন্তু সারা জীবনের নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাসে দেহ তখনও বেশ অটুট ছিল। দু'হাতের দশটি শক্ত লম্বা আঙুলের চাপে একটা কাঠের জানালা খুলে গেল এবং এক ঝলক আলো সাদা ধবধবে দাড়ির ওপর লাফিয়ে পড়ে খেলা করতে লাগলো।

আট

বৃদ্ধ উৎসুক দৃষ্টিতে নীচু হয়ে তলার গাড়ী চলাচল দেখতে লাগলেন! অবশেষে এলো একখানা গাড়ী। বৃদ্ধ ওপর থেকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে দেখলেন—গাড়ী যিনি চালাচ্ছেন—তিনি একজন বলিষ্ঠ বাঙ্গালী যুবক। পরে দেখা গেল, আরোহী হিসাবে ভেতরে আর কেউ বসে নেই। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রস্তুত হয়েই বসেছিলেন। তিনি মনে মনে বল্লেন, 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এবং সেই মোটরের ভেতরের বসবার জায়গা লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মোটরের আরোহী এ জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথমে একটা অস্বাভাবিক রকম ঝাঁকুনী অনুভব করে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, একজন বৃদ্ধ গাড়ীর ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন।

তিনি মনে করলেন এ একটা সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা! বৃদ্ধ হয় ত ছাদের ওপর থেকেই পরে থাকবেন। মরে গেছেন কি বেঁচে আছেন তা-ও হঠাৎ জানবার উপায় নেই! তাই তাড়াতাড়ি ব্রেক কসে ওপরের দিকে তাকিয়ে কাউকে ডাকতে যাবেন এমন সময় বৃদ্ধ বহু কষ্টে মুখ উঁচু করে তাকে শব্দ করতে বারণ করলেন এবং তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। এইবার ভদ্রলোক ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন, বৃদ্ধকে বাঙ্গালী বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু যে বাড়ী থেকে তিনি পড়েছেন সেটা জাপানীদের আড্ডা। ভেতরে কোনো গলদ আছে ভেবে তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে হাওয়ার বেগে গাড়ী চালিয়ে দিলেন। নিজের বাড়ীতে পৌঁছে মোটর গ্যারেজে ঢুকিয়ে তিনি বৃদ্ধকে ডাকতে গিয়ে দেখেন, তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছেন! তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর থেকে চাকর-বাকরদের ধরে এনে বৃদ্ধকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক নিজে ডাক্তার, তাই প্রাথমিক-চিকিৎসার পর খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দিতেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। চেতনা ফিরে আসতেই বৃদ্ধ প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, আমি বাঙ্গালীর বাসায় আশ্রয় পেয়েছি ত? ভূপতিবাবু—কেন না তাই হচ্ছে বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুটির নাম—মাথা নেড়ে সে কথায় সায় দিলেন।

বৃদ্ধ বললেন, আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচব না। লাফিয়ে পড়ার দরুণ বুকে ভয়ানক একটা চোট্ লেগেছে। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি গোটাকতক জরুরী কথা বলে যেতে চাই। বৃদ্ধ ইঙ্গিতে বাড়ীর আর সবাইকে চলে যেতে বলে ভূপতিবাবুকে কাছে থাকতে অনুরোধ জানালেন।

ভূপতিবাবুর ইসারায় সবাই ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল,

রইলেন তিনি একা। তিনি এখনো বুঝতে পারলেন না এই মুমূর্ষু বৃদ্ধ কেন ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লেন, কেনই বা তিনি জাপানী আড্ডায় ছিলেন, আর এই মৃত্যুর সময় তাকেই বা তিনি কী বলতে চান।

বোধ করি এই নির্জ্জন মুহূর্ত্তটির জন্য বৃদ্ধের প্রাণ উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল। শেষ সময়ে প্রদীপ নেভবার আগে যেমন জ্বলে ওঠে বৃদ্ধও ঠিক তেমনি অসীম চাঞ্চল্যে বালিসে ভর দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসে ডাক্তারকে তাঁর জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

*　　　*　　　*

উপন্যাসের চাইতেও চাঞ্চল্যকর সেই কাহিনী যখন শেষ হ'ল উত্তেজনায় বৃদ্ধের চাইতে ভূপতিবাবুই বেশী আন্দোলিত হচ্ছিলেন।

তিনি বৃদ্ধের হাত দু'টি চেপে ধরে বল্লেন, কি করতে হবে আমায় আপনি বলুন। যদিও আমি চিকিৎসক, কিন্তু বিজ্ঞানের জন্যে প্রাণপাত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি করব না। আমরা চার ভাই সকলেই কৃতবিদ্য, নিজে আমি বিয়ে করিনি, তাই সংসারের বন্ধন বলতে যা বোঝা যায় তা আমার নেই। বিজ্ঞান এককালে আমারও ছিল জীবনের-স্বপ্ন,কিন্তু কর্ম্ম-জগতে আমাকে চিকিৎসক হতে হয়েছে।

কম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধ জবাব দিলেন, শুভক্ষণে তুমি আজ ওখান দিয়ে গাড়ী চালিয়ে আসছিলে, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারবো। কিন্তু তার আগে তুমি প্রতিজ্ঞা কর, আমার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তুমি যাত্রা করবে—সেই সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে। আমার পকেটে সেই দুর্গম জায়গায় যাবার নক্সা পাবে কাজেই তোমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না। একটা

কথা তোমায় বলে দিই—সেই জায়গাটা এখন জাপানীরা বেদখল করে বসে আছে। কৌশলে তোমায় গিয়ে আমার যন্ত্রপাতিগুলো সরিয়ে আনতে হবে। তা'হলে তুমি এই কলকাতার বুকের ওপর বসেই মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে বার্ত্তা আদান-প্রদান করতে পারবে। যাবার সময় নৌকা ভাড়া করে কয়েকটি বিশ্বাসী অনুচর সঙ্গে নিয়ে যেও।

সুন্দরবনের এই মান-মন্দিরের বিপুল সম্পত্তি আছে, মরবার আগে আমি তোমায় সমস্ত লেখাপড়া করে দিয়ে যাবো। সমস্ত টাকাই কলকাতার কোনো বিখ্যাত ব্যাঙ্কে জমা রয়েছে। আমি প্রয়োজন মত লোক পাঠিয়ে টাকা উঠিয়ে নিতাম। এই মরণোন্মুখ বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে তুমি শুধু এই আশ্বাস বাণী শুনিয়ে দাও যে, আমি তোমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে নিশ্চিন্ত মনে ওপারের ডাকে সাড়া দিতে পারি।

ভূপতিবাবুর জীবনে এমন নাটকীয়-ঘটনা কখনো ঘটেনি। তিনি নিজে শিক্ষিত, বলিষ্ঠ, উদার মন সম্পন্ন যুবক। কাজেই এ ধরণের একটা কাজ পেয়ে তাঁর উল্লসিত হবারই কথা। তিনি বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলেন এবং যে কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না সেই অসম্পূর্ণ কাজের সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করলেন।

সেই রাত্রেই ভূপতিবাবুর পরিচিত উকিল ডাকিয়ে বৃদ্ধ নিজের উইল সম্পূর্ণ করলেন এবং ভোরের দিকটায় যেন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। কিন্তু সে ঘুম আর তাঁর ভাঙল না।

অতি আপনার জন মারা গেলে যেমন দুঃখ হয় ভূপতিবাবু ঠিক তেমনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। এক বেলার ত' মোটে পরিচয় কিন্তু এই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক জীবনের যে বিরাট আদর্শ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন তা কর্ম্মী ভূপতিবাবুকে উজ্জীবিত করে তুললো।

ছাত্র-জীবনে ভূপতিবাবু বহু দেশহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং তারই ফলে তার এই চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করা।

কিন্তু আজ কর্ত্তব্যের আহ্বান যখন অন্য দিক থেকে এলো তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি করলেন না, ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই অসীম কর্ম্মের আবর্ত্তে।

নয়

মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকেরা যে চুপ করে বসেছিলেন তা নয়, হাউই জাহাজ দিয়ে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে জীব প্রেরণ করবার ব্যবস্থা তাঁরা বহু পূর্ব্ব থেকেই করে রেখেছিলেন, কিন্তু প্রাণীর বাঁচা-মরা সম্পর্কে সঠিক প্রমাণ পাননি বলে এই প্রচেষ্টাকে কার্য্যকরী করে তোলা তাঁদের পক্ষে তখনো সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি জন্তু-জানোয়ারকে এই ব্যবস্থায় ভিন্ন গ্রহে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, মূক-জানোয়ারদের কাছ থেকে পোঁছ সংবাদ আসবার কোন সম্ভবনা নেই!

কাজেই মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকদের আরো কিছুদিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। কিন্তু পৃথিবী থেকে অরুণের ওখানে যাওয়াতে তাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল দেখবার বিশেষ সুবিধা হল।

ফলাফল এত সন্তোষজনক দেখা গেল যে, বৈজ্ঞানিকের দল আবার মহা উৎসাহে কোমর বেঁধে লাগলেন। শুধু তাই নয়, এদের চেষ্টা হ'ল এক সঙ্গে সকল গ্রহে অন্তত পক্ষে দু'জন করে লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করা।

মঙ্গল গ্রহের এই বিপুল আয়োজনে অরুণের অধিনায়ক রূপে স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'ল—কেননা সে যে-কোন উৎসাহীর চাইতে অভিজ্ঞ এবং পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে অক্ষত দেহে এসে পৌঁছেচে!

প্রথমে বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করেছিলেন অরুণের সঙ্গে আর একজন লোক দিয়ে তাকে সোজা পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু আবিষ্কারের লোভে অরুণ সে প্রস্তাবে একেবারেই রাজী হ'ল না! পৃথিবীতে ফিরে এলে তার যে আর অন্য কোনো গ্রহের অভিযানে বেরুনো সম্ভবপর হয়ে উঠবে না সে কথা অরুণ বেশ ভালো করেই জানতো। আর জানতো বলেই সে ওই প্রস্তাবে একেবারে সোজা অস্বীকার করে বসলো।

কাজেই অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হ'ল অরুণ আর যেখানেই যাক অন্তত পৃথিবীতে সে কিছুতেই যাবে না।

অরুণ এবার চলেছে অধিনায়ক হয়ে অন্য গ্রহের অভিযানে। এ অভিযান যেমন ব্যাপক, তেমনি বিপদ-সঙ্কুল.....আর গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রার দিন ক্রমশ এগিয়ে এলো; যারা এই ভয়াবহ অভিযানে রওনা হবে তারা অরুণকে নিয়ে সংখ্যায় চার জন।

যাবার দিন এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হ'ল এবং সেটা মঙ্গল গ্রহের জাতীয় উৎসব বলে ঘোষিত হল; কারণ মঙ্গলের যে কয়টি প্রাণী অজানার উজানে নিজেদের ভাসিয়ে দিতে চল্লো—তারা আর ফিরে না-ও আসতে পারে। কাজেই তাদের প্রতি একটা রাজসিক সম্মান দেখিয়ে বিদায় দিতে হবে। এছাড়া তাদের বাপ-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাঁদের আগ্রহ ও আন্তরিকতাও কম নয়। কিন্তু দেশের ও বিজ্ঞানের উচ্চতর উন্নতির জন্য তারা হাসিমুখে নিজেদের পুত্রদের ছেড়ে দিয়েছে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের

মুখে। তাই বিষাদের চাইতে তাঁদের মনে আত্মোৎসর্গের আনন্দই বেশী।

যাবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাতে যাত্রীদের মনে বিপদ কালিমা ঘনিয়ে না আসে সেজন্য সকলের মুখে হাসি···দেশের সর্ব্বত্র উৎসবের ব্যবস্থা···নৃত্য-গীত···অবিরাম···অফুরন্ত। আগেই স্থির হয়েছিল যে সর্ব্ব প্রথম যেতে হবে চন্দ্রলোকে! চন্দ্র গ্রহ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে মঙ্গলের বৈজ্ঞানিকেরা যে গবেষণা করেছিলেন তাতে জানা গেছে যে ওখানকার ধারকরা আলো খুব স্নিগ্ধ এবং গ্রহের আবহাওয়া প্রাণীর বসবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

এই ব্যাপক ও বিরাট অভিযানের জন্য যে হাউইজাহাজ নির্ম্মাণ করা হয়েছিল তা আকারে যেমন ছোট, বেগে ঠিক তেমনি বিদ্যুৎগতি।

মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিকরা অরুণের পৃথিবী থেকে মঙ্গলে আসা দেখে উৎসাহিত হয়ে এই ক্ষিপ্রগতি উড়ো জাহাজ তৈরী করেন; অবশ্য এই নির্ম্মাণ ব্যাপারে অরুণেরও অনেকখানি দান ছিল।

আর কাল বিলম্ব না করে চারজন বন্ধু সেই ছোট হাউই জাহাজে উঠে বসল। এই হাউই জাহাজ সম্পর্কে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, কোনো একটি গ্রহে পৌঁছেই এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে না; গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে এই উড়ো জাহাজে চড়ে অবলীলাক্রমে পৌঁছানো চলবে। মঙ্গলবাসীরা সখ করে এর নাম দিয়েছিল "ধূমকেতু"।

ধূমকেতু যেমন কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না, প্রতি মুহূর্ত্তে কক্ষ পরিবর্ত্তন করে, বৈজ্ঞানিকদের গড়া এই

অদ্ভুত ধূমকেতুও ঠিক তেমনি ছুটে চলবে কক্ষ থেকে কক্ষে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে।

মঙ্গল গ্রহ থেকে যে "ধূমকেতু"র অভিযান সুরু হ'ল কোন্ গ্রহে কিম্বা উপগ্রহে তার শেষ পরিণতি সে কথা কে বলতে পারে?

বিরাট জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে চারিটি প্রাণীকে বহন করে "ধূমকেতু" ধীরে ধীরে ওপরে উঠে···দূর দিক-চক্রবালের অসীম শূন্যে মিলিয়ে গেল।

প্রথমটা অনুকূল আবহাওয়া পেয়ে "ধূমকেতু" তীব্র বেগে উর্দ্ধে উড়ে চল্লো। ধূমকেতুর অভ্যন্তর ভাগ এমন কৌশলে তৈরী করা হয়েছিল যে লক্ষ মাইল বেগে ধাবিত হলেও ভেতরে এতটুকু কম্পন কিম্বা অসুবিধা অনুভূত হবে না। যাত্রীদের বলে না দিলে তাদের মনে এই ধারণাই জন্মাবে যে, তারা নিশ্চল একটি কামরায় বসে নিশ্চিন্ত আরামে আলাপ-আলোচনা করছে।

অনেকখানি পথ অতিক্রমের পর হঠাৎ আকাশে জমে উঠল ঘন কালো মেঘ। ভেতরে এমন কল-কব্জার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যার দৌলতে অভ্যন্তরে বসেও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের কথা সম্যক জানতে পারা যায়। তাই ওরাও দেখতে পারলো যে তারা দুর্যোগের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে। ক্রমশ আকাশ মসীবর্ণ ধারণ করল,—গগনের বুক চিরে সুরু হল বিদ্যুতের খেলা; সেই প্রবল-নর্ত্তনে হাউই জাহাজের ভেতরকার আরোহীদের বুকও কেঁপে উঠল।

হঠাৎ তরুণের মনে হল, তার জীবন-দেবতা তাকে কোন্ দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার কোনই স্থিরতা নেই। তার পথ এবার কোন্ মুখে কে তার সন্ধান দেবে? তার চাইতে এই

বেলা সময় থাকতে গুরুদেবের কাছে শেষ বিদায় নেয়া উচিত। হাউই জাহাজের ভেতর থেকে পৃথিবীর বুকে সুন্দরবনের মান-মন্দিরের সঙ্গে কথা বলা এখন আর অরুণের পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত নয়! মঙ্গল গ্রহের বিজ্ঞানসাধনা ব্যাপারটাকে কত সহজই না করে দিয়েছে। এ যেন অনেকটা শ্যামবাজার থেকে বালীগঞ্জে ফোন করার মতো। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! সুন্দরবনের মান-মন্দিরে বসে তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সে অরুণের একেবারে অপরিচিত। অরুণের মনে ভাবনার সীমা নেই। গুরুদেবের আসন কে এমন করে অধিকার করলে। পরম বিস্ময় নিয়ে অরুণ জিজ্ঞেস্ করলে আপনি কে?

ভূপতিবাবু জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই তোমার নাম অরুণ। আমি ক'দিন ধরে তোমারই আহ্বান প্রতীক্ষা করে আছি। তোমার গুরুদেব আমায় বলেছিলেন অরুণের কাছ থেকে আহ্বান একদিন-না একদিন আসবেই।

একটা সন্দিগ্ধ মন নিয়ে অরুণ জবাব দিলে, হ্যাঁ, আমারই নাম অরুণ। কিন্তু আপনাকে ত' আমি চিনতে পাচ্ছি না! আমি যতদিন ওখানে ছিলাম, গুরুদেবের কাছে একদিনও আপনাকে দেখিনি! ভূপতিবাবু বল্লেন, সেই কথা সবিস্তারে জানাবার জন্যেই ত' আমি কলকাতা থেকে চলে এসে তোমার জন্যে এইখানেই অপেক্ষা করছি—। অরুণ বল্লে, আপনার কথায় আমি বড় ভয় পাচ্ছি। আপনি অমন করে আস্তে আস্তে কথা বলবেন না। গুরুদেব কোথায়,—আর কেনই বা তিনি মান-মন্দির ছেড়ে গেছেন আমায় শীগ্‌গীর বলুন। ভূপতিবাবু জবাব দিলেন, তোমার গুরুদেব আর

ইহলোকে নেই। বৈজ্ঞানিক তিনি, জানি না তাঁর অতৃপ্ত-আত্মা তোমরই মতো গ্রহে-উপগ্রহে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা!

খানিকক্ষণ অরুণের মুখ থেকে আর কথা বেরুল না। কিছু সময় বাদে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে বললে, আমি সব কথা জান্‌তে চাই। আপনি কিছু গোপন করবেন না।

ভূপতিবাবু জবাব দিলেন, সে ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ।—তোমার সময় হবে ত'? অরুণ অসহিষ্ণু হয়ে বল্লে, আমার গুরুদেবের কথা, সে কাহিনী যতই দীর্ঘই হোক আমাকে শুনতেই হবে। ভূপতিবাবু বললেন, আর আমাকেও সে ইতিহাস তোমায় শোনাতেই হবে! তোমার গুরুদেবের তাই যে আদেশ। তবে তুমি একটু ধৈর্য্য ধরে শোনো।

মেঘে-মেঘে তখন ডম্বরু বাজছে। অরুণের দেহে ও মনে আজ এ কি সর্ব্বহারার ক্রন্দন রোল। পৃথিবী থেকে এত দূরে এসেও তার কেবলি মনে হতে লাগলো যে,—পায়ের তলা থেকে ক্রমশ মাটি সরে যাচ্ছে। সে এক্ষুণি উল্কার বেগে নীচের দিকে ছিট্‌কে পড়বে। আঁকড়ে ধরবার মতো এবার আর তার কোন আশ্রয়ই রইল না।

ভূপতিবাবু কাহিনী বলে চলেছেন। তার সমাহিত মুখ দেখে মনে হয়, এমন ভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সর্ব্বস্ব উজাড় করে মনের কথা জীবনে তিনি আর কাউকে শোনান নি। তাদের উভয়ের মনে আজকে হয়ত এই কথাই জাগছিল যে, পৃথিবীতে মাত্র একটি বক্তা এবং একটি শ্রোতাই আছে। দূরত্বে তারা এত দূরে—কিন্তু সমবেদনায় তারা এত কাছাকাছি। গ্রহে-গ্রহে, তারায়-তারায় জাগলো সেই বেদনার মর্ম্ম-বাণী!

ভূপতিবাবু বলে চল্‌লেন, আজ পৃথিবীর বড় দুর্দ্দিন! আজ তুমি নেমে এসো এই ধূল আর ধূমে ঢাকা আমাদের মর্ত্ত্যভূমে। পৃথিবীর আজ তোমাকে বড় দরকার।

চোখের জল মুছে অরুণ জবাব দিলে, কিসের প্রলোভনে আমি আর পৃথিবীতে যাবো ভূপতিবাবু? জীবনে ছিল একটি বন্ধন। সে হচ্ছে আমার গুরুদেব। তাঁর আদেশে করতে না পারি এমন কোন কাজই আমার ছিল না। তাঁর মহান আদর্শের জন্যে আমি আমার নিজের জীবনকেই ত' উৎসর্গ করেছিলাম। আজ আর আমার কোনো কাজই রইল না। এইবার গ্রহে-গ্রহে, তারায়-তারায় নিজেকে আমি ছড়িয়ে দেবো, বিলিয়ে দেবো, আমায় আর আপনি কোনো অনুরোধ করবেন না ভূপতিবাবু।

ভূপতিবাবু উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, ভুল—ভুল—সম্পূর্ণ ভুল ধারণা তোমার অরুণ। যে গুরুদেবের আদেশে তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করেছ বিজ্ঞান-সাধনায়, তোমার সেই প্রাতঃস্মরণীয় গুরুদেবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এবং একমাত্র কামনা ছিল নিজের জন্মভূমির বিরাট এবং বৃহৎ স্বপ্ন দেখা। আজ তোমার সেই জন্মভূমি বিপন্ন, সর্ব্বগ্রাসী সমরানল তাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। তোমার গুরু-দেবের কৃপায় তুমি মঙ্গল গ্রহে গিয়ে দেব-গুরুর পুত্র কচের মতো যে ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত্ব করেছ—নিজের মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে আর পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে তোমার নবলব্ধ বিজ্ঞানকে কার্য্যকরী করে তোলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার স্বর্গত গুরু-দেবের আত্মার তাতে শান্তি হবে। তিনি আজ যেখানেই থাকুন—তৃপ্ত হয়ে দু' হাত তুলে তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন।

ভূপতিবাবুর কথা শুনে অরুণ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল!

তারপর বল্‌লে, মৃত্যুকালে আপনি তাঁর পাশে ছিলেন। তাঁর শেষ-বাণী তিনি আপনার কাছেই দিয়ে গিয়েছেন। হয়ত' আপনার কথাই ঠিক। গুরুদেবের আদেশের মতোই আমি আপনার বাণী পালন করবো।

হঠাৎ অরুণ হাউই জাহাজের গতি পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে দিলে। তার সঙ্গী অবাক হয়ে শুধোলে, এ তুমি করছ কি অরুণ···? আমাদের গন্তব্য স্থান হচ্ছে চন্দ্রলোক। অরুণ মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলে, শোন বন্ধু, যে পৃথিবীতে যেতে আমি সব চাইতে বেশী আপত্তি জানিয়েছিলাম···সেই পৃথিবী থেকেই আমার আহ্বান এসেছে। সে আহ্বান আমার মৃত গুরুদেবের আহ্বানের মতোই অলঙ্ঘনীয়। তাকে উপেক্ষা করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার পৃথিবীকে······আমার জন্মভূমিকে যে করেই হোক বিপদ-মুক্ত করতেই হবে। মঙ্গলের বাসিন্দা তুমি। তুমি তোমার বিজ্ঞান বল নিয়ে আজ আমার সহায় হও। তার পর তুমি আমায় যে গ্রহে যেতে আদেশ করবে আমি অবনত শিরে সেই আদেশ পালন করবো। শুধু আজকের দিনে আমায় বাধা দিও না। আজকে পৃথিবীর এই চরমমুহূর্ত্তে আমাদের সমস্ত শক্তি আর সঙ্কল্প কেন্দ্রীভূত হোক ওর দিকে—এই বলে অরুণ হাউই জাহাজে টাঙানো পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেখালে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল, গগনের ঘনঘটা কেটে গেছে। প্রকৃতি এখন কিসের আশঙ্কায় স্তব্ধ। শুধু আধখানা চাঁদ ক্ষণে-ক্ষণে মেঘের ফাঁকে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে আস্‌ছে ধূমকেতু তার পুচ্ছের আলোড়নে —গ্রহে, নক্ষত্রে, তারায়-তারায় জেগেছে কম্পন।

পৃথিবীর কিশোর-বীর অরুণ জগতের গ্লানি দূর করতে ধূমকেতুর মতোই আজ বেগবান!

সুন্দরবনের মান-মন্দিরের একটি কক্ষে বসে ভূপতিবাবু গর্ব্বে-উল্লাসে-আনন্দে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে উঠ্লেন:

"—আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু
দুর্দ্দিনের এই দুর্গ-শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন!

অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্দ্ধচেতন।"

তোমরা কিছু শুন্তে পাচ্ছ?

যদি শোন্‌বার সাধ থাকে,—কান পেতে শোনো—তোমাদের অরুণ আজ ফিরে আস্‌ছে বিজ্ঞানের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে!

গ্রহ-উপগ্রহ জেগে উঠ্ছে তার আহ্বানে!

তোমরা কান পেতে শোনো তার পদধ্বনি!

—শেষ—

শিক্ষামূলক কাহিনী

প্রতিশোধ

রণধীর কিছুতেই শৈবালের সঙ্গে পেরে ওঠেনা। জীবনের একটা দুষ্ট গ্রহের মতো সব ব্যাপারে সে ওকে পিছু হটিয়ে দেয়। জয়মাল্য ছিনিয়ে নিয়ে নিজের গলায় পরে।

শৈবাল যখন ওদের ক্লাসে ভর্তি হয়নি তখন রণধীর ছিল তার ক্লাসের সেরা ছেলে। শুধু সহপাঠীর দলই নয়, ইস্কুলের শিক্ষকরা পর্য্যন্ত একটা বিরাট সম্ভাবনার আশায় এই রণধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তেন।

প্রতি বছর পুরস্কার-বিতরণী সভায় সে সোনার পদক ঝুলিয়ে ঘরে ফিরে আসত। ইস্কুলের বিতর্ক-সভায় প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায়, আবৃত্তিতে—রণধীরই বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনত।

ক্লাসের ছেলেরা তার নতুন উপাধি দিয়েছিল—'জুয়েল'। মাস্টার মশায়দের মধ্যে নানা জনে নানা রকম নামকরণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শতনাম না হলেও সেগুলির ভেতরও অনেক বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

ইংরেজীর মাস্টার ডাকতেন—'স্পার্ক', ভূগোলের শিক্ষক নামকরণ করেছিলেন—'গ্লোব ট্রটার', অঙ্কের মাস্টার ডাকতেন—'নির্ভুল' বলে, ইতিহাসের শিক্ষকের কাছে নাম ছিল—'ঐতিহাসিক'; বাংলার টিচার গর্বভরে ডাকতেন—'অভিধান', সংস্কৃতের পণ্ডিত-মশাই ঠাট্টা আর আদর জানিয়ে সম্বোধন করতেন—'অনুস্বর-বিসর্গ'।

এই ভাবে গোটা বিদ্যালয়ের আদর কুড়িয়ে আর পুরস্কার নিয়ে রণধীরের দিনগুলি বেশ হালকা হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই রণধীরের সুনাম-গগনে ধূমকেতুর মতো দেখা দিল—শৈবাল।

শৈবাল স্থানীয় কোর্টের মুন্সেফের ছেলে। তার বাবা বদ্‌লী হতে সে এই ইস্কুলে ভর্তি হলো!

শৈবাল যেদিন ক্লাসে এল—রণধীর শুধু একবার বাঁকা চোখে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিলো। কারণ, শৈবাল বড় লোকের ছেলে—একেবারে যাকে বলে ধোপ-দুরস্ত—। মফস্বল শহরে মুন্সেফের ছেলের একটা আলাদা খ্যাতি-প্রতিপত্তি থাকে বৈ কি। এই জাতীয় বহু মুন্সেফ, দারোগা কিংবা কানুনগোর

ছেলের কেরামতিকে তুচ্ছ করে সে বরাবর প্রথম পুরস্কার নিয়ে এসেছে প্রতিটি ক্লাশে।

কাজেই শৈবালের সাজ-পোষাকের বাহুল্য দেখে সে বন্ধুদের কাছে ফিস্ ফিস্ ক'রে অথচ শৈবালকে শুনিয়ে বল্লে, এলেন আর একটি মাকাল ফল।

ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা হাসির আর বিদ্রূপের বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল।

শৈবাল একবার তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু কিছু বল্লে না। রণধীর ভেবেছিল আর দশজন বড় লোকের ছেলে যা হয়ে থাকে শৈবাল তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হবে না।

চক্‌চকে পোষাক পরে ঝক্‌ঝকে বই হাতে নিয়ে ইস্কুলে আসবে। যথেষ্ট ডালমুট, ছোলাভাজা আর আলু কাব্‌লি কিনে ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করবে এবং সঙ্গে একদল 'যো হুকুম' ছাত্র গড়ে নেবে। কয়েকটা বছর এ অঞ্চলে থাক্‌বে, তারপর হঠাৎ বাপের বদলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনির্দিষ্ট পথে উধাও হয়ে যাবে। অন্যান্য সরকারী চাকুরের ছেলেরা যে পন্থা অনুসরণ করেছে। তা থেকে শৈবাল যে বিচ্যুত হবে না, সে ধারণা রণধীরের মনে বদ্ধমূল ছিল।

কিন্তু ক্লাসের প্রথম পরীক্ষাতেই ছন্দ-পতনের মতন শৈবাল একটা বিশ্রী ও বেমক্কা কাজ করে বসল!

প্রত্যেক ছেলেকেই 'প্রগ্রেস্ রিপোর্ট' দেয়া হল। শুধু দেয়া হল না—রণধীর আর শৈবালকে।

হেডমাস্টার মশাই তাঁর খাস-কামরায় দুজনকে ডেকে পাঠালেন। ছেলের দল ভেবে কূল-কিনারা পায় না!

এদের দুজনের মধ্যে ত' বাক্যালাপই নেই, তা মারামারি করল কখন ?

দারুণ মারপিট না হলে কি হেডমাস্টারমশাই ডেকে পাঠিয়েছেন ? তা মারপিট করেছে ভালো কথা, কিন্তু এমন উপভোগ্য দৃশ্যটা ওদের সবাইকার চোখের সাম্‌নে জম্‌লেই সব দিক দিয়ে ভালো হত না কি ?

রণধীর যে এমন বেরসিক ক্লাশের ছেলেরা সে কথা ইতিপূর্বে বুঝতে পারে নি। তাদের ডাকবার প্রকৃত কারণ কী তা না বুঝে দুজনেই গিয়ে হেডমাস্টার মশায়ের খাস-কামরায় গিয়ে হাজির হল।

হেড-মাস্টারমশায় গম্ভীরভাবে নিজের চেয়ারে বসে আছেন, আর তাঁর পাশের আসনে উপবিষ্ট ক্লাস টিচার।

প্রধান শিক্ষকমশাই বোধ করি ভারী রেগে গেছেন ; তিনি শুধু চশমার ফাঁক দিয়ে রণধীরকে একবার দেখে নিলেন কিন্তু মুখে কিছুই বল্‌লেন না।

রণধীর মনে মনে প্রমাদ গণল। কেননা, হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে তাঁর বাবার খুব জানাশোনা আছে। সাংঘাতিক একটা কিছু না ঘটলে তিনি এভাবে তাঁর খাস কাম্‌রায় ডেকে আনেন নি !

হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে। সেদিন ক্লাসের ব্ল্যাক বোর্ডে সে মাকাল ফলের একটা ছবি এঁকেছিল। সেই কথাই কী শৈবাল হেডমাস্টার মশায়ের ক'রে জানিয়েছে ? ছেলেটা ত' ভারী সাংঘাতিক ? এসেই ঝগড়া বাধাতে চায় ?

এই সব কথা রণধীরের মনে খেলে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তার জন্য প্রগ্রেস রিপোর্ট আটকে রাখার কী মানে হয় ? বাবাকে বলে মার খাওয়াবার মতলব নাকি ?

হঠাৎ এইবার ক্লাস-টিচার কথা কইলেন, রণধীর, এবারকার পরীক্ষায় তুমি প্রথম স্থান অধিকার করতে পারো নি।

বিনামেঘে বজ্রপাতের কথা রণধীর শুধু ছাপার বইয়ে পড়েছে। মনে হল সেই রকম একটা কাণ্ড কিছু ঘটে গেল। যেন কোনো কথাই তার কানে যায় নি এইভাবে সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মাস্টার মশায়ের দিকে তাকিয়ে রইল!

তাকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে জয়মাল্য নেবার লোক সারা ক্লাসে আছে বলে ত মনে হয় না।

তবে কি মাস্টার মশাইরা শাস্তি দেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করেছেন? মাকাল-ফলের কার্টুন আঁকার জন্য তার পরীক্ষার নম্বর যদি কমিয়ে দেয়া হয় তবে সে অনর্থ করবে, না হয় এই ইস্কুল ছেড়ে দেবে।

জিজ্ঞাসু চোখে সে তার শিক্ষকদের দিকে তাকালো।

হেডমাস্টার মশাই জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন, এবারকার পরীক্ষায় তোমাদের ক্লাশে সব গুলি বিষয়ে প্রথম হয়েছে আমাদের নতুন ছেলে শৈবাল। সব শুদ্ধু ত্রিশ নম্বর বেশি পেয়েছে। রণধীর, তোমার এই অধোগতি সত্যি লজ্জাজনক। এই নাও তোমাদের দুজনের প্রোগ্রেস রিপোর্ট। শৈবাল, তুমি আরো উন্নতি লাভ করো এই কামনা করি। প্রথমে আমরা মনে করেছিলাম তুমি নকল করে পরীক্ষা দিয়েছ। কিন্তু তোমার প্রত্যেকটি খাতা পরীক্ষা ক'রে আমাদের মনে আর কোনো সন্দেহ নেই। তোমার যোগ্যতায় আমাদের মনে দ্বিধা জেগেছিল বলে সত্যি আমরা দুঃখিত।

রণধীর মনে মনে সীতার মতো কামনা করলো, মেদিনী, তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।

কিন্তু প্রকৃতি আজকাল আর মানুষের কথা শুনতে চায় না! হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের ফাটা-সিমেণ্ট একটুও ফাঁক হল না। একরাশ লজ্জা মাথায় নিয়ে সে সেইখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

হেডমাস্টার বল্লেন, এইবার তোমরা ক্লাশে যেতে পারো।

এই ঘটনার পর থেকে রণধীরের ক্লাশের খবর দ্রুত পরিবর্তিত হতে লাগলো।

রণধীর যেন হঠাৎ এক অচল আধলায় পরিণত হল। প্রতিটি পরীক্ষায় শৈবাল তার চাইতে বেশি নম্বর পেয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন করে ফেল্লে।

ইংরেজীর মাস্টার, অঙ্কের মাস্টার, ইতিহাস, ভূগোল সব বিষয়ের শিক্ষক এখন আর রণধীরকে ডেকেও জিজ্ঞেস করলেন না; সবাই শৈবালের খবর নিতেই ব্যস্ত। শৈবাল একে ক্লাশের প্রথম ছাত্র, তার ওপর মুন্সেফের ছেলে। সে যেন হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ নামিয়ে এনেছে, সবাইকার তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি।

সকলকার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে যে, এতদিন রণধীর ফাঁকি দিয়ে ক্লাশে প্রথম হয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম স্থান অধিকার করবার যোগ্যতাই তার নেই।

আসল মানুষটিকে হঠাৎ যেন সকলে আবিষ্কার করে ফেলেছে! তাই নকলের দিকে কেউ ফিরে তাকাতে রাজি নয়, এতদিন ধরে খুব ঠকাই তারা ঠকেছে। আর তার সঙ্গে আর কোনো মতেই কোনো সম্পর্ক রাখা চলে না। সব কিছু সম্মান যখন ওকে আস্তে আস্তে ছেড়ে চলে গেল—সেই সময় শৈবাল এগিয়ে এলো ওর সঙ্গে ভাব করতে।

যাকে একদিন সে মাকাল ফল বলে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিয়েছিল সেই ছেলেটি যেন ওকে দয়া দেখাতেই বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধতে চায়।

শৈবালের জন্মদিনের উৎসব। রণধীরকে যেতেই হবে তাদের বাড়ি। শৈবাল ক্লাশশুদ্ধ সব ছেলেকেই নেমন্তন্ন করেছে। মাস্টার মশাইরাও বাদ যান নি।

এইবার রণধীর দোটানায় পড়ল।

যদি সে শৈবালের জন্মদিনের উৎসবে যোগ দিতে না যায়, তবে ছেলেরা বল্‌বে, হিংসে করে ও গেল না। আর যদি দলে ভিড়ে সেখানে হাজির হয় তবে তার একেবারে মাথাকাটা যাবে। না-না এ অপমান সে কিছুতেই সহ্য করবে না।

হঠাৎ মাথায় তার এক বুদ্ধি এসে গেল।

ছুটো স্টেশন পরেই তার এক মামা ডাক্তারি করেন। সে এক দিনের জন্মে সেইখানেই না হয় চলে যাবে—তবু শৈবালের নিমন্ত্রণ রক্ষা সে কিছুতেই করতে পারবে না।

এই ব্যবস্থায় এক ঢিলে ছুই পাখি মারা যাবে।

প্রথম কথা, সে দেখাতে পারবে যে, শৈবালের জন্মদিনে ভীড় জমানো ছাড়াও তার গুরুতর কাজ থাকৃতে পারে; দ্বিতীয় কথা, অপমানের হাত থেকে বাঁচা।

যাবার আগে সে অবশ্য শৈবালকে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করবার জন্য ধন্যবাদ দিলে আর একখানি ছোটোদের বার্ষিকী উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিলে। চিঠির তলায় সে পুনশ্চ দিয়ে লিখলে, মামা কিছুতেই ছাড়লেন না—মামাত ভাইয়ের জন্মদিন কিনা, তাই যেতেই হল।

শৈবালের জন্মদিন হতে পারে—আর রণধীরের মামাত ভাইয়ের একটা জন্মদিন থাক্‌তে পারে না ? না থাকে সে নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করে নেবে।

ফিরে এসে তার ক্লাশের ছেলেদের মুখে শৈবালের বাড়ির নেমন্তন্ন খাওয়ার গল্প শুনে শুনে তার কান পচে গেল।

যত শৈবালের প্রশংসা শোনে—ততই তার রাগ বেড়ে যায়।

এই ছেলেটিকে কি সে কিছুতেই জব্দ করতে পারবে না ? পড়াশুনার প্রত্যেকটি বিষয়ে সে রণধীরকে পেছু হটিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ তার মাথায় এলো যে, খেলাধূলায় শৈবালের গুণপনার কথা কিছু জানা যায় নি। এই পথেই তাকে পরাজিত করতে হবে।

তার মনে আর মগজে একটা অশান্তির ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ খেলাধূলোর পথটা এখনো খোলা আছে ভেবে রণধীর অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

সাম্‌নেই ইস্কুলের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা। ছেলের দলের মধ্যে উৎসাহের সাড়া জেগে উঠেছে। লাফ, ঝাঁপ, ছোটার ব্যাপার নিয়ে সবাই মেতে উঠেছে।

রণধীর বুঝতে পারলে খেলাধূলোর ব্যাপারে সে এখনো অপরাজেয়ই আছে।

আরো একটি আনন্দের খবর এই যে, শৈবাল কিছু দিনের জন্য তার মাসির বাড়ি বেড়াতে গেছে। তার যে খেলাধূলোর দিকে ঝোঁক আছে এবং সে যে এসে প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে এমন মনে হয় না।

তা ছাড়া দিন-রাত যারা বই নিয়ে বসে সময় কাটায়, খেলা-ধূলোর দিকে তাদের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা থাকে। শৈবালও নিশ্চয়ই সেই দলেরই একজন।

কিন্তু রণধীরের জীবনে দুষ্ট-গ্রহ এই শৈবাল। খেলাধূলোর প্রতিযোগিতার দিন সে হঠাৎ ধূমকেতুর মতো এসে উদয় হল এবং শুধু যে তাকে পরাজিতই করল তা নয়, গোটা ইস্কুলের কাপ আর পদকগুলি অতি সহজেই জয় করে নিল।

শেষ খেলা 'হাই জাম্প।'

ছেলের দল লাফাচ্ছে। ক্রমাগত ওপরে উঠে যাচ্ছে উচ্চতার মাপ কাঠি। এই খেলায় জিতলেই শৈবাল 'সেরা খেলোয়াড়' বলে পরিচিত হবে। হঠাৎ লাফাতে গিয়ে শৈবাল বিষম চোট খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

হৈ হৈ করে ছুটে এল ছেলের দল—তাড়াতাড়ি এসে জুটলেন শিক্ষকরা—খবর গেল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বল্লেন—হাঁটুর হাড় একেবারে ভেঙে গেছে, অপারেশন করে হাড় জোড়া দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলেরা ধরাধরি করে শৈবালকে বাড়ি নিয়ে গেল।

গভীর নিস্তব্ধ রাত। রণধীর তার ঘরে ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ প্রধান শিক্ষকের চাপা কণ্ঠস্বরে তার ঘুম ভেঙে গেল। —রণধীর, তোমায় একবার উঠতে হবে।—অজ্ঞান অবস্থায় শৈবাল শুধু তোমারই নাম করছে। ডাক্তাররা বলছেন—এই সময় তোমাকে কাছে পেলে রোগী হয়তো একটু শান্ত হবে। তাই আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

রণধীর কী যেন বলতে যাচ্ছিল, প্রধান শিক্ষক বাধা দিয়ে

বল্লেন, সেজন্য তোমার কোনো ভাবনা নেই ; আমি তোমার বাবার অনুমতি নিয়ে এসেছি। শীগ্‌গির চলে এসো।

অন্ধকার পথ দিয়ে সে নিঃশব্দে চলে এলো রোগীর ঘরে। শৈবালের মা অতি আপনজনের মতো রণধীরকে কাছে টেনে নিলেন।

ডাক্তারবাবু বল্লেন, এখানে আপনারা কেউ অকারণে ভিড় বাড়াবেন না। ওই ছেলেটি থাকুক রোগীর কাছে! আমরা রইলাম রোগীর পাশের ঘরে। ওকে দেখলে, ওর সঙ্গে কথা বল্লে রোগী আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়বে বলেই আমার বিশ্বাস। রোগীর একমাত্র ওষুধ হচ্ছে এখন ঘুম। আসুন, আমরা সবাই বাইরে যাই।

সবাই ধীরে ধীরে শৈবালের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শৈবালের মা একটা মৃদু নীল আলো জ্বালিয়ে দিলেন ঘরে, তারপর তাকে বল্লেন, ওর বাঁচা-মরা তোমার হাতে। তুমি ওর সহপাঠী, তোমার কাছে রোগীকে রেখে যাচ্ছি বাবা!

এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন।

এইবার রণধীর রোগীর মুখোমুখি বসে। শৈবালের মুখে শুধু এক কথা—রণধীর, তুমি আমার সঙ্গে ভাব করবে ভাই? রণধীরের মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো। ভাবল সে, কে এই শৈবাল?

তার জীবনের দুষ্টগ্রহ এই শৈবাল! হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটি শিশির ওপর। লাল কালিতে ছাপা—Poison—বিষ।

কে যেন তার কানে কানে বল্লে, এইত সুযোগ। রোগীর মুখে খানিকটা ঢেলে দাও।

রণধীর চারদিকে চোরের মতো তাকালো। কিন্তু তখনই তার কানে ভেসে এলো শৈবালের মার কণ্ঠস্বর ঃ ওর বাঁচা-মরা তোমার হাতে বাবা !

শৈবালের দিকে আবার তাকালো সে। অস্থির ভাবে সে মাথাটা ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করছে আর বল্‌ছে, আমার সঙ্গে ভাব করবে ভাই রণধীর ?

রণধীর আর পারলো না। রোগীর সেবা করার বরাবর একটা সুনাম ছিল তার। হঠাৎ সে তার শিয়রে রাখা আইস-ব্যাগটি শৈবালের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বল্লে, আমি তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি ভাই !

রণধীরের মুখখানিকে বোধ করি সে চিনতে পারলে। নিজের হাতের মধ্যে ওর ধরে ডান হাতখানি সে বুকে টেনে নিলে ; তারপর পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

অতি প্রত্যুষে ডাক্তার ঘোষণা করলেন, রোগীর প্রাণের ভয় আর নেই।

সব প্রতিযোগিতায় হেরে রণধীর কি মনুষ্যত্বের খেলায় জিতে প্রতিশোধ নিলে ?

চড়ুই ভাতি

বড়দিনের ছুটি সুরু হ'তে ছেলে-মহলে এক আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

কলেজের পড়ুয়ার দল সব এসে জুটেছে। সহর থেকে থিয়েটার দেখে এসেছে, তাদের 'সীতা' প্লে হ'বে।

নন্দীদের পোড়ো বাড়ীতে তাদের সকাল থেকে সন্ধ্যে মজ্‌লিস্ বসেই আছে।

মনোজ এইজন্য নয়া একটা হারমোনিয়াম কিনে এনেছে, তার শব্দে ওই রাস্তায় কান পাতে যায় কার সাধ্যি! সারাক্ষণ গান চলেছে, কোথায় সীতা কোথায় সীতা—

তারপর রাম, লক্ষ্মণ, শম্বুকের পার্টের চীৎকার ত' আছেই।

কালু, নীলু, টেপু, টগা, কুট্টির দল আশে পাশে ঘুরে বেড়ায় —ওখানে যাবার কারো হুকুম নেই। দাদাদের মজলিসে ঢুকতে গেলেই ঘাড় ধরে বের করে দেয়, বলে 'প্লে'র দিন দেখবি এখন পালা সব। তখন তারা সব যুক্তি পাকিয়ে কুট্টিদের বাইরের ঘরে ভীড় করল।

কালু বল্লে, বাঃ রে, দাদারা মজা করে প্লে করবে, আর আমরা কিচ্ছুটি করতে পারবো না?

টগা টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে বল্লে, আমরাও থিয়েটার করবো

টেপু ফোঁড়ন দিয়ে বল্লে, ওরা থিয়েটার করছে আমরা কেন ওদের দেখাদেখি থিয়েটার করতে যাবো?

সকলে শুধোলে, তবে—তবে?

টেপু বাঁ হাতের চেটোর ওপর ডান হাত দিয়ে এক কীল মেরে বল্লে, আমরা করবো যাত্রা, করবো—নহুষ উদ্ধার। যেমনটি সেবার কালীপূজোর সময় বারোয়ারী তলায় হয়েছিল।

যাত্রার কথা শুনে সক্কলেই খুব খুসী! বল্লে, বেশ, আমরা সব রাজী। কিন্তু যত গোল বাঁধলো পার্ট নিয়ে। সক্কলেই রাজা সাজতে চায়। নহুষের ভূত কে হবে—তাই নিয়ে বাঁধলো

গোলমাল। মাথা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢেকে নহুযের ভূত সাজতে হ'বে, তাতে মুখ দেখা যাবে না। কাজেই সকলে গররাজী!

কুট্টি বল্লে, নীলুর চেহারাটা ভূতের মত, ওকেই ভূতের পার্ট দেয়া যাক্।

আর যাবে কোথায়—নীলু তেড়ে মেরে এসে—পারে ত তক্ষুণি কুট্টিকে নুন্ জল দিয়ে গিলে ফেলে। চ্যাঁচামেচি শুনে সেই ঘরে এসে ঢুকলেন কুট্টির মা। তাকে দেখে সব চুপচাপ। কারো মুখে রা নেই!

কুট্টির মা বললেন্ কিরে, প্রমোশন পেয়ে বুঝি খুব খুসী?

নীলু মুখ ভার করে বল্লে, না, তা নয়, দাদারা থিয়েটার করছে আমরা যাত্রা করবো কিনা! কিন্তু কুট্টি আমায় বল্লে ভূত সাজতে! বলতে বলতে নীলুর ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠল তারপর সত্যি সত্যি সে কেঁদে ফেল্লে। কুট্টির মা তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, নাঃ, তোরা কেন যাত্রা করতে যাবি? তোরা একটা মজা করবি কেমন?

ছেলেরা এইবার তাকে পেয়ে বস্‌লো। ঘিরে ধরে বল্লে, কি মজা—কি মজা?

কুট্টির মা বললেন, ছুটি ত এখন, তোরা চড়ুই ভাতি কর, সে ওদের থিয়েটারের চাইতে অনেক ভাল জিনিষ।

টগা বল্লে, চড়ুই ভাতি? সে কোথায় হবে মাসীমা?

কুট্টির মা বললেন, কেন? নদীর ওপারে আমাদের একটা আমবাগান আছে সেই যায়গায় হবে' খন। ছেলেরা চড়ুই ভাতির

নামে যেতে উঠল। নীলু বল্লে, কিন্তু আমরা যে কিছু জানিনা কি করে করবো ?

কুট্টির মা বল্লেন, সে জন্যে তোদের ভাবতে হবে না, আমি সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেবো'খন।

চড়ুই-ভাতির দিন খুব সকালে—ছেলেরা এসে কুট্টিদের বাড়ী হাজির হ'ল। কুট্টির দিদি মিনতি ওদের প্রত্যেকের ছ'খানা করে কাপড় আর একটি করে পাঞ্জাবী বাসন্তী রংয়ে ছুপিয়ে রেখেছিল, —ওরা যেতেই সকলকে কাপড় পরিয়ে, জামা গায়ে দিয়ে মাথায় পাগড়ী বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিলে।

কুট্টির মা বল্লেন,—তোরা এমনি করে দল বেঁধে নদীর ধার অবধি যাবি—সেখানে নৌকো আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা আছে। বাসন-পত্তর, খাওয়া-দাওয়ার সব জিনিষ আর আমাদের রঘুয়াকে সেই নৌকোতেই পাবি। সেই তোদের ওপারে নিয়ে যাবে।

কুট্টি বল্লে, আর আমরা সারা দিনে স্নান করবো না ?

মিনতি বল্লে, স্নান করবি নে কেন রে বোকা ? নদীর জলে ছপুর বেলা দিব্যি মজা ! রঘুয়া ত সঙ্গেই রইল। এতটা মজা হবে ছেলেরা কেউ আশা করেনি। তাদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে ! কুট্টির মা এসে সকলকার কপালে দইয়ের টিপ পরিয়ে দিলেন ও আশীর্বাদ করলেন।

ছেলেরা মাথা নীচু করে তার পায়ের ধূলো নিলে। তারপর তারা মিনতির শেখানো গানটা গাইতে গাইতে নদীর দিকে পা চালিয়ে দিলে—

নদীর ওপার ডাক দিয়েছে সঙ্গোপনে
ধানের ক্ষেত আজ বাতাসেরি রঙ্গ শোনে !

বট অশথের ফাঁকে-ফাঁকে
বুড়ো শীতের কাঁপন লাগে
সূর্য্যি মামা উত্তাল তরঙ্গ গোনে!
রুই-ইলিশ আজ নদীর জলে অঙ্গ বোনে!

গান গাইতে গাইতে নদীর ধারে পৌঁছে তারা দেখে—রঘুয়া নৌকো নিয়ে তাদের পথ চেয়ে বসে আছে।

কুট্টি বল্লে, তুই কখন এলি বল্ ত?

রঘুয়া জবাব দিল, মাইজী ত' হামাকে সেই সোক্কাল বেলা পাঠিয়ে দিছে। সেই থিকে হামি বসে আছি। তোমরা ঝট্-পট্ সব নায়ে উঠে এসো।

ছেলেরা নৌকোয় উঠে দেখে—তাদের দেয়া চাঁদায় ময়দা, ঘী নানান্ রকম তরি-তরকারী, দই, মিষ্টি একদিকে সব সাজিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে।

হাততালি দিয়ে তা'রা গান গেয়ে উঠল।

রোজ যদি ভাই আজ হ'ত ত' কি মজা!
লুচির সনে আলুর দম আর দই-সন্দেশ ইঃ গজা!!

সঙ্গে সঙ্গে সব মুখ চোট্‌কাতে লাগলো। কারো কারো মুখ থেকে যে দু-এক ফোটা লালা টপ্ করে নদীর জলে যে না পড়ল তা নয়! তবে অবিশ্যি তাদের নাম করতে চাই না।

টেপু বল্লে,—লুচি ভাজবে কে?

নীলু লাফিয়ে উঠে জবাব দিলে, কেন আমি! সেবার সরস্বতী পূজোয় আমি মেলা লুচি ভেজেছি,—এ ভার আমার।

কুট্টি বল্লে, তবে আমি আলুর দম র'াধবো।

টগা গাল ফুলিয়ে ঠোঁট উল্টে বল্লে, আর আমি বুঝি কিছুই

কোরব না? রঘুয়া তাকে শান্ত করে বল্লে, না, না খোঁখা বাবু তুমি বেগুন ভাজি ভাজবে, কেমন?

টগা হাত দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে ফিক করে হেসে বল্লে, আচ্ছা। কুট্টি এর মধ্যে ফস্ করে গান ধরলো—

আজ কেন ভাই
মলিন বদন?
আজ কেন ভাই
চক্ষে জল?
গুরুমশাই
নাই বা এলেন
বেত খানা তার
থাক্ অচল!!

নীলু বল্লে, আমাদের উনুন্ কোথায় পাবো? আর উনুন্ ধরাবই বা কি দিয়ে?

রঘুয়া বল্লে, সে তোমাদের কিছু ভাবতে হ'বে না। বাগানের ভেতর তৈরী করে দেব, আর জ্বালানী কাঠও সেইখানেই মিলবে।

খানিক বাদেই নৌকো গিয়ে ওপারে ভিড়ল। ছেলেরা ঝুপ ঝুপ করে নেমে ছুটোছুটি সুরু করল। ওরা যেন বাঁধন-হারার দল।

গুরু মশাইয়ের কড়া শাসন নেই, পাঠশালার গণ্ডী নেই, পড়ার তাগিদ নেই, আকাশে উড়ে-চলা-পাখীর মতোই আজ ওরা সহজ-গতিতে জীবনটাকে পেয়ে বসেছে। রঘুয়া বল্লে, শুধু ছুটোছুটি করলে ত' হবে না, তোমরা সব ময়দা মাখতে বসে যাও আমি উনুন্টা তৈরী করে কুট্নো কুটে দি।

কালু-নীলুরা ছুটে এসে বল্লে, কক্ষনো নয়, তুমি উন্নুন্টা তৈরী করেই খালাস, বাদ বাকি সব আমরাই করবো, তোমাকে আর কিচ্ছুটি করতে হবে না।

রঘুয়া হাসতে হাসতে উন্নুন্ খুঁড়তে চলে গেল।

ছেলেরা ময়দা মাখলে, কুটনো কুট্‌লে, বালতি করে নদী থেকে জল নিয়ে এলো, তারপর সুরু হ'ল রান্না।

প্রথমটা খানকয়েক লুচি পুড়ে গেল, তাতেই ওদের কি আনন্দ! ঐ পোড়া লুচিই ওদের মুখে অমৃত হয়ে উঠবে। এর মধ্যে আবার জন কয়েক জুটে-পুটে গিয়ে বাগান থেকে বিস্তর ফুল পেড়ে নিয়ে এলো। মালা গাঁথবে। ফিরতি পথে সেই মালা গলায় বাড়ী যাওয়া! ওঃ কি মজা!

দুপুরের সঙ্গে সঙ্গেই রান্না-বান্না সব শেষ হয়ে গেল। কুট্টি হাঁক দিয়ে বল্লো, এই বেলা নাইতে চলো সব। নাইবার নাম শুনে ছেলের দল চ্যাচামেচি করে সব এক জায়গায় এসে জুট্‌লো। নৌকা থেকে তেল বেরুল। ছেলেরা গায়ে তেল মেখে নদীর ধারে গিয়ে সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু মজা হ'লো এই যে, কেউ শীতের ভয়ে জলে নামতে চায় না! তাই নিয়েই হাসাহাসি। নীলু চেঁচিয়ে বল্লে, যে আগে জলে নামবে একটা সন্দেশ সে বেশী পাবে। যেমনি ওকথা বলা তখন কে কার আগে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে—সে পথ খুঁজে পায়না! সকলের আগে নেমেছিল টগা। সে হী-হী করে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে, আ-আ-মি-স-স—স-স্‌স-সন্দেশ···তারপর ঝুপ্ করে আর এক ডুব!

ছেলেরা ততক্ষণ গান সুরু করে দিয়েছে:

ঝপ্ ঝপ্ ঝপাঝপ্ নদী জলে ঝম্পন
হীহী-হীহী-ঠক্‌ঠক্‌-দাঁতে দাঁতে কম্পন!

পিঠ থাক রোদে আর হাতে লুচি তপ্ত
তাতে যদি হ'তে পারে হিম দেহ শক্ত !!

স্নান করে ছেলের দল বাগান থেকে কলাপাতা কেটে সার সার খেতে বসে গেল।

সকলেই স্বীকার করলে তুষ্ট হয়ে এমন শিষ্ট আমোদ আর মিষ্টি রান্নার স্বাদ তারা জীবনে কক্ষনো পায় নি !

এর কাছে থিয়েটার ? দূর-ছাই !!!

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ছেলেরা যখন নদীর ধারে আবার জড়ো হ'লো তখন সূর্য্যিমামা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে।

রঘুয়া বল্লে, এই বেলা নায়ে উঠতে হ'বে। ফুলের মালা গলায় ছেলেরা মাথায় পাগ্‌ড়ী বেঁধে গিয়ে নায়ে উঠল। ওপারে নেমে আবার সব সার দিয়ে দাঁড়ালো। অশথ গাছের ফাঁক দিয়ে তখন পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি-ঝুঁকি মারছে !

মিষ্টি সুরে সুর মিলিয়ে ছেলেরা গলা ছেড়ে গান ধরে বাড়ী মুখো হ'লো ঃ

নদীর জলে ধানের ক্ষেতে চাঁদের দেশে যে সুর বাজে
সে সুর আবার আসছে ভেসে ঘরের মায়ের ডাকের মাঝে
ঘর হতে আজ বাইরে আসি
শুনতে পেলেম একই বাঁশী
আজ একাকার ঘর ও বাহির জ্যোছ্‌না-গলা মিষ্টি সাঁঝে।

গণেশ ছেলেটির সম্পর্কে তার মা-বাবা ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

লেখাপড়ায় গণেশ মোটামুটি ভালোই। গত বছর সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ওপরের ক্লাসে উঠেছে।

খেলাধূলোর দিকেও নজর আছে। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে একটি ক্লাব গড়েছে। সেখানে রোজ ব্যায়ামচর্চা করে।

কিন্তু গণেশের মা কিছু দিন ধরে লক্ষ্য করছেন যে, ঘর থেকে খাবার-জিনিষ চুরি যাচ্ছে।

প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন, ঝি চাকরের কাণ্ড। চাকর রোজ যে-পরিমাণ ভাত খায়···তাতে তার আরো ক্ষিধে হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয় এবং লোভে পড়ে খাবার চুরি করা খুবই স্বাভাবিক।

এই সাতদিন আগেরই ঘটনা।

গণেশের বাবার জন্য বাজার থেকে কিছু আঙুর আপেল আর বেদানা আনা হয়েছিল। বয়স হয়েছে···ডাক্তার এই সব ফল সব সময় খেতে বলেছেন।

হঠাৎ পরদিন সকালবেলা উঠে দেখা গেল যে, টেবিলের ওপর থেকে সব ফলই তুটো-তুটো করে কম।

বাড়ির ছোকরা চাকরটার একটু লোভ বেশি। নাম হচ্ছে তার ঝগড়ু। তাকে ডেকে এনে বহু বকাবকি করা হল। দারোয়ানটাকে দিয়ে ওঠ-বোস্ করানো হল বহুক্ষণ ধরে। কিন্তু কিছুতেই ছেলেটা রা কাড়ে না। এমন দজ্জাল ছেলেও বড় সহজে দেখা যায় না। গণেশের বাবা বললেন, দাও ছেলেটাকে দূর করে তাড়িয়ে।

গণেশের মা আপত্তি করে জবাব দিলেন, আহা, আছে ক-বছর থেকে, থাক্‌না।

কাজেই ঝগড়ু রয়ে গেল।

আবার দুদিন পরের কথা।

মাঝে মাঝে সাবুর পায়েস খান গণেশের বাবা। হঠাৎ টিনের কৌটা খুলে গণেশের মার চক্ষুস্থির। একদানা সাবু তাতে পড়ে নেই!

এত খাবার জিনিষ থাকতে ঝগড়ু সাবুই বা চুরি করতে যাবে কেন?

সাবু বাজারে একেবারে পাওয়া যায় না। হয়তো পয়সার লোভে চুরি করে নিয়ে গিয়ে চড়া দামে বিক্রী করেছে।

আবার দারোয়ানকে দিয়ে ঝগড়ুকে ধমক-ধামক দেয়া হল, কান মলানো হল। কিন্তু অদ্ভুত ছেলে এই ঝগড়ু, একটু চীৎকার করবে না, একটু চোখের জল ফেলবে না!

আজ আবার যে কাণ্ডটি ঘটেছে সে একেবারে সকলের সেরা। গণেশের বাবার মনিব্যাগ থেকে দশটা টাকা নেই। উধাও ত একেবারে উধাও।

রান্নাঘরের নর্দমা থেকে তেতলার ঠাকুর ঘরের কুলুঙ্গী পর্য্যন্ত আঁতি-পাতি করে খোঁজা হল, কিন্তু সে নোটের কোনো হদিসই পাওয়া গেল না!

গণেশের বাবা এইবার মাথা নাড়লেন। বললেন, আমার মনিব্যাগ থেকে দশটা টাকা তুলে নেবার সাহস ঝগড়ুর হবে না। আমি বলে দিচ্ছি, এ তোমার ছেলের কাণ্ড।

গালে হাত রেখে অবাক হয়ে, চোখ দুটো বড়-বড় করে গণেশের মা বল্লেন, তুমি বলছ কি গো? আমাদের গণেশ চোর?

গণেশের বাবা বললেন, এখনো আমি সরাসরি কিছু বলছি নে, তবে আরো কটা দিন ওর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে।

গণেশের মার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। পিঠে করবেন বলে চালের গুঁড়ো করেছিলেন—গুঁড়ো অমনি উঠোনে পড়ে রইল, দুধ রেখেছিলেন চার সের, সে দুধ কখন বিড়ালে এসে খেয়ে গেল। উনোনে জল ঢেলে তিনি এসে শুয়ে রইলেন।

গণেশের বাবা বুঝলেন, আজ বাড়ি শুদ্ধু সকলের অনাহারে কাটবে, প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই!

যার জন্য বাড়িতে এত কাণ্ড—সারা দিন কিন্তু তার টিকিটি দেখা গেল না।

বিকেল বেলা গড়িয়ে গেল—গণেশের মা তবু বিছানা থেকে উঠলেন না।

সন্ধ্যের পর চুপি-চুপি পা টিপে-টিপে গণেশ নিজের পড়বার ঘরে গিয়ে হাজির হল। কোনো রকমে আলোটা জ্বেলে নিয়ে পড়তে বসল।

গণেশের মা এইবার বিছানা ছেড়ে উঠে রান্না ঘরে গেলেন, তারপর খাবার তৈরি করে খাবার ঘরে হাজির হলেন।

দু'জনের মুখে কোনো কথা নেই।

গণেশের বাবাও এতক্ষণ চুপচাপ চোখ বুজে পড়ে ছিলেন। কোনো কথা জিজ্ঞেস না করে চামচে দিয়ে একটু একটু করে খাবার খেতে লাগলেন।

গণেশের মার চোখের কোণে কিন্তু জল।

এর একটা কারণ আছে! গণেশ যখন জন্মায়—তখন ওরা কাশীতে ছিলেন। এক নাম-করা জ্যোতিষী গণেশের মায়ের হাত দেখে বলেছিলেন, এই ছেলেটি বড় হলে দেশের-দশের প্রশংসা পাবে।

গণেশের মার মনে কত কামনা, কত আশা !

তীর্থস্থানে পাওয়া তাঁর সে পুত্র কিনা অবশেষে চোর হল !

গণেশের বাবা জানেন, এ শোকে তাঁর কোনো সান্ত্বনা নেই, তাই তিনি প্রবোধ দেবার কোনো চেষ্টাও করলেন না। ছেলেকে ডেকে যে একটু বকবেন, তাও নিজের মনের মধ্যে কোনো তাগিদ খুঁজে পেলেন না !

গণেশের মাও হচ্ছেন সেই রকম মানুষ যিনি অতি বড় দুঃখেও হঠাৎ কিছু বলেন না, কিংবা কান্নাকাটি করেন না। স্তব্ধ হয়ে থাকেন। গণেশের বাবার ঘরে ঢুকে নিজের মনোভাবের কথা ভেবে হয়তো ক্ষণিকের জন্যে তাঁর চোখে এক ফোঁটা জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু তক্ষুণি তিনি নিজেকে সামলে নিলেন।

সেদিন স্বামী-স্ত্রীতে আর কোনো কথাই হল না।

তেতলার ঠাকুর-ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়ে গণেশের মা আবার এসে শুয়ে রইলেন।

ঝি এসে বল্লে, মা, সারা দিন দাঁতে কুটোটি পর্য্যন্ত কাটোনি, উঠে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দাও।

গণেশের মা বরাবর নিজের হাতে রান্না করেন। তিনি পাশ ফিরে শুয়ে বললেন, তোরা এ বেলায় নিজেরা রান্না করে খেয়ে নিগে যা। বাবুর খাবার আমি দিয়ে এসেছি।

ঝি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, দাদাবাবু কী খাবে ?

গণেশের মা রাগ করে জবাব দিলেন, আমায় বিরক্ত করিস নি, যা।

ঝি আর কিছু বলতে সাহস করল না। এক পা দু-পা করে নীচে রান্না ঘরে চলে গেল।

গভীর রাত্রে গণেশের মার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কি ভেবে তিনি বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

দক্ষিণ দিকে একটা উঁচু নারকেল গাছ—তারি ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ চাঁদ দেখা যাচ্ছে।

কিসের কৌতূহল বলা কঠিন, তিনি বারান্দাটা ঘুরে গণেশের শোবার ঘরের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ তাঁর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। গণেশের বিছানা খালি··· ঘরে সে নেই!

প্রথমেই চরম কিছু ভাবতে তাঁর মন চাইলো না। তিনি ওর পড়বার ঘরে গেলেন। নাঃ, কেউ নেই তো সেখানে!

তারপর ছুটে তিনি গেলেন গণেশের বাবার ঘরে। চাঁদের আলো এসে তাঁর মুখে পড়েছে, তিনি অকাতরে ঘুমুচ্ছেন।

গণেশের মার মনে ততক্ষণ কিন্তু ঝড় বইতে সুরু করেছে।

ঘুমন্ত আর অসুস্থ লোকটাকে জাগালে তাঁর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে, এ কথা গণেশের মার মনে একবারও জাগ্‌ল না। তিনি তাঁকে দু হাত দিয়ে ঠেলে তুলে পাগলের মতো চীৎকার করে বললেন, ওগো শুনছ, গণেশ ঘরে নেই!

যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছেন—এইভাবে গণেশের বাবা উঠে বসে চারদিকে সর্বহারার মতো তাকাতে লাগলেন। প্রকৃত ঘটনা যে কী ঘটেছে তা তিনি বুঝতে পারেন নি।

গণেশের মা আবার চেঁচিয়ে বললেন, ওগো, তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছ না? আমাদের খোকা ঘরে নেই।

গণেশের বাবা এতক্ষণে কথা কইলেন, খোকা ঘরে নেই? না—না, হয়তো বাথরুমে গিয়েছে। এত রাত্তিরে সে যাবে কোথায়?

গণেশের মা মাথা নেড়ে বললেন, না না, গোটা বাড়ি অন্ধকার। তা হলে ত' আলো জ্বলত ? এসো তুমি আমার সঙ্গে।

দু'জনে নিঃশব্দে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। শুধু একটা হাল্‌কা হাওয়া শেষ রাত্তিরের নারকেল পাতাগুলি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে। দূর আকাশে চাঁদ মেঘের ভেলায় খেয়া পারাপার করছে।

ওদের খোকা কোথাও নেই—নেই শোবার ঘরে, নেই পড়বার ঘরে, নেই বাথরুমে কিংবা অন্য কোথায়ও।

খোকার মা এইবার চোখের জলকে আর রোধ করতে পারলেন না। বললেন, তাহলে কি রোজ রাত্তিরে খোকা এমনি করে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় ? আমার আজ কেমন সন্দেহ হয়েছিল বলেই না পা টিপে-টিপে এসে দেখে গেলাম ?

খোকার বাপ বললেন, আমি যে কিছু ধারণায় আনতে পারছি নে গণেশের মা···! আমাদের খোকা···আমাদের ভবিষ্যতের আশা···টাকা চুরি করবে, রাত্তিরে লুকিয়ে কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে—

···আর কিছু তিনি বলতে পারলেন না। শুধু রেলিঙ ধরে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।

খোকার মা তার ডান হাতটা চেপে ধরে বললেন, আচ্ছা, এই নিশুতি রাতে যখন কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত রাস্তায় বেরোয় না··· আমাদের খোকা যায় কোথায় আমায় বলতে পারো ?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন গণেশের বাবা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তা ত বলতে পারিনে।

গণেশের মা আবার শুধোলেন, চল, আমরা দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখি কোথায় গেল।

গণেশের বাবা শুধু একবার উঁচু আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, পাগল হয়েছ ? এই শেষ রাত্তিরে তাকে কোথায় খুঁজবে !

গণেশের মা মরিয়া হয়ে জবাব দিলেন, অনেক দিন যা করিনি, আমি কাল তাই করবো ! ও আগে বাড়ী ফিরে আসুক ; ওর পিঠে আমি পাখা ভাঙবো।

গণেশের বাবা উত্তর করলেন, ছিঃ ! ছেলে কি তোমার আগের সেই খোকাই আছে ? গণেশ এখন বড় হয়নি ? আজ বাদে কাল সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।

তারপর একটুখানি নিস্তব্ধতার পর তিনি বললেন, আচ্ছা কাল রাত্তিরে আমরা দুজনে জেগে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবো। তারপর চুপি চুপি খোকার পেছন পেছন গিয়ে দেখবো ও কী করে, কোথায় যায় ! রাজি ?

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে গণেশের মা বললেন, রাজি !

পরদিন রাত্রে স্বামি-স্ত্রী চুপচাপ পড়ে রইলেন যে যার বিছানায়। ঢং ঢং করে দুটো বাজল !

তার খানিক বাদেই ক্যাঁ-কোঁ করে দরজা খোলার শব্দ, তারপর মৃদু পায়ের ধ্বনি। ওরা দুজনে তৈরী হয়েই ছিলেন—নিঃশব্দে নিশাচরের মতো গণেশকে অনুসরণ করলেন।

এ-পথ সে-পথ ঘুরে গণেশ একটা বস্তির সামনে এসে দাঁড়ালো।

গণেশের মা গণেশের বাবার হাতটা চেপে ধরে কী বলতে যাচ্ছিলেন। তিনি ইসারায় চুপ করিয়ে দিলেন।

বস্তির একটা দরজায় মৃদু টোকা দিতেই সেটা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

একি ! ঝগড়ু ! তাদের ছোকরা চাকর ! তারই সঙ্গে গণেশ ভেতরে ঢুকলো। স্বামি-স্ত্রী জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন—ঝগড়ুর বাপ মরণাপন্ন কাতর। গণেশ পকেট থেকে দুটো কমলালেবু আর কিছু আঙুর ওর শিয়রে রাখলো।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আবার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখেন, গণেশের বাবার সদ্য আনা র‍্যাশনের কাপড়টা আলোয়ানের তলা থেকে বের করে খাটের ওপর রাখল গণেশ।

গণেশের বাবা ফিস্ ফিস্ করে বললেন, বেটা চোর—কোথাকার।

গণেশের মা তাঁর দুহাত চেপে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, চল—পালাই চল।

গণেশের বাবা রসিকতা করে বললেন, কেন গো ? তার পর মৃদু হেসে আপন মনেই বললেন, হ্যাঁ ঠিক ! মন্দ কাজের যেমন একটা লজ্জা আছে···ভালো কাজেরও তেমনি একটা সরমে জড়ানো কুণ্ঠা থাকে। আমাদের দেখলে শ্রীমান্ সত্যিই লজ্জা পাবে। তা হলে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করাই ভালো।

স্বামীর হাত ধরে গণেশের মা সদর রাস্তায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর দুচোখ ভর্তি জল টলমল করছে। কিন্তু কালকের চোখের জল আর আজকের আনন্দাশ্রুতে কত আকাশ-পাতাল তফাৎ!

চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে।

কাঞ্চনপুরের যুবরাজ প্রজাদের আমন্ত্রণে এক পল্লীতে এসে নিজ হাতে একটি বৃক্ষ-রোপণ করবেন।

একটি শিশু-উদ্যান রচনা করা হবে এই অঞ্চলে, তারই সূচনা করে দিয়ে যাবেন কাঞ্চনপুরের যুবরাজ স্বয়ং।

যে পথ দিয়ে যুবরাজ আসবেন তার পাশে সুন্দর সব তোরণ নির্মাণ করা হচ্ছে। যত জঙ্গল আর আবর্জনা পরিষ্কার করছে গ্রামের ছেলেরা দল বেঁধে। সারা গ্রামটাকে তারা তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করে তুলেছে। বাড়ীর উঠোন, পথের ধার, পাড়ার আনাচ-কানাচ কোথায়ও একটা শুক্‌নো পাতা অবধি পড়ে নেই।

কাঞ্চনপুরের যুবরাজ রাজধানীতে থাকেন, শ্বেত পাথরের রাজপুরীতে তাঁর বাস ; তিনি এই সামান্য গাঁয়ে এসে যাতে অসুবিধেয় না পড়েন সে জন্যে পাড়ার ছেলেদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। কোনো কিছু দেখে যুবরাজের ভ্রূ যেন বিরক্তিতে কুঁচ্‌কে না যায় সে জন্য গাঁয়ের মেয়েদেরও চিন্তার অবধি নেই। রাত জেগে তারা নিশান তৈরী করেছে, শাড়ীর পাড় জুড়ে জুড়ে অতি নিপুণ কলা-কৌশলে শেলাই করেছে সুন্দর ঝালর, আর মাননীয় অতিথিকে বরণ করবার জন্যে তৈরী করেছে রজনীগন্ধার ঝাড় আর বেল ফুলের মালা।

সানাই-এর মধুর আলাপ আর বাদ্যভাণ্ডের ভেতর দিয়ে রাজপুত্র এলেন গাঁয়ে। আশ-পাশের বিশটা গ্রামের ছেলে-বুড়ো ছুটে এলো রাজপুত্রকে দেখতে

একি কম আনন্দের কথা ?

কাঞ্চনপুরের রাজপুত্র এসেছে তাদের গ্রামে……এইবার তাদের সব কিছু দুঃখ-কষ্ট দূর হবে! দেশের যাঁরা মাথা—তাঁদের হাত ঝাড়লেই ত' পর্বত। যাবার সময় খুসী হয়ে তিনি যে দু' হাতে সোনা-দানা বিলিয়ে দিয়ে যাবেন না, তাই বা কে বলতে পারে? কাজেই সকলের মনে মনেই একটা গোপন আশা আছে যে, ঘরে ফেরবার মুখে কেউ শুধু হাতে ফিরবে না।

একটা পাবার আশা যখন থাকে তখন মানুষ সব কাজ ফেলে এসে ভীড় জমায়। এ ব্যাপারেও ভীড়ের কিছু কমতি হয়নি। কেউ এসেছে রাজপুত্রকে দেখতে; কেউ বা এসে জনতা বৃদ্ধি করেছে—তামাসাটা কি রকম জমে তাই দেখবার জন্যে।

মোটকথা রাজপুত্র এসে যখন গাঁয়ে পৌঁছুলেন তখন সার সার মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না! প্রথমটা বিপুল বাদ্য-ভাণ্ডের জন্য কানে তালা লাগবার মতো হল। গ্রামের ঢাক, জয়ঢাক, ভেঁপু শঙ্খ ত' আছেই, তা ছাড়া রাজপুত্রের পদমর্যাদার জন্যে কাঞ্চনপুর থেকেও বহু বাজনাদারকে বাদ্যভাণ্ড দিয়ে পাঠান হয়েছে।

এই ঘরের আর বাইরের দু' দলের বাজনা যখন সুরু হল—গাঁয়ের লোক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, পাশের মানুষটিকে গলা ফাটিয়ে কিছু বললেও একটি কথা শোনবার উপায় নেই এমন অবস্থা।

গ্রামে যত কাক-চিল ছিল সব ভয় পেয়ে উড়ে ভিন্ দেশে চলে গেল। ঘরের পোষা পাখি, জন্তু-জানোয়ার যেমন কুকুর, বেড়াল, গরু, ঘোড়া, গাধা, ময়না, টিয়া, চন্দনা, কাকাতুয়া—তারাও বিষম একটা বিপদ উপস্থিত হয়েছে মনে করে তারস্বরে চ্যাচামেচি সুরু করে দিল।

সব চীৎকার আর সব বাজনা মিলে এমন একটা বিকট আবহাওয়ার সৃষ্টি করল যে, কাঞ্চনপুরের রাজকুমার মনে করলেন, এমন আন্তরিক অভিনন্দন পৃথিবীর আর কোনো রাজপুত্র আর কোনো জায়গায় পায় নি !

মনে মনে ভারী পুলকিত হয়ে উঠলেন রাজপুত্র।

আরো মুস্কিল বাঁধলো এই যে, বাজনা কেউ থামাতে চায় না। যে আগে থামাবে প্রতিযোগিতায় তারই হয় ত হবে হার। রাজপুত্রের কাছ থেকে সে হয়ত কোনো পুরস্কার পাবে না !

তাই বাদ্যে যার যত ক্যারামতি জানা ছিল সবাই আপ্রাণ চেষ্টায় দেখাতে এবং শোনাতে লাগলো। কেউ কেউ আবার ঘুরে-ঘুরে নেচে বাজনা বাজাতে লাগলো। যেন নাচার সঙ্গে বাজনাটা আরো মিঠে শোনাবে। ফলে রাজপুত্রও সেই মিঠে বোলে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবেন আর তারা পুরস্কার পাবে পর্বত-প্রমাণ।

সকলের আগে যারা ছিল তারা ঢাক বাজাচ্ছিল। ঘুরে ঘুরে, নেচে নেচে, কোমর দুলিয়ে তাদের গুণপনা দেখাবার চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না।

হঠাৎ একটা ঢাকির নাকের ভেতর কোন ফাঁকে ঢুকে গেছে একটা মশা। জোর কাঠি লাগাতে লাগাতে সে হ্যাঁচ্ছো করে হেঁচে উঠেই তার সামনের আর একজন ঢাকির ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ফলে তাল গেল কেটে....এ-ওর ঘাড়ে পড়ে, সে তার পিঠে হুম্‌ড়ি খায় !

ছন্দ হোঁচট খেতে সব কেমন যেন একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেল। হঠাৎ এক সময় সব বাজনাই থেমে গেল। কথায় বলে, ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি। সব বাদ্যভাণ্ড যখন চুপ মেরে গেল....তখন

গ্রামবাসীদের মনে হল, চুপ চাপ নিরিবিলি থাকার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই।

তখন আবার সবাই নিশ্চুপ হয়ে থাকে···শান্তি নষ্ট হবে বলে কেউ আর মুখ খুলে কথা বলে নতুন একটা অশান্তির সৃষ্টি করতে চায় না।

গ্রামের মোড়ল গাঁয়ের লোকদের ভাবগতিক দেখে ভারী হক্-চকিয়ে গেলেন ; অনুষ্ঠান না একেবারে পণ্ড হয়ে যায়। কাঞ্চনপুরের রাজপুত্র চটে-মটে গিয়ে তাঁর চতুর্দোলা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়ে না বসেন।

মোড়ল নিজের মেয়েকে আগেই ভালো করে শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছিল—কি ভাবে একটি বেল ফুলের মালা রাজপুত্রের গলায় পরিয়ে দিতে হবে।

এই নিস্তব্ধ-রাগিনীর মধ্যে মোড়ল ইসারা করলো তার মেয়েকে যাতে তাড়াতাড়ি সম্মানিত অতিথিকে মাল্য দান করে গাঁয়ের মান বাঁচায়।

কিন্তু এখানেও উল্টো বুঝিলি রাম !

মোড়লের মেয়ে এত-লোক একসঙ্গে দেখে ভড়কে গেল, তাই তাড়াতাড়ি মালাটা নিয়ে চোখ ছুটো বড় বড় করে ওর বাপের গলাতেই পরাতে উদ্যত হল। সমবেত জনতা এই বেমক্কা কাজের উদ্যোগ দেখে হৈ-হৈ করে উঠল ; তাতে মেয়েটি আরো ভয় পেয়ে মালাটি হাত থেকে ফেলে দিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেল্লে।

তখন আর একটি মেয়ে বুদ্ধি করে মালাটি লুফে নিলে তারপর ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে গিয়ে রাজপুত্রের গলায় পরিয়ে দিলে।

রাজপুত্রের ভ্রূ একটু কুঁচকে উঠেছিল, কিন্তু সমবেত জনতার জয়ধ্বনিতে কোঁচ্কানো চাদর আবার যেন পাট-পাট হয়ে বসে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক বিকট চীৎকার করে উদ্বোধন-সঙ্গীত সুরু করে দিলে।

এ যেন কে কতটা বড় হাঁ করতে পারে তারই একটা সম্মুখ সমর চলছে। কিন্তু গানের কথা যে কী সেটা কেউ বুঝতে পাচ্ছে না। একবার মনে হচ্ছে একদল শূকর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করছে, পর মুহূর্তেই আবার এমন শব্দ বেরুচ্ছে বুঝি অনেকগুলো মোটা মানুষ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। একটু বাদেই যেন বহু বাঁশের বাঁশী তার স্বরে পোঁ ধরলো।

যাই হোক অনেক কাণ্ডের পর উদ্বোধন-সংগীত সমাধা হল।

এইবার বৃক্ষ-রোপণের পালা।

ফলের রাজা হচ্ছে রসাল, লোকে যাকে বলে আম। ছোট একটি আমের চারা পোতা হবে শিশু-উদ্যানের একটি কোনে।

সভার মণ্ডপ থেকে সেই নির্জন কোন পর্যন্ত লাল মখমলের কার্পেট বিছিয়ে দেয়া হয়েছে—পাছে কাঞ্চনপুরের যুবরাজের পায়ে একটু মাটি কাদা লাগে!

রাজকুমার খুব সন্তর্পণে আমের চারাটি গর্তের মধ্যে বসিয়ে দিলেন। চারদিক থেকে অনেকগুলি সতর্ক হাত এসে মাটি দেবার ব্যবস্থা করে দিলে। রাজকুমারকে আর মাটি স্পর্শ করতে হল না। তবু স্বর্ণ-ভৃঙ্গারের স্নিগ্ধ সুবাসিত গোলাপ জলে হাত ধুয়ে তিনি রাজ-শকটে গিয়ে আরোহণ করলেন। গ্রামবাসীদের শত অনুরোধেও সেখানে কিছু খেতে রাজি হলেন না। আবার বিপুল বাদ্য-ভাণ্ডের মধ্যে তাঁর রথ গ্রাম্য পথ দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে উৎসব-প্রাঙ্গণ জনহীন হয়ে পড়ল। ছেঁড়া মালা, কাদামাখা পতাকা, অর্দ্ধছিন্ন ঝালর চারদিকে

ইতস্তত ছড়ানো। মঙ্গল-ঘট ভেঙ্গে গেছে···মেয়েদের হাতের আলপনা হাজার লোকের পায়ের পীড়নে গেছে মুছে···সন্ধ্যা নেমে এল সেই নির্জন উদ্যানে অতি চুপে চুপে···! বাঁকা চাঁদ গাছের ফাঁক দিয়ে সেই সব দৃশ্য দেখে মিটি-মিটি হাসতে লাগলো।

হঠাৎ মাটি মায়ের বুকে জাগলো মৃদু কম্পন। শিউরে উঠলো মাটি মা। সমীরণ ঝির-ঝির করে বয়ে এলো। শুধোলে, মাটি মা, তুমি এমন করে কাঁপছো কেন? আজ তোমার বুকের ওপর কত বড় উৎসব হয়ে গেল! তোমার মুখ কেন শুকনো, বুক কেন তোমার ভয়ে কাঁপছে?

অতি বেদনায় মাটি মা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লে, এ উৎসব ত আমার প্রাণে কোন আনন্দের সাড়া জাগায় নি! রাজপুত্র এলো আমার অঙ্গনে···কিন্তু মাটির স্পর্শ ত সে নিলে না। তার আর আমার মাঝখানে রইল মখমলের আস্তরণ! মাটি মায়ের স্নেহের পরশ ত' সে পেলো না! যে হাত দিয়ে সে আমের চারা রোপণ করলো তা' রাজপুরীর শ্বেত পাথরের মতোই কঠিন আর শীতল। তাতে প্রাণের স্পন্দন নেই। এই আমের চারাকে ত' আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না।

বৃষ্টির কণা উড়ে এসে মাথা দুলিয়ে বল্লে, তুমি ঠিক কথাই বলেছ মাটি মা। আমি বারি, কিন্তু আমার আহ্বান নেই এই বৃক্ষ রোপণ উৎসবে। বারিবর্ষণে যে গাছ বেঁচে ওঠে, বড় হয়—সে কথা রাজপুরীর অন্ধ-কোটরে বাস করে রাজপুত্র ভুলেই গেছে। জলের যেখানে নিমন্ত্রণ নেই—গাছের চারা সে উদ্যানে কি করে বাঁচবে?

চাঁদের কিরণ এইবার ফিক্ করে হেসে ফেল্লে। বল্লে, আমি অবিশ্যি ছোট ভাই চাঁদ, কিন্তু আমার দাদা সূয্যি ঠাকুরকেও ওরা

এ উৎসবে নিমন্ত্রণ করেনি। আগাগোড়া চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা সভা-গৃহ। ওরা জলকেও ভয় করে আর আলোকেও এড়িয়ে চলে। তাহলে গাছের চারা কি করে বাঁচবে?

সমীরণ এতক্ষণ মজা করে ওদের মতামত শুনছিল, এইবার সকলের কোঁকড়া চুল দুলিয়ে রসিকতা করে বল্লে, আর আমাকে বুঝি ওরা আমন্ত্রণ জানিয়েছে? পাছে খোলা হাওয়া গায়ে লাগে তাই সাজ পোষাক পরে এসেছে কত! যেন আমার পরশ পেলে ওরা একেবারে মূর্চ্ছা যাবে। অথচ আমি না থাকলে কারো বাঁচবারও উপায় নেই। ওই চারা গাছ তিনি রাজপুরীর শ্বেত পাথরে বুনে দিলেই পারতেন, চমৎকার ফল ফলত!

মহাশূণ্য হা-হা করে অট্টহাস্য করে উঠল। বল্লে, তোমাদেরই যখন এরা সইতে পারে না, তখন মহাশূণ্যকে চিনবে কি করে? অথচ মজা এই যে, আমার বুকে শাখা-প্রশাখা মেলে না দিলে কোনো গাছই প্রাণে বাঁচতে পারে না। রাজপুত্র কঠিন প্রীতিহীন হাতে যে চারা বপন করে গেছেন—মাটি, জল, কিরণ, বায়ু আর শূণ্যের সহযোগিতা না পেলে সে চারা শুকনো কঠিন হয়ে মাটির বুকেই দুদিন বাদে কুঁকড়ে যাবে। অথচ আমরা সবাইকে দুহাতে সেবা করতে চাই···ধনের অহঙ্কারে আমাদের সে সেবাকে ওরা অগ্রাহ্য করে।

মালির ছোট মেয়ে টুলটুল এক কোণে দাড়িয়ে এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল।

এইবার সে এগিয়ে এলো। দু'চোখ ভরা তার জল। সে বল্লে, আমি বাগানের মালির মেয়ে; নাম আমার টুলটুল, আমিও ত গাছের গোড়ায় জল দেবো, পোকা-মাকড় থেকে বাঁচাবো;

গরু-ছাগলকে তাড়িয়ে দেবো, শুক্‌নো পাতা হলে ছাড়িয়ে দেবো। আমার দুই চোখের সামনে ওরা বড় হবে। কিন্তু মজা দেখেছ …এত বড় উৎসব ওরা করলে…তবু একটিবারও আমায় কাছে ডাকলে না! ভীড় ঠেলে আমি যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু পাহারা-ওয়ালার দল আমায় দূর করে তাড়িয়ে দিলে। তোমরাই বলো না, কাজটা কি তারা ভালো করলে?

ওদিকে কারো সহানুভূতি না পেয়ে মনোবেদনায় চারা গাছটি ক্ষণে-ক্ষণে শিউরে উঠতে লাগলো! শুধু ম্লান চন্দ্রালোক তার ওপর একটি সাদা চাদর বিছিয়ে দিলে!

কৌতুক কাহিনী

বরযাত্রীর বিপদ

ট্যাপনার তের বছরের জীবনে আজ একটা উল্লেখযোগ্য দিন। অত্যন্ত আদুরে আর অতি বড়লোক বলে বাড়ীর বাইরে পা দেবার অধিকার তার আদৌ নেই।

দাদু ওকে চোখে-চোখে রাখে···পলকে প্রলয় হেরে। ইস্কুল আর বাড়ী তাও নিজেদের ঘরের মোটরে! এ ভালো লাগে কখনো? রাস্তার ধূলো কখনো পায়ে লাগে না ট্যাপনার। পাড়ার ছেলের দল—লাটিম ঘোরায়, ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়ায়, রাস্তা থেকে চানাচুর কিনে খায়···ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সবাইকার কাঁধে-কাঁধ দিয়ে বানর নাচ দেখে···জীবন যেন ওদের হালকা স্রোতে পাল তোলা নৌকো।

কিন্তু ট্যাপনার এ সব কথা চিন্তা করাও নাকি অন্যায়। আজ জীবনে প্রথম সুযোগ পেয়েছে সে।

দাদু অনুমতি দিয়েছেন—পাশের বাড়ীর পল্টুর দাদার বিয়েতে বরযাত্রী যেতে পারবে।

সারারাত স্বপ্ন দেখেছে ট্যাপ্না।

সে আর আলাদা-আলাদা—একা-একা নয়। ক্লাসের ছেলের দল ওকে ক্ষ্যাপায়—

"একটা সুরে গাই
পালে না পায় ঠাঁই"

কিন্তু আর নয়, এবার দশজনের একজন হয়ে বরযাত্রী যাবে সে। কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে, সবার পাশে—গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে, কলার পাতায় নেমন্তন খাবে ··আর আজ তাকে কোনো মতেই আলাদা ভাববার জো নেই।

সারাদিন ধরে জামা কাপড় গুছিয়েছে ট্যাপনা, গিলে করা পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি, "কিপকুল" গেঞ্জি, পাম্পস্যু, সব ঠিকঠাক্ ছিম্ছাম্ গোছানো আছে।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে টেরি বাগানো নিয়ে! মাথার চুলগুলি কি কিছুতেই বাগ মানতে চায়? চিরুণী দিয়ে যদি ডান দিকে আঁচড়ে দেয় ত' সব অবাধ্য গোরুর পালের মতো বাঁ' দিকে গিয়ে হাজির হয় তারা। চুলের কেয়ারী যদি ঠিকমতো করা না হল—তবে বরযাত্রী যাওয়াই ত বৃথা! অনেক ভেবে ঠিক করলে জল দিয়ে মাথা ভিজিয়ে তবে চুল আঁচড়াতে হবে। তবে যদি কদম-ছাঁট চুলগুলি কোনো রকমে বাগ মানে।

যদি বা কসরৎ করে সাম্লে দেয়া গেল টেরিকে···কিন্তু

পাঞ্জাবী পরতে গিয়ে চুলের তুপাশ আবার উঁচু হয়ে ওঠে। এ যেন সেই কুকুরের ল্যাজ সোজা করার মতো শক্ত কাজ হয়ে দাড়ালো! ইস্কুল যেতে হাফ প্যান্ট পরলেই চলে। কিন্তু বরযাত্রী যাওয়ার ব্যাপারই আলাদা।

সব চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে হওয়া চাই। এমন কি সিল্কের রুমালে সেন্ট্ অবধি মাখাতে হবে।

ওর খাস চাকর বিন্দে ওকে সাহায্য করতে এসে ধমক্ খেয়ে চলে গেল! না, স্বাবলম্বী হতে হবে ওকে···সব নিজের হাতে করা চাই। বোতাম লাগানো থেকে সুরু করে জুতো পরা, এমন কি রুমালটি ভাজ করে বুক-পকেটে একটুখানি বের করে রাখা অবধি।

টিপ-টাপ বরযাত্রী সেজে পল্টুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল ট্যাপনা।

দাত্থ দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুধু মুখ টিপে-টিপে হাসলে। তা'হলে লায়েক হতে চলেছে তার নাতি। লম্বা একটা বাস ভাড়া করা হয়েছে বরযাত্রীদের জন্য।

ট্যাপ্‌নার হাত ধরে পলটু গিয়ে উঠল সেই বাসে, সঙ্গে বরের বন্ধুরা। সবাইকার গা থেকে আতর আর গোলাপজলের গন্ধ ভুরভুর করছে। ট্যাপ্‌নার মনে হ'ল—একদিনে সে বড় হয়ে গেছে, —তাই ত' সবাইকার পাশে বসবার পেয়েছে সমান অধিকার। আজ আর বিন্দে ওকে খোকাবাবু বলে ডাকতে সাহস পাবে না।

কন্যা পক্ষের বাড়ীর সামনে বাস থামতে একদল ভদ্রলোক ছুটে এলেন—"আসুন-আসুন" শব্দে। ট্যাপ্‌নার সত্যি হাসি পেতে লাগলো; কোনো রকমে মুখ ছাপিয়ে উপ্‌ছে পড়া হাসি রুমালে বন্ধ করলে।

গেটের সামনে আরো দু'জন ভদ্রলোক তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বরযাত্রীদের সবাইকার গলায় দুলিয়ে দিলেন একটি করে বেল ফুলের মালা। ট্যাপনাও বাদ গেল না। তার কেবলি মনে হতে লাগলো, সে কি ইস্কুলে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতি হয়ে গেল নাকি? ভারী মজা লাগলো তার! দাদু যদি দেখতে পেতো ত' অবাক হয়ে যেতো নিশ্চয়ই। কিন্তু বিপত্তি ঘটল তার পরক্ষণেই। মালার দিকে চেয়ে পথ চলতে গিয়ে একটা কলার খোসায় হড়্‌কে পড়ে সে হুড়মুড় করে গিয়ে হাজির হ'ল সেই লোকটার ঘাড়ে—যে সবাইকার গায়ে আতর আর গোলাপ জল ছিটিয়ে বেড়াচ্ছিল।

ঝন্‌ঝন্‌ কার শিশিগুলি মেঝেতে পড়ে ভেঙে খান্‌-খান্‌। লোকজন ছুটে এলো—চারদিক থেকে। কিন্তু বরযাত্রীর সাতখুন মাপ। সবাই এসে শুধোতে লাগল, লাগেনি ত' খোকা? ট্যাপনা তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। সেই সময় তাকে বাঁচিয়ে দিলে পল্‌টু। কানে কানে বল্ল, ছাদে খাবার জায়গা হয়েছে। আয় শীগগীর আমার সঙ্গে। ওকে কিছু বলবার ফুরসৎ না দিয়ে, হাত ধরে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির পথ ধরে তর্‌তর্‌ করে ওপরে উঠে চলে গেল।

সারি সারি পাতা পড়েছে ছাদের ওপর। পল্‌টু বল্লে, চট্‌পট্‌ চলে আয় – নইলে এখুনি ভর্তী হয়ে যাবে। একটু দেরী করেছিস কি বোকা বনে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে। তারপর আবার দেড়ঘণ্টা বাদে আর এক ব্যাচ্‌।

রাতারাতি চালাক হতে চায় ট্যাপনা। কিন্তু তার পা লেগে একটি জল-ভরতি গেলাস উল্টে পড়ল এক ভদ্রলোকের পাতের ওপর। গরম পোলাও ঠাণ্ডা জলে ভিজে স্যাঁত-সেঁতে হয়ে ওঠে।

তিনি চোখ গরম করে রেগে উঠেই থেমে যান। কিন্তু বরযাত্রীর দলবল··আজ তাদের সাতখুন মাপ। কোনো দিকে না তাকিয়ে পলটুর সঙ্গে দুটি আসন অধিকার করে বসে ট্যাপনা। পরিবেশন সুরু হল দ্রুতবেগে! যেন যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে সবাই। ওকে টপকে, তাকে ডিঙিয়ে, অন্য একজনের পাশ কাটিয়ে পরিবেশন চল্‌ছে। টপাটপ পাতে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। লুচি, বেগুনভাজা, ছ্যাঁচড়া, ফ্রাই আরো অনেক কিছু। যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে—ধরে ধরে খেতে হবে। এক মুহূর্ত দেরী করবার সময় নেই···এক্ষুনি ট্রেণ ছেড়ে দেবে।

একজন মোটা ভদ্রলোক গলদঘর্ম হয়ে ছোলার ডাল নিয়ে আসছিলেন, টাল সামলাতে না পেরে একেবারে ট্যাপ্‌নার পিঠের ওপর ঢেলে দিলেন খানিকটা ঘন ডাল। আদ্দির পাঞ্জাবী একেবারে জব্‌জবে হয়ে গেল···কিপকুল গেঞ্জিকেও ভেদ করল এমন অব্যর্থ লক্ষ্য তার।

পলটু বল্লে, চুপচাপ খেয়ে যা। হাওয়া দিচ্ছে ঝিরঝিরে···দই মিষ্টি খেতে খেতে দিব্যি শুকিয়ে যাবে, ভাবনা কিরে?

পলটু যে ভাবে সমস্যার সমাধান করল ট্যাপনা কিন্তু সে ব্যবস্থাকে আরামদায়ক মনে করতে পারলো না। ঘামে পাঞ্জাবী আগে থেকেই ভিজে ছিল—তারপর এই ডালের কোটিং! যেন নরম পাউরুটীর উপর জেলি মাখিয়ে দিয়েছে কেউ!

ভোজন পর্ব সমাধা হলে পলটু বল্লে, চল সকলকার আগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই, রাস্তায় দাঁড়ালে আরাম পাবি। তার পর আমরা দু'জন আগেই না হয় বাসে করে পালিয়ে যাবো 'খন।

এ যুক্তি মন্দের ভালো ভেবে ট্যাপ্‌না পলটুর পেছন পেছন নেমে এলো, বাইরে ফুটপাতে বেরিয়ে বাড়ীর যে দিকটা অন্ধকার

সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালো। পাঞ্জাবীটির শোচনীয় অবস্থাটা এখন কারো চোখে পড়বে না।

কিন্তু কে জানত অন্ধকার ব'লে বিপদ সেখানে আরো বেশী।

ছাদের ওপর থেকে এক ঝুড়ি এঁটো-কলাপাতা আর ভাঙা গেলাস ট্যাপ্‌নার মাথার ওপর এসে পড়ল—ঠিক যেন অভিষেকের পর রাজমুকুটের মতো! চোখ মেলে তাকাবারও অবস্থা রইল না তার!

ট্যাপ্‌না মনে মনে বল্লে, মা বসুন্ধরা, তুমি দু'ফাঁক হয়ে যাও—আমি তোমার ভেতর সেঁধিয়ে পড়ি। মা বসুন্ধরা সীতার অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন—কিন্তু ট্যাপ্‌নার বেলায় একেবারে নট্-নড়ন-চড়ন-নট্-কিচ্ছু হয়ে চুপচাপ রইলেন!

হায় বরযাত্রী !!

"বদলে গেল খঞ্চা"

খঞ্চাকে পাড়ার কেউ দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। অভিভাবকের দল বাড়ীর ছেলেদের ডেকে বলেন, খবরদার, কেউ খঞ্চার সঙ্গে মিশ্‌বিনে।

মায়েরা বলেন, খঞ্চা ত' চোর, ওর সঙ্গে ছেলে-মেয়েকে মিশতে দেয়া মানে তার পরকাল ঝরঝরে করে তোলা!

কারো সঙ্গে খেল্‌বার সুযোগ না পেয়ে খঞ্চা আরো বেশী দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠছে।

সেদিন চৌধুরী বাড়ীর কুকুরটার ল্যাজে চট্‌পটি বেঁধে দিয়ে পাড়ায় হুলুস্থুলের সৃষ্টি করেছিল কে? শ্রীমান খঞ্চা ছাড়া আর কেউ নয়।

পাড়ার মধ্যে অনেকগুলি খেলার মাঠ। তাতে ভাগে ভাগে জুটে ছেলেরা খেলা করে, আর মেয়েরা খেলায় মাতে আর দু'টি ঘেরাও করা যায়গায়।

খঞ্চার প্রকৃতি সবাই এত বেশী জেনে ফেলেছে যে, এর কোনো মাঠেই তার ডাক পড়ে না।

বেচারী কখনো এ মাঠে, সে মাঠে ঘুরে বেড়ায় ; কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। নোঙরহীন নৌকোর মত ভেসে ভেসেই তার দিন কাটে।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে কখনো ভাব কখনো আড়ি ; কিন্তু খঞ্চাকে সবাই চিরকালের জন্যে আড়ি দিয়ে রেখেছে ! বেচারীর দিন যেন আর কিছুতেই কাটতে চায় না।

খঞ্চা সেদিন মাঠের এক ধারে বসে বসে ঠিক করলে, বদনাম যখন হয়েই গেছে তখন ভালো করে একটা কাণ্ড করা যাক্। সে একা বটে, তবে ইচ্ছে করলে সবাইকার খেলা একদিন বন্ধ করে দিতে পারে।

খঞ্চার প্রতাপটা সবাই দেখুক।

তার পরদিন পাড়ার ছেলেরা খেলার মাঠে এসে দেখলে, রাতের অন্ধকারে কে যেন সবগুলি গোল পোষ্টে কেরোসিন ঢেলে তাতে আগুন লাগিয়ে একেবারে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে।

মেয়েরা তাদের মাঠে পৌঁছে একেবারে হতাশ হয়ে গেল। দোলনাগুলো ছেঁড়া, স্কিপিং এর দড়িগুলো পোড়া, নাগর দোলার অবস্থা দেখে মনে হল তার কাঠগুলি একসঙ্গে করে উনুনে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই।

ছেলেরা দল বেঁধে জটলা পাকাতে লাগলো, কার এই কাজ ? আর মেয়ের দল কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে গেল।

সেদিন পাড়ায় খেলা-ধূলো একেবারে বন্ধ। কিন্তু খঞ্চার সেদিন মনে মনে কি উল্লাস!

সে একা মানুষ কিন্তু সবাইকার মুখ চূর্ণ করে দিয়েছে নিজের চেষ্টায়!

আর কেউ তার সঙ্গে লাগতে আস্‌বে?

কিন্তু দুষ্কর্মের একটা অসুবিধা হচ্ছে এই যে, একটা-না-একটা সাক্ষী কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে। ধূমকেতুর মত বেরিয়ে সে সব কথা বলে দেয়।

পাড়ার গোবিন্দের মা খঞ্চার সঙ্গে এই শত্রুতাটা করল! মাঠের কোনে-কোনে ঘুঁটে দিয়ে তাই বিক্রী করে কোনো রকমে সে নিজের ভাত-কাপড়ের জোগাড় করে নেয়।

সে রাত্তিরে একটা মাঠে ঘুঁটে কুড়িয়ে নেবার কথা গোবিন্দের মা একেবারে ভুলে গিয়েছিল!

একটু বেশী রাত্তিরে সে এসেছিল একটা ঝুড়ি নিয়ে—ঘুঁটে-গুলো কুড়িয়ে নিতে। দেখে, অন্ধকারের মধ্যে খঞ্চা গোল পোষ্টে একটা বোতল থেকে কি যেন ছিটিয়ে দিচ্ছে।

ঘুঁটে কুড়ুনি গোবিন্দের মাকে সে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করেনি। আর গোবিন্দের মাও ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারেনি বলে তাকে কোনো কথাই জিজ্ঞেস্ করে নি।

কিন্তু সেই গোবিন্দের মা-ই হল খঞ্চার দুষ্কর্মের প্রধান সাক্ষী।

ছেলে-মেয়েদের কাছে যখন আসল ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল, তখন খঞ্চা আরো সবাইকার চোখের বিষ হয়ে উঠল।

খঞ্চার সঙ্গে যা-ও-বা দু' একটি ছেলে কথা বল্‌ত—এই গোল পোষ্ট পুড়িয়ে দেবার ফলে তারাও ওর শত্রু হয়ে দাঁড়ালো।

কেননা, খেলায় বাধার সৃষ্টি করলে দুষ্টু ছেলেরাও সহ্য করবেনা।

এখন খঞ্চার সারাটা দিন একেবারে ভার-বোঝা বলে মনে হল। বাড়ীতে ত' সব সময় দূর-দূর ছাই-ছাই লেগেই আছে। তারপর বাড়ীর বাইরে সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

সেদিন খঞ্চা রাগ করে গোটা কয়েক টাকা পকেটে পুরে পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল! আজ আর এ অঞ্চলেই সে থাক্‌বেনা। অন্য পাড়ায় বন্ধু খুঁজে নেবে; আগে দোকানে পেট পুরে মিঠাই খাবে···এই তার মতলব।

অনেকটা দূর গিয়ে একটা লোককে সে ডাক্‌লে; বল্লে চলো ভাই, আমরা একটা দোকানে গিয়ে মিঠাই খাই। তুমিই আমার বন্ধু হবে—

ছেলেটা বল্লে, না ভাই, আমি আমার ভাইয়ের জন্যে বার্লি কিন্‌তে এসেছি। এক্ষুণি আমাকে ইস্কুলে যেতে হবে। এই বলে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

খঞ্চা দেখলে একটা বুড়ী পথ চলতে পাচ্ছে না।

খঞ্চার কি মনে হল, সে রাস্তার পাশ থেকে একটা লাঠি জোগাড় করে তার হাতে দিয়ে বল্লে, এই লাঠিতে ভর দিয়ে তুমি পথ চলো, আর তোমার কোনো অসুবিধে হবেনা।

বুড়ী দু'হাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করলে।

খঞ্চার কিন্তু ভারী আশ্চর্য মনে হল। কেউ ত' তাকে ভালো কথা বলে না। আশীর্বাদ ত' দূরের কথা।

আনন্দে শীষ দিতে দিতে সে এগিয়ে চলে।

আরো খানিক দূর যাওয়ার পর সে দেখলে একটা ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

খঞ্চা শুধোলে, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন ভাই?

ছেলেটি বল্লে, আমার পয়সা নেই যে বই কিনি। মাষ্টার মশাই বলেছেন, বই না নিয়ে ইস্কুলে গেলে মারবেন। বল ত' আমি কি করি? খঞ্চা এক মুহূর্ত কি ভাবলে। তারপর পকেট থেকে একটা টাকা তুলে ছেলেটির হাতে গুঁজে দিলে, তারপর, আপন মনে শীষ দিতে দিতে এগিয়ে চল্লো।

ছেলেটি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

খঞ্চা পথ চল্‌তে থাকে।

হঠাৎ দেখে একটা বুড়ো অন্ধ ভিক্ষুক কিছুতেই রাস্তা পার হতে পারছে না।

সে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে তাকে রাস্তা পার করিয়ে দেয়।

অন্ধ হাত তুলে বল্লে: তোমার জয় জয়কার হোক বাবা।

খঞ্চার ভারী ভালো লাগে।

সে শীষ দিতে দিতে আবার পথ চলে।

খানিকটা চল্‌বার পর দেখে পথের পাশে এক গাছের তলায় শুয়ে আছে এক ভিখারিণী। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে ধরে কাঁদছে,—তিন দিন কিছু খাইনি মা—খেতে দাও।

ভিখারিণী কথা বল্‌তে পারছে না।

দেখে মনে হল—এক্ষণি সে মরে যাবে।

খঞ্চা পকেট থেকে দু'টি টাকা ছেলেমেয়েদের হাতে দিয়ে বল্লে, শীগগির খাবার কিনে এনে তোমাদের মাকে খাওয়াও, নিজেরা খাও। নইলে তোমাদের মা মরে যাবে।

ছোটর দল আনন্দে কোলাহল করে ওঠে।

সেই আনন্দের কলরব খঞ্চার কানে যেন মধু-বর্ষণ করে।

তার মনে হয়—পৃথিবী এত সুন্দর।

সবাইকার ভালোবাসা, স্নেহ পেলে মানুষ যেন আর কিছু চায়না।

খঞ্চা ভাবে তার মনে কি সত্যযুগ ফিরে এলো ?

সে ভাবে আর পথ চলে।

জোরে জোরে আপন মনে শীষ দিতে থাকে।

গান বনাম নাক

কল্‌কাতা শহর পায়ে হেঁটে চষে ফেলেছে উদোরাম। সবাই তাকে ঠাট্টা করে বলেছে যে, চন্দ্রলোকে বরং চেষ্টা করলে জমি লিজ নিতে পারা যায় কিন্তু কল্‌কাতা সহরে একফালি ঘর মিলবে না।

আর সত্যি কথাই তো !

বাড়িয়ে তারা কিছুই বলেনি।

লোক আসছে জলের স্রোতের মতো। বিহার অঞ্চলে কৃষাণরা ক্ষেতে জল দেবার সময় যেমন ইন্দারা থেকে তুলে একটা লম্বা নালির ভেতর দিয়ে হুড় হুড় করে ঢেলে দেয়, ঠিক তেমনি জ্যান্ত মানুষ দু'বেলা ঢেলে দিচ্ছে শেয়ালদা ষ্টেশনে !

এই লোকগুলো খায় কি—থাকে কোথায় ? সারা কল্‌কাতায় তো তারা ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং একটি ঘর মিলবে কোথায় ?

উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম কোনো দিকে বাকি রাখেনি উদোরাম।

কিন্তু হতাশ হয়ে বসে পড়বার ছেলে সে নয়। পুরুষকারের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস।

অবশেষে সুরেন ব্যানার্জি রোডের গলির মধ্যে এক বিরাট ফ্ল্যাট বাড়িতে মিললো একখানি ছোটো ঘর। তাতে তার বিন্দুমাত্র

আপত্তি নেই। একা মানুষ। কাজেই একখানি ঘরই তার কাছে রাজার প্রাসাদ।

তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নিল। আবার অফিস যেতে হবে তো। সে অফিস কামাই করতে একান্ত অনিচ্ছুক। খিদিরপুর ডকে কি একটা কাজ করে সে।

উদোরাম হাসি-খুসী কাজের মানুষ। তাই ডকের সবাই তাকে ভালোবাসে, দেখা হলেই হাসি মুখে কুশল প্রশ্ন করে সকলে। মোট কথা উদোরাম ওখানে জনপ্রিয় ব্যক্তি।

উদোরামের মুখের হাসির সঙ্গে আর একটা জিনিষ সর্বদাই সমানভাবে তাল দিয়ে চলে, সেটি হচ্ছে তার কণ্ঠের গান। ইংরেজী অক্ষর 'কিউ'র পাশে যেমন 'ইউ', লরেলের পাশে যেমন হার্ডি, রামের পাশে যেমন লক্ষ্মণ, পরীক্ষার পাশেই যেমন পড়া—ঠিক তেমনি উদোরামের মুখের হাসির সঙ্গে কণ্ঠের গান পাল্লা দিয়ে চলে!

এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। খিদিরপুর ডকের সহকর্মীরা দেখে শোনে আর মুখ টিপে মুচকি হাসে!

নতুন ঘর পেয়ে উদোরামের উৎসাহ আর পুলক একটু অধিক-মাত্রায় বেড়ে গেল। তাই সে বাসায় ফিরে জুতো-জামা না খুলেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ে প্রাণ খুলে গান জুড়ে দিল!

উদোরাম লোকটি সত্যি সৌখীন। তাই সে ঘরে দুটো বাল্‌ব লাগিয়েছে। সন্ধ্যের পর যখন বই-পত্তর পড়বে কিম্বা শুয়ে শুয়ে রোমাঞ্চ-সিরিজে মগজে চাঞ্চল্যের জাল বুনবে তখন জ্বালবে জোরালো আলো। নইলে একটি সবুজ আলো জ্বেলে প্রাণ খুলে সে গান গাইবে।

পরিকল্পনা শুনতে ভারী ভালো।

গলা ছেড়ে হঠাৎ তার মনে হল যে, তাইত! সবুজ আলো তো জ্বালা হয়নি!

তাড়াতাড়ি উঠে জোরালো বাল্‌বটা নিভিয়ে দিয়ে সবুজ-আলোর সুইচ দিল টিপে।

সবুজ আলোর সত্যি একটা মোহ আছে। এই কল্‌কাতার সহরে চাঁদের আলোকে ঠিক চেনা যায় না; কখন সে আসে, কখন পালিয়ে যায় ধোঁয়া ও ধূলোর দেশে তার হদিশ পাওয়াই শক্ত! কিন্তু এই সবুজ আলো চাঁদের জ্যোৎস্নার একটি চমৎকার আমেজ নিয়ে আসে মনে। নইলে এই আলোটি জ্বালতেই উদোরামের মনে গলা ছেড়ে গান গাইবার বাসনা জাগে কেন? মনে হল, এ জগতে তার চাইতে সুখী আর কে আছে? উদারা-মুদারা তারা—গলা সপ্তমে চড়ে গেল।

হঠাৎ বন্ধ ঘরের দরজায় দ্রুত করাঘাত শোনা গেল। অসময়ে তার কাছে এলো কে?

বন্ধু-বান্ধবেরা তো আর নতুন বাসার ঠিকানা এখনো জানে না! তবে কি ভুল করে অন্য লোক এসে এমন সময় ছন্দ পতন করে দিচ্ছে?

উদোরাম বিছানা ছেড়ে ওঠবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে মনের আনন্দে গলাটা আরো ছেড়ে দিলে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাইরের করাঘাত দ্রুততর এবং প্রবলতর হয়ে উঠল।

নাঃ! এর পর না উঠলে আর কণ্ঠের সঙ্গীতকে কোনোমতেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে না। ভাবলে, এই বাজে লোকটাকে বেশ করে ধম্‌কে দেবে।

কিন্তু দরজা খুলেই উদোরামের চক্ষু একেবারে চড়কগাছ !

আবলুস কাঠের মতো রঙ এক বিশালকায়া ফিরিঙ্গি মহিলা। হাতে তার রুটি তৈরী করবার মজবুত বেলুন। হেঁড়ে গলায় বল্লেন, দেখ বাছা, বয়েস তো তোমার অল্পই দেখছি। কিন্তু এটা পাগলা গারদ নয়। ফের যদি উল্লুকের মতো এমনভাবে চ্যাচাবে—তবে আমার এই শক্ত হাতের বেলুন তোমার মাথায় ভাঙবো। মনে থাকে যেন !

কৃষ্ণকায়া মহিলা যেমন নাটকীয়ভাবে এসেছিলেন, ঠিক সেই ভাবে তার সঙ্গে সমতা বজায় রেখে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

উদোরাম বুঝতে পারলে, ইনি তার প্রতিবেশিনী !

খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুল না। বাজে-পোড়া নারকেল গাছের মতো দরজার সামনে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল !

জীবন থেকে গানই যদি চলে যায় তবে প্রাণ বাঁচবে কি করে ?

মোট কথা, সে রাত্তিরে উদোরামের গানের সমস্ত প্রেরণা একেবারে কর্পূরের মতো উড়ে গেল !

বহুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর তার হঠাৎ মনে হল,—গানই না গাইলে যদি বা চলে, কিছু পেটে না পড়লে সারা রাত ঠায় খারাপ করে বসে থাকা শক্ত ! একখানি ঘরে রান্নার কোন পা সে রাখেনি। হোটেল থেকে রুটি আর মাংস কিনে নিয়ে এসেছিল, তাই খেয়ে নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে সবুজ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সন্ধ্যের পর আবার সবুজ আলোটা জ্বালিয়ে দিতেই উদোরামের প্রাণে নতুন করে গানের জোয়ার জাগলো।

কিন্তু গান গাইলেই তো হবে না! পাশে রয়েছে পর্বতসদৃশ প্রতিবেশিনী। গান গেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা হতে পারে, কিন্তু ডাণ্ডায় যদি মুণ্ডটা ভেঙে যায় তবে খুব স্বাস্থ্যকর ব্যাপার হবে বলে মনে হল না।

এই সমস্যাসঙ্কুল জীবন নিয়ে উদোরাম ক্রমাগত পায়চারী করে বেড়াতে লাগলো।

হঠাৎ ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা তার মনে জেগে উঠল। সে যদি তার ঘরে বসে প্রাণের আনন্দে কণ্ঠ ছেড়ে গান গায়—তবে কার কি বলবার থাকতে পারে?

না—না—, এ অন্যায় জুলুম সে কোনোমতেই সইবে না।

তার প্রতিবেশিনীর যদি ঘুমুতে ভালো লাগে, আর সে যদি গলা ছেড়ে গান গাইতে চায়—তবে কারো সঙ্গে কারো ঝগড়া নেই। তিনি যত খুসী নাক ডাকিয়ে ঘুমোন, আর সে যত ইচ্ছে গলা ছেড়ে গান গাক—

সমস্যাটার এমন সুন্দর সমাধান হল দেখে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লে।

এখন তাহলে উদোরামের গান গাওয়ানো আটকায় কে?

মনের আনন্দে সে সপ্তমে গলা ছেড়ে দিলে।

সবুজ আলো জ্বলছে—

ঝির ঝির করে হাওয়া আসছে দক্ষিণের জানালা দিয়ে, দূরে বোধ করি একটা নাম না-জানা পাখীও ডেকে গেল—উদোরাম চোখ বন্ধ করে মনের আনন্দে গান গেয়ে চলেছে···

মনে হচ্ছে,—স্বর্গপুর—সে কতদূর?

এমন সময় অতর্কিত নৈশ-আক্রমণের মতো আবার সেই দ্বারে করাঘাত।

উদোরামের মীমাংসাটি মনে মনে এক তরফা হয়েছিল। এখন পর্বত-সদৃশা-প্রতিবেশিনীর সম্মুখীন হতে হবে এই কথা ভেবেই তার বুক দুর-দুর করতে লাগলো।

হাতে একটা কিছু নিয়ে সে দরজা খুলবে কিনা,—এই কথা প্রথমে তার মগজে এলো।

কিন্তু ওদিকে দরজায় ধাক্কা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে! যা থাকে কপালে দড়াম করে উদোরাম ছিটকিনি খুলে বুক উঁচু করে দাঁড়ালো।

প্রতিবেশিনী হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন, তোমায় কালকেই বারণ করে দিয়েছি না—এ রকম হেঁড়ে গলায় গান গাওয়া চলবে না। এটা পাগলা গারদ নয়?

অনেক কষ্টে মনে সাহসের সঞ্চার করে উদোরাম উত্তর করলে, আমি ঘর ভাড়া করেছি, আমার ঘরে আমি যা খুসী করবো, তাতে আপনার আপত্তি করবার তো কথা নয়।

পর্বত-সদৃশা-প্রতিবেশিনী বল্লেন, দেখ হে ছোকরা, বেশি কথা কাটাকাটি আমি পছন্দ করিনে। ফের যদি তোমার হেঁড়ে গলার গান শুনি তবে তোমার ওপর আমি কুকুর লেলিয়ে দেবো। এই টেবি—

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে একটা ডালকুত্তা গাঁ-গাঁ করে ছুটে এলো। দেখে মনে হলো—এর যে কথা সেই কাজ।

প্রতিবেশিনী আঙুল দিয়ে ওকে দেখিয়ে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ডালকুত্তাটা ওর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গীতের এমন অপমান ইতিপূর্বে আর কোথাও হয়েছে কিনা, উদোরামের জানা নেই। সে প্রাণের ভয়ে বুকফাটা চীৎকার করে উঠল।

বোধ করি তখন পাষাণী-প্রতিবেশিনীর একটু দয়া হল। তিনি বরাভয় মূর্তিতে আঙুল নেড়ে টেবিকে ডেকে বল্লেন, টেবি, এখন ঘরে যাও; তবে এই পাগলাটাকে চিনে রাখো। দরকার হলেই ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। তারপর উদোরামের দিকে একবার তাকিয়ে বল্লেন, আশা করি ছোকরা কথাগুলি তোমার মনে থাকবে।

এর পর থেকে উদোরামের কণ্ঠের গান যেন একেবারে মিয়োনো মুড়ির মত নেতিয়ে পড়ল।

যখুনি সপ্তমে একটা তান ধরতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ী থেকে টেবি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ওঠে।

রাত্তিরে দুঃস্বপ্ন দেখে বারে বারে ওর ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয়, কে যেন ওর টুঁটি কামড়ে ধরেছে। অথচ মুস্কিল এই যে, সবুজ আলো জ্বাললেই ওর কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। একদিন শেষকালে রাগ করে উদোরাম সবুজ আলোর বাল্‌বটা জুতো ছুঁড়ে ভেঙে ফেল্লে।

যাক, এইবার গান আর তাকে পাগল করবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে অন্তত রাতটা ঘুমোনো চলবে।

তার গান যখন একেবারে থেমে গেল তখন ঘুমুবার জন্যে পরিপাটি বিছানা করে সে শুনতে পেলো—তার প্রতিবেশিনীর নাক তারস্বরে ডাকছে!

অভিযান কাহিনী

নিশিপট

ইস্কুলের পাশের পরীক্ষা হয়ে গেল। সাম্‌নে বড়দিন।

ভেবেছিলাম, এই কটা দিন মজা করে সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস দেখে পরীক্ষার পড়া তৈরীর কষ্টটা বেমালুম ভুলে যাবো। কিন্তু পিসিমার জন্যে সেটি হ'বার জো' নেই।

চুপি চুপি জামাটা গায়ে তুলে বেরুতে যাচ্ছি—পেছন থেকে টিক্‌টিকির হাঁচির মতো পিসিমার ডাক কানে গেল, ওরে বঙ্কা, চুপ করে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিস যে বড়ো? থম্‌কে দাঁড়ালুম। মাথাটা একবার চুল্‌কে নিয়ে বল্লাম—ইস্! পালাতে

যাবো কেন? আমি কি চুরি করেছি নাকি? নতুন জামাটা তৈরী করিয়েছি—গায়ে 'ফিট্' করেছে কিনা তাই দেখছি!

হুঁ-হুঁ! নতুন জামা! ও আমি বুঝতে পারি! গেল পূজোর সময় আমিই তোকে ঐ জামাটা তৈরী করে দিয়েছিলাম না? পিসিমা বল্লেন। ভালো করে তাকিয়ে দেখি তাইত! এ ত' পিসিমার দেয়া জামাই বটে! একেবারে দারোগার কাছে বামাল সমেত ধরা পড়ে গেছি! বুঝলাম আর কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। শান্ত সুবোধ ছেলেটির মতো জিজ্ঞেস করলাম, কি বল্‌বে বল। পিসিমা বল্লেন, জানিস নে বুঝি? এই বাড়ীতে আর লোকে থাকতে পারে? দরজা-জানালাগুলো নড়বড় করছে। এক ধাক্কার তর সইবে না! কাল রাত্তিরে শুনেছি পাশের বাড়ী চুরি হয়ে গেছে। আমাদের বাসায় আজকে চোর ঢুক্‌বে কিনা কে জানে!

বল্লাম, তুমি যে সাত কাণ্ড রামায়ণ খুলে বসলে পিসিমা! কি করতে হবে সোজা কথায় বল। বাড়ী খুঁজে বের করতে হবে এই ত? পিসিমা মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে জবাব দিলেন, সেটাও কি মুখ ফুটে আবার বলে দিতে হবে নাকি? দাদা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত, তাঁর নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। তুই যদি এই বড়দিনের ছুটির ভেতর একটা বাসা খুঁজে বের করতে না পারিস তবে এই ভাঙা বাড়ীতে কবে চোর-ডাকাতের হাতে প্রাণ যাবে দেখচি। দেখলাম, কেবল কথার ওপর কথা জমে কথার-পাহাড় হয়ে উঠছে। তাই তাড়াতাড়ি দাঁড়ি টান্‌বার জন্যে বল্লাম, আচ্ছা, তাই হবে পিসিমা। আমি এক্ষুনি বাড়ী দেখতে বেরুচ্ছি।

পড়ে রইল সিনেমা, পড়ে রইল থিয়েটার, এমন কি কলকাতায় নতুন এসে যে 'জাইগান্টিক' সার্কাস শহর জোড়া নাম

কিনে ফেলেছে তা-ও এক দিনের জন্য দেখা হল না! বল্‌তে গেলে সব শিকেয়ই তুলে রাখলাম। তার বদলে সুরু করলাম—টালা থেকে টালিগঞ্জ অবধি বাড়ী দেখা।

প্রথম কথা, যুদ্ধের হিড়িকে বাইরে থেকে এত লোক কলকাতায় এসেছে যে, তাদের চাহিদায় TO LET কথাটা বাড়ীর গা থেকে একেবারে উঠে গেছে বল্লেই চলে; যেমন নাকি আজকাল অ-আ-র পাতা থেকে '৯' টা একেবারে তামাদি হয়ে গিয়েছে।

তারই ভেতর কৌশল করে, ভদ্রতা বাঁচিয়ে, লোকের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে নিত্যি নতুন বাড়ী দেখে বেড়াতে লাগলাম।

কত রকম বাড়ী যে দেখলাম তার আর ইয়ত্তা নেই। কেউ গোটা বাড়ী ভাড়া দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, কিন্তু এমন দর হাঁকলেন যে, মনে হল বাড়ীর প্রত্যেকটি ইট বোধ করি মধুতে ভর্ত্তি। কেউ বা বল্লেন যে, নীচে একটি ঘর আর তেতলায় একটা ঘর নেয়া চলতে পারে। চাকর দিয়ে জল টেনে তুলতে হবে। কেউ বা এই আশ্বাস দিলেন যে, বাড়ীর এক তালাটা ভাড়া পাওয়া যেতে পারে কিন্তু কল ঘরের চাবি বাড়ীর মালিকের হাতেই থাকবে; তিনি যখন দয়া করে ওটা খুলে দেবেন তখন আমরা অবশ্যই ব্যবহার করতে পারবো। এমনি করে বহু রকম বাড়ী এবং তার নানা রকমের মজাদার ব্যবস্থা দেখতে দেখতে—মন্দের-ভালো বলে একটি বাসা আমার পছন্দ হল। বাড়ীতে ঢোকবার রাস্তাটা খুব সরু বটে তবে ভেতরটা খুব অপছন্দের নয়। হয়ত এতটা গলির ভেতর বলেই বাসা-অনুসন্ধানকারীরা এর হদিশ পেয়ে ওঠে নি। একটু পুরোনো ধাঁচের বাড়ী, তা হোক। নির্জ্জন, খোলা-মেলা, ওপরের ছাদে একটি মাত্র ঘর। ঐ ঘরের প্রলোভনে পড়েই

বাড়ীটা নেয়া স্থির করলাম। সকলের আগে পিসিমার বাড়ীটি পছন্দ হয়ে গেল। হয়ত বা তাঁর বিশ্বাস হল যে, চোরেরা এতখানি খোঁজ করে এত গলির মধ্যে কোনো মতেই চুরি করতে আসবে না! তাই তিনি অত সহজেই সম্মতি দিয়ে বসলেন। আমারও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

ছাদ থেকে সিড়ি দিয়ে নামবার মুখে কয়েক ধাপ নীচে আরও একটি ছোট কুঠ্‌রী ছিল। পিসিমা খুশী মনে দাঁতে মিশি দিয়ে বল্লেন, এই ঘরটা হবে আমার ঠাকুরঘর। এইখানে বসে আমি নিরিবিলি মালা জপ করবো। যাক্, অজান্তে পিসিমাকে এতখানি খুশী করতে পেয়েছি জেনে আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। অন্তত এইটুকু আরামের আর নির্ভাবনার কথা যে, চট্ করে পিসিমা আর বাড়ী বদলাবার জন্যে ক্ষেপে উঠবেন না। আমার নিজের পছন্দ করা খান কয় ছবি ছিল। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, টলষ্টয়, রোমা রোলাঁ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি। এই ফটোগুলো দিয়ে আমি আমার নিজের ঘরটিকে (যখন যেখানে থাকি) মনোমত করে সাজাই। এই কাজটি না হলে রাত্তিরে যেন আমার ভালো করে ঘুমই হয় না। যে দিন বাসা বদলানো হল—সারাদিন দারুণ খাটুনি। গোটা সংসারটাকে গন্ধ-মাদনের মতো এক যায়গা থেকে তুলে এনে আর একটি যায়গায় ছুঁড়ে ফেলা বৈ ত নয়! তারপর রয়েছে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখবার পর্ব্ব। বাসায় আমি একমাত্র অকেজো লোক বলে সমস্ত ঝক্কিটা আমার মাথার ওপর দিয়েই গেল। পিসিমার আর কি! অনবরত তার রসনা শুধু চলছেই। বক্কা, শিল-নোড়াটা নেয়া হয়েছে? পুরোণো তেঁতুলের হাড়িটা? ...ডালের কাঁটাটা আবার ভুলে বসে থাকিস নে বাপু! এমনি

সমস্তটা দিন ধরে অফুরন্ত এবং অনর্গল আদেশ শুনে আর সেই সঙ্গে সেই আদেশ পালন করে আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে শরীরের যে যায়গাটা একটু ছোঁয়া যায় অমনি ব্যথায় টন্-টন্ করে ওঠে! ভাবলাম, সেদিন আর ফটোগুলো টাঙাবোনা। নতুন বাসায় এসে আমার কাজের এই ব্যতিক্রম জীবনে প্রথম হল। কিন্তু উপায় ছিল না, কেননা সেই উৎসাহজনক কাজেও দেহ আর মন কোনো মতেই সায় দিলে না।

রাত্তির তখনো খুব বেশী হয় নি। কিছু খাবোনা জানিয়ে সকাল সকাল গা-টা গড়িয়ে দিলাম বিছানায়। পিসিমার হয়ত একটু দয়া হল,—তিনি আর আমায় খাবার জন্যে সে রাতে বিশেষ পীড়াপিড়ি করলেন না। নইলে অন্যদিন হলে রাত-উপোষী থাকবার যো' ছিল? কেঁদে কেটে হয়ত একেবারে অনর্থ করে ফেলতেন। 'সোনার দেহ' নাকি তাহলে 'কাঠির' মত হয়ে যায়!

শুয়ে পড়লাম বটে……কিন্তু ঘুম যেন……এসে-এসে আবার ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো। চমৎকার ঘর……একটু পুরোণো বাড়ী বটে, কিন্তু দক্ষিণের জানলা দিয়ে ঝিরঝিরে হাওয়া আস্‌ছে। শীতের রাত হলেও একটা আলোয়ান গায়ে দিয়ে হাওয়াটা বেশ মিঠে লাগছিল, বিছানাটাও বেশ গদির ওপর করা। আরাম আর আয়েসের কোনো অভাব নেই। এ যেন সুন্দর ধবধবে বিছানার এক কোণে একরত্তি একটা ছারপোকার মতো! মূর্তিমান বিঘ্ন…… কুটুস কামড়ে কিছুতেই ঘুমুতে দেবেনা! ঘরটার যেন আলাদা কি এক সম্মোহনী-মায়া আছে। চোখটা একটু বেশীক্ষণ ধরে বুঁজে থাকতে চায়না। হয়ত মনে হয়, কে যেন প্রতীক্ষা করে আছে…হয়ত তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে। তাড়াতাড়ি বোজা চোখকে

খুলে ফেলতে হয়। এই একবার বন্ধ করা আবার খোলার হ্যাঙ্গামায় ঘুম বেচারী চোখের কোণে জায়গা করে নিতে পারে না! এমন অসুবিধাতেও লোকে পড়ে! ঘুমের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে অথচ ঘুমুবার যো নেই। এ যেন পাতের সাম্‌নে এক হাঁড়ি ভালো রসগোল্লা··· কিন্তু মুখ খোলবার যো নেই···একেবারে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা!

এই অবস্থাতেই একাত্‌-ওকাত্‌ হতে হতে কখন যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম জান্‌তেও পারিনি। হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর গুমোটে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই সোজা দৃষ্টি পড়ল গিয়ে দেয়ালের ওপরে। ওখানে একখানি ছবি টাঙানো। কৈ, নতুন বাসায় এসে ত' আমি ছবি টাঙাইনি। তবে কি আগে থেকে বাড়ীওয়ালাদের কোনো ছবি এখানে ঝোলানো ছিল? তাও ত' মনে পড়ছে না। ভালো করে চোখ কচ্‌লে আবার দেয়ালের দিকে তাকালাম। অনেক সময় দেয়ালে নানা রকম দাগ পড়ায় এক-একটা অদ্ভুত ছবি হয়ে দাঁড়ায়। কোনটা বা হাতি, কোনটা ভাল্লুক কোনটা একটা বুড়ো মানুষের মতো। একটু ভালো ভাবে নজর করে দেখলে যে কোন পুরাণো বাড়ীর দেয়ালে এই জাতীয় দু-একটা ছবি চোখে পড়ে। এ ছবিটা অনেকটা সেই রকম। হঠাৎ জেগে মনে হয় একটা ফটো ঝোলানো; কিন্তু আদপেই তা নয়। দেয়ালের নানা রকম আঁকা-বাঁকা রেখার মাঝখান থেকে ছবিটি দিব্যি ফুটে উঠেছে। আরও একটা অবাক হবার কথা এই যে, শোবার সময় আমি ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়েছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেয়ালের গায় ঐ ছবিটি এত পরিষ্কার হয়ে চোখে ধরা পড়ছে কি করে?

আরও মজার কথা এই যে, মুখটির দিকে চেয়ে মনে হয় কোথায় যেন ওকে দেখেছি! কোন ভীড়ের মধ্যে, কোন প্ল্যাটফর্মের ধারে,

দোকানে কিম্বা কোন অজ পাড়াগাঁয়ের মেলার মধ্যে তা অনেক ভেবেও ঠাহর করতে পারলাম না! তবে মনে হয় লোকটা কোন-না-কোন দিনও আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কে বল্‌তে পারে গত বছর সরস্বতী পূজোয় ইস্কুলে থিয়েটার করে বেশী রাত্তিরে ফিরতি মুখে মেছোবাজারের মোড়ে ওকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম···তারপর হয়ত লোকটা আমার পেছু নিয়েছিল। সেই এক রাত্তিরে শুধু দেখা, তবু মুখখানা ভুলতে পারিনি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি···চোখ দুটো বসা কিন্তু একেবারে আগুনের ফুলকির মতো, যেন অন্ধকারে প্রদীপের-মতো জ্বলছে। কে জানে হয়ত ঐ চোখের ভেতর কত কথা লুকিয়ে আছে। তাই বল্‌বার জন্যে ও আঁকু-পাঁকু করে ফিরছে। কি আশ্চর্য! এমনি ছবি, কিন্তু তবু যেন মনে হয় ওর প্রাণ আছে···হয়ত চেষ্টা করলে কথা বল্‌তে পারবে। পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম, তবু মনে হতে লাগলো ও যেন চোখ দিয়ে আমায় টানছে···যেমন নাকি দুষ্টু ছোট ছেলেরা মায়ের আঁচল ধরে টানে তার দিকে মুখ করে শোবার জন্যে! নাঃ, ঘুমুতে আমাকে হবেই···জোর করে চোখ দুটো বন্ধ করে রাখলাম।

পরদিন সকালে অনেক দেরীতে ঘুম ভাঙলো। হঠাৎ মনে হল, কাল রাত্তিরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি···কিন্তু কি দুঃস্বপ্ন অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না। একটা অজানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে মনে হল; কে লোকটা? সে কি অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে আমার ঘরে ঢুকেছিল? পরিষ্কার ভাবে কিছুই মনে আসে না! মগজটা কি ওলট-পালট হয়ে গেল নাকি?

হঠাৎ দেয়ালের দিকে নজর গেল। কতকগুলো আঁকা-বাঁকা রেখা মিলে-মিশে তাল গোল্ল পাকিয়ে গেছে। এইখানেই কি কাল

একটি মুখ দেখেছিলাম! কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও দিনের বেলায় কিছু বোঝ্‌বার যো নেই! কে জানে হয়ত কাল সারাদিনের পরিশ্রমে মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্যের কিছুই নেই; কেননা—ওই হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুতে স্নান করতে পারিনি। রাত্তিরে মাথাটা গরম হয়ে যাওয়া কিছু মাত্র আশ্চর্য নয়।

নীচে থেকে পিসিমার হাঁক-ডাক শোনা গেল,—আজ কি পর্বতের চূড়ো থেকে নাম্‌বি নে?

এরপরেও চুপ করে বসে থেকে স্বপ্নের কথা ভাবা চলে না, তাই সমস্ত ভাবনাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তর্‌ তর্‌ করে নীচে নেমে এলাম।

সমস্তটা দিন অন্যান্য বাইরের কাজে কেটে গেল। বিকেলের মুখে বাসায় ফিরলাম। ছাদের ওপরে নিজের ঘরটির সাম্‌নে একটি ইজিচেয়ার ফেলে, পড়ন্ত রোদে বসে এক কাপ চা বেশ ভালই লাগলো।

শুধু ভালো লাগলো তাই নয়, চা-টা খাবার পর যেন নতুন করে প্রেরণা পেলাম মনে। হ্যাঁ, ভালো কথা। ছবিগুলো এই ফাঁকে টাঙিয়ে ফেলতে হয়। আমার বন্ধুর দল বলে, ঐ ছবিগুলো না থাক্‌লে আমার ঘর যেন আদপেই মানায় না। ঐ ফটোগুলো যেন আমার ঘরের ট্রেড্‌মার্ক। যে বাসাতেই উঠে যাই না কেন, ছবিগুলো নজরে এলেই মনটা শান্ত হয়···তখন বুঝতে পারি নিজের ঠিক কোন্‌টিতে ফিরে এসেছি।

প্রেরণা এলেই মন সজাগ হয়ে ওঠে। মনের সঙ্গে সঙ্গে আমি দেহকেও সজাগ করে তুললাম। ইজিচেয়ার থেকে উঠে গেলাম ঘরে। ছবিগুলো একসঙ্গে জড় করে ভাল ভাবে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিলাম। তারপর চল্লো ঠকাঠক্‌ পেরেক পোতার কাজ।

প্রায় সবগুলো ছবিই লাগানো হয়ে গেল, কিন্তু একটি যায়গাতে শেষ যে ফটোখানা ঝুলিয়ে দেবো বলে ঠিক করে রেখেছিলাম—মুস্কিল হল সেইটে নিয়ে। যতবার পেরেক পুঁততে যাই···বেঁকে বেঁকে যায়। তাইত! কি করা যায় তাহলে? শেষ পর্যন্ত কোনো ইটের ফাঁকই সেখানে খুঁজে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যেও ঘনিয়ে এসেছে। রাগ করে ছবিটা তুলে রাখলাম, তখন আর গায়ের জোরে ওকে কোনো মতেই ঝোলানো চলবে না, কাল সকালে দিনের আলোয় অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করলেই হবে।

আরও একটু তাড়াতাড়ি ছিল; আমার ক্লাসের একটি ছেলে নেমন্তন্ন করেছে আজ সন্ধ্যায় তার বাড়ী যেতে। ব্যাপার আর কিছুই নয়, পরীক্ষায় প্রমোশন পেয়েছে—বড় লোকের একমাত্র ছেলে —তাই একটু আনন্দ-উৎসব করা। ক্লাশের সবাইকে বলা হয়েছে, একটু গান-বাজনা হবে, তারপর খাওয়া-দাওয়া।

ব্ল্যাক-আউটের রাত—ফিরতে দেরী হয়ে না যায় সেই জন্য তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে ক্লাশের আরও কয়েকটি ছেলে এসে হাজির হল। সবাই ঘর দেখে বল্লে, চমৎকার হয়েছে। একজন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কৈ রে? রামকৃষ্ণদেবের ছবিটা টাঙিয়ে রাখিস নি? তাকিয়ে দেখি—তাইত! একমাত্র রামকৃষ্ণের ছবিখানিই ঝোলানো হয় নি! বুঝলাম, হাজার চেষ্টা করেও দেয়ালের গায় ঐ আঁকা-বাঁকা রেখাগুলির ওপর কিছুতেই পেরেক বসাতে পারি নি। যাই হোক তখনও কথাগুলো অত করে ভাববার সময় ছিল না। বন্ধু দলের সঙ্গে হল্লা করতে করতে বেরিয়ে পড়লাম।

ফিরতে বেশ একটু রাত হয়েছিল। একবার ভাবলাম, রামকৃষ্ণের ফটোটা টাঙিয়ে ফেলি; কিন্তু বন্ধুর বাড়ী গুরুতর

ভোজনের পর এক শুয়ে পড়া ছাড়া আর যেন কিছুই ভালো লাগছিল না।

টেবিলের ওপর থেকে একটা গল্পের বই টেনে নিলাম। দু' এক পাতা ওল্টাবার পরই হাত থেকে বইখানা ফস্ করে খুলে পড়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে কখন যে চোখও বন্ধ হয়ে গেল বুঝতে পারিনি।

* * * *

হঠাৎ কেমন একটা আব্ছা আলোতে ঘুম ভেঙে গেল।

পুকুরে ডুব দিয়ে চোখ মেলে তাকালে যেমন হয়, এ অনেকটা সেই রকম। সব ভালো করে চেনা যায় না অথচ ভাসা-ভাসা রকম দেখা চলে। ঠিক সূর্যের আলো নয়, চাঁদের আলোও নয়···পাতলা, আবছা মিষ্টি ঘোলাটে আলো। চোখে লাগে না, অথচ স্নিগ্ধ।

বোজা চোখ দুটো আপনা থেকেই খুলে গেল। সোজা তাকালাম দেয়ালের দিকে—যেখানে আঁকা-বাঁকা রেখাগুলো জমাট বেঁধে ছিল ···কিন্তু আবছা আলোতে একটি মুখের আকৃতি নিয়ে বসে আছে। চেন্‌বার পক্ষে এতটুকু কষ্ট হয় না। সেই কালকের মুখ—বসা চোখ···কিন্তু সেই দুটি চোখের ভেতর যেন কত কথা লুকিয়ে আছে।

আমি বিস্ময়ে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু হঠাৎ মনে হয় যেন কতদিনের পরিচিত, ডেকে কুশল প্রশ্ন করি।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে সেই মুখখানিই প্রথম কথা কইলে। বল্লে, কি ভাই জয়ন্ত, বহুকাল পরে দেখা, চিন্‌তে পারো আমায় ?

আমার মুখ দিয়ে প্রথমটা কথা সরল না।

দেয়ালের গায় আঁকা ছবি···আঁকা বাঁকা শুধু একখানি মুখ, সেই মুখ কথা বল্লে ! আমি আজ যদি গিয়ে ক্লাশের ছেলেদের এই

কথা বলি তবে চাঁটি মেরে তারা সবাই আমার মাথা একেবারে গুড়িয়ে দেবে। কিন্তু মজা এই যে, এই কথা বলা এতটুকু বেমানান মনে হল না। ভাবলাম, আমিও বুঝি মনে মনে এই কামনাই করছিলাম। রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছি—বহুকাল আগের দেখা একখানি মুখ হঠাৎ যখন পথ রোধ করে দাঁড়ায়···মনে হয় কোথায় যেন একে দেখেছি···! কোথায় দেখেছি, কোথায় আলাপ হয়েছে ঠিক ঠাহর করতে পারি না, কিন্তু কথা বলবার জন্যে মনটা আকুপাকু করতে থাকে। নামটা মনে আসে না···কিন্তু তাকে যেন এই দীর্ঘ ব্যবধানেও ঠিক চিনে ফেলি।

ওই মুখটা আমার কি বলে ডাকলে? জয়ন্ত? হাসি পাচ্ছে আমার সত্যি! আমার আবার জয়ন্ত নাম কবে ছিল? একটা কথা এই অল্প সময়ের মধ্যেও বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, দেয়ালের গায়ে আঁকা মুখ কথা বল্লেও আমি এতটুকু ভয় পাইনি। বরং কথা বলবার জন্যে মনে মনে একটা আকাঙ্খা অজান্তে বেশ বুঝতে পারছিলাম।

জবাব দিলাম। বল্লাম, জয়ন্ত? কে জয়ন্ত? এ ঘরে শুধু একা আমি রয়েছি।

সেই আঁকা বাঁকা রেখার টানে তৈরী মুখে এবার হাসি ফুটল! মুখটি অন্ধকার-চেরা হাসি হেসে জবাব দিলে, তা অনেক দিনের কথা। চিনতে পারবে কি করে? মনে কর বিক্রমাদিত্য রাজার আমলের কথা। তখন তোমার আর আমার দিন রোজ এক সঙ্গেই কাটতো!

অ্যাঁ! এ বলে কি! বিক্রমাদিত্য রাজার আমলের কথা? বিক্রমাদিত্য রাজার কাহিনী ইতিহাসের প্রশ্ন-পত্রে ছিল বটে। কিন্তু

আমি বঙ্কা···হ্যা,শুধু পিসিমারই বঙ্কা, সেই আমলের লোক জলজ্যান্ত এখন কলকাতায় বেঁচে আছি একথা শুনতে পেলে আমার পিসিমাই যে আজ হাউ-হাউ করে মরা-কান্না জুড়ে দেবে। যে বন্ধুটির বাড়ীতে ভোজ ছিল সে দুষ্টুমি করে সরবতের মধ্যে সিদ্ধি মিশিয়ে দেয় নি ত ? নিজেই নিজেকে একটা চিম্‌টি কেটে দেখে নিলাম। ঘুমিয়ে নেই এবং স্বপ্নও দেখছি না একথা বেশ বুঝতে পারলাম। ভয়ে ভয়ে শুধোলাম, তুমি কি বলছ ভাই ? আমি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়কার লোক ? এ যে ভাই কিছুতেই মগজের ভেতর আনতে পারছি না !

মুখটা আবার বাঁকা হাসি হেসে বল্লে, হঠাৎ ধারণা করা শক্ত। আচ্ছা, আজ তোমায় আমি সব কথা মনে করিয়ে দেব। যাবে আমার সঙ্গে আজ রাত্তিরে ?

ভয়ে ভয়ে বললাম, কোথায় ?

—কেন, আমাদের আগেকার দিনের অভিযানে। এইবার আমার হাসি পেলো, আমাদের এক মাষ্টারমশাই আছেন, তিনি প্রতি মাসে ইস্কুল থেকে একবার করে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যান ! কোন বার বোটানিক্যাল গার্ডেনে, কোন বার দক্ষিণেশ্বরে, কোন বার আলিপুরে। তিনি তার নাম দিয়েছেন 'অভিযান'। আমরা অবিশ্যি গোপনে তার নাম দিয়েছি 'বন-ভোজন'। কেন না, ওই মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে গেলেই প্রচুর খেতে পাওয়া যায়। তাঁর ধারণা রাস্তা হাঁটলেই ক্ষিদে পায় এবং ক্ষিদে পেলেই ডান হাত দিয়ে মুখে অনবরত খাবার প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়। তাই আমি বল্লাম, কি, তোমার সঙ্গে বন-ভোজনে যেতে হবে ? কিন্তু রাত্তিরে ?

মুখ বল্লে, তোমরা যাকে বন-ভোজন বল—আমরা তাকে বলি 'অভিযান'। একদিন তুমিও তাকে অভিযান বল্‌তে, কিন্তু আগেকার দিনের কথা ভুলে গেছ বলে নাম দিয়েছ 'বন-ভোজন'। আমি তোমায় বলে রাখছি, ভোজনটা আমাদের বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে 'অভিযান'। একটা বিরাট আদর্শ দিয়ে অজানার পেছনে ছোটা। ওর কথাগুলো শুন্‌তে বেশ লাগছিল; বল্লাম, বেশ রাজি আছি; কিন্তু তোমার নামটা ত' জান্‌তে পারলাম না ভাই! মুখটি কাচুমাচু করে সে জবাব দিলে, সেটা আমার দোষ হয়ে গেছে ভ ই। আমার নামটা তোমায় আগেই জানিয়ে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস করলে বলে আমি মনে মনে ভারী দুঃখু পেলাম।

বল্লাম, কেন?

মুখট জবাব দিলে, কেন! সেই বিক্রমাদিত্যের আমলে জয়সেন আর জয়ন্তের নাম কে না জান্‌তো? আমরা ছিলাম, তাল-বেতালের দক্ষিণ হস্ত। লোকের মুখে-মুখে ফিরতো জয়সেন আর জয়ন্তের নাম। কিন্তু মজার কথা এই যে, সেই জয়ন্ত আজ জয়সেনকে জিজ্ঞেস করছে, তোমার নাম কি? অবাক হবার কথা নয় কি ভাই?

অনেকক্ষণ বসে ভাবতে লাগলাম।

এই রহস্যময় মুখ যা বল্‌ছে তা কি সত্যি? আমি বুড়ী পিশিমার অঞ্চলের নিধি···বাড়ীতে খাই মণ্ডা···আর ইস্কুলের মাষ্টার মশায়ের কাছে খাই কানমলা গণ্ডা-গণ্ডা···সেই আমি বিক্রমাদিত্যের আমলে ছিলাম জয়ন্ত? নামটা শুন্‌তে কিন্তু বেশ লাগে। আচ্ছা, তখন আমার চেহারা দেখতে কেমন ছিল? কি পোষাক তখন আমি পরতাম?

চেয়ে দেখি জয়সেনের মুখে মিটি-মিটি হাসি। বল্লে, তুমি কি ভাবছ তা আমি বলে দিতে পারি। তার জন্যে ক্ষোভ করে লাভ নেই ভাই; আজ রাত্তিরেই জান্‌তে পারবে কেমন তোমার চেহারা ছিল, আর সেই বিক্রমাদিত্যের আমলে জয়সেন আর জয়ন্ত কি রকম পোষাক পরে ঘুরে বেড়াতো। এসো তবে আমার সঙ্গে···

একমুহূর্ত্তের মধ্যে সব যেন তাল-গোল পাকিয়ে গেল; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলে উঠল; প্রথমটা ভাবলাম, বোধ করি ভূমিকম্প হচ্ছে। নিজের অভ্যাস মতো 'পিসিমা' বলে একটা চীৎকার করে উঠলাম, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দই বেরুলো না। কোথায় আমি, কোথায় পিসিমা কোথায় ইস্কুলের মাষ্টার-মশায়ের গোম্‌রা মুখ···কোথায় পড়ুয়াদের হল্লা-হাসি, কোথায় বন্ধুর দেয়া ভোজ, সব যেন ছায়া-ছবির মতো সরে যেতে লাগলো। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র সবাই যেন আমায় পথ-নির্দ্দেশ করে দিয়ে দিগন্তের তারকার মতো দূরে সরে পড়তে লাগলেন। বই-পত্তর খাতা, পেন্সিল, চেয়ার-টেবিল উল্টে-পাল্টে গেল। একি! আমি বেলুনে না বিমানে চড়েছি? কল্‌কাতা সহরটা পায়ের নীচে এত ছোট দেখাচ্ছে কেন? ঐ যে মনুমেণ্টের চূড়োটা ঠিক আমার চোখে ধরা পড়েছে! গড়ের মাঠটা দাবা খেলার ছকের মতো! আর ঐ যে দূরে গঙ্গা একগাছা রূপোর সূতোর মত বয়ে চলেছে! চাঁদের আলোয় সমস্ত পরিষ্কার···ঠিক যেন ছবির প্রদর্শনীতে ফ্রেমে বাঁধানো একখানা তেল-রঙে আঁকা ছবি। তারপর একে একে সব ধোঁয়া হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল!

অন্ধকারের রাজত্বে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, মনে হল পৃথিবীতে বুঝি আর আলো নাই, অতীত কি এমনি অন্ধকার? সেখানে

কি আর এক ফোঁটা প্রদীপও খুঁজে পাওয়া যাবে না? ক্রমাগত কানের কাছে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাক্‌লে যেমন অস্বস্তিকর বলে মনে হয় ঠিক সেই রকম একটা ভাব। আলো জ্বালবার উপায় নেই, মুখ দেখবার যো নেই···শুধু হাতের ছোঁয়ায় বুঝতে পাচ্ছিলাম যে, জয়সেন আমার পাশে-পাশেই আছে, সে আমায় ফেলে পালিয়ে যায় নি! দূরে—অনেক দূরে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা গেল। মনে হল পর্ব্বতের ওপরে একটি মন্দির! সেই মন্দিরের ভেতর থেকেই আলোটা দেখা যাচ্ছে। আমরা ততক্ষণে আরও অনেকটা এগিয়ে পড়েছি। দূর থেকে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দও শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার পা দুটোও যেন মাটিকে স্পর্শ করলে। পায়ের তলায় একটা কঠিন কিছু থাক্‌লে যে কত নিরাপদের তা এর আগে এমন করে কিছুতেই বুঝতে পারিনি!

জয়সেন আমায় কানে ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, আমরা এই গাছের আড়ালে দাঁড়াবো। এখন মহাকালের মন্দিরে সন্ধ্যাবেলার আরতি হচ্ছে। আরতি হয়ে গেলে যখন সব লোকজন একে একে চলে যাবে তখন সুরু হবে আমাদের কাজ।

এইবার নিজের দিকে তাকাবার একটু অবসর পেলাম। তাইত' এ যে নিজেকেই আমি চিন্‌তে পাচ্ছি না! কে বলবে আমি বঙ্কা। একবার ইস্কুলের ছেলেরা মিলে 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় করেছিল, তাতে আমি চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় নেমেছিলাম। বেশ মনে আছে, সাজঘরের আয়নায় নিজের চেহারাখানা বারবার দেখে খুসী হয়ে উঠেছিলাম। দিব্যি একটা গোঁফ লাগিয়েছিলাম, সেটা তা দিতে মজা লাগছিল, তবে ভয় ছিল কখন খসে পড়ে যায়! কিন্তু আজ বুঝতে পাচ্ছি—চন্দ্রগুপ্তের সে সাজা-চেহারায় হয়ত' আলগা

জুটো জাকজমক ছিল, কিন্তু জয়ন্তের চেহারায় রয়েছে বীরত্বের চোখ মাতানো আমেজ। তারুণ্য আর সৌন্দর্য্য যেন পাশাপাশি বাসা বেঁধেছে। গাছের পাশেই একটা ঝরণা, তারি জলে চাঁদের আলো চিক্‌মিক্‌ করছে। আমি সেই ঝরণার আরশীতে নিজের চেহারাখানা বারে বারে দেখতে লাগলাম। এরই মধ্যে আরতির বাদ্য ধীরে ধীরে থেমে এলো। জয়সেন আমায় ধাক্কা দিয়ে বল্লে, আর নিজের মুখ দেখতে হবে না; আরতি থেমে গেছে—এই ফাঁকে আমাদের মহাকালের মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তারপরই ত' সুরু হবে সত্যিকারের অভিযান। জয়সেনের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত হলাম। পরিচারক প্রাঙ্গণের উজ্জ্বল আলোক-বর্তিকাগুলো আরতি শেষে নিভিয়ে দিচ্ছে। একটু দূরে দেখা গেল, ভীমকায় একটি জাঁদরেল লোক পুরোহিতের পায়ের কাছে নত হয়ে রয়েছে। আমরা মন্দিরের স্তম্ভের আড়াল দিয়ে আরও একটু এগিয়ে গেলাম। ভীমকায় লোকটি বল্লে, প্রভু, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মনস্কামনা যেন পুর্ণ হয়। মহাকালের আশীর্ব্বাদ নিয়ে আমি আমার অভিষ্টসাধনে যাত্রা করবো। এই বলে লোকটা ঝনাৎ করে বিক্রমাদিত্যের নামাঙ্কিত একটি স্বর্ণমুদ্রা পুরোহিতের পায়ের কাছে প্রণামী দিলে। পুরোহিত একবার এদিক-ওদিক তাকালেন কি ভেবে। তারপর বিড়বিড় করে আপন মনে কি বল্লেন, ভালো করে কিছুই বোঝা গেল না। যে আশীর্ব্বাদী ফুলটি তিনি ওর মাথায় দিতে গেলেন সেটা ঠিক মাথায় পড়ল না, পড়ে গেল মাটিতে। জাঁদরেল লোকটার কিন্তু এসব কিছু দেখবার বা মনে করবার সময় ছিল না। আর একবার পুরোহিতের পায়ে নত

হয়ে লোকটা তরোয়াল মুঠিতে শক্ত করে ধরে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। জয়সেন আমার কানে কানে বল্লে, জয়ন্ত, এইবার এসো আমরা মহাকালের পুরোহিতের পায়ের ধূলো নিই। আমরা উভয়ে গিয়ে তাঁর কাছে নত হতেই তিনি উৎফুল্ল হয়ে বল্লেন, এই যে, জয়সেন-জয়ন্ত, তোমরা এসেছ! আমি এতক্ষণ ধরে তোমাদেরই প্রতীক্ষা করছিলাম। জয়সেন বল্লে, আদেশ করুন দেব। পুরোহিত বল্লেন, শোনো, সেই দুর্ব্বৃত্ত চণ্ডরাজ আবার আমার কাছে এসেছিল—আমায় প্রণাম করতে, আর মহাকালের আশীর্ব্বাদ নিতে! জয়সেন আর একবার মাথা নত করে বল্লে, আমরা মন্দিরের স্তম্ভের আড়াল থেকে তাকে দেখেছি প্রভু! পুরোহিত হঠাৎ যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন তারপর বল্লেন, শোনো জয়সেন, আমি জানি পথশ্রমে তোমরা উভয়েই শ্রান্ত; কিন্তু আমি যদি এখন অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করতে যাই তবে মহা অনর্থ হবে। জয়সেন শুধোলে, দেব, চণ্ডরাজ কি আজই কোন দুরভিসন্ধি সাধন করতে মনস্থ করেছে? পুরোহিত জবাব দিলেন, ঠিক তাই। অত্যাচার, লুণ্ঠন আর বঞ্চনা করে পাপাত্মা যে অর্থ সঞ্চয় করেছে তা এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল হস্তী-গুহায়। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ভয়ে ঐ অর্থ সে ভোগ করে নি কিম্বা তাই দিয়ে নতুন কোনো শয়তানি ফন্দীও আঁটে নি। এখন বিক্রমাদিত্য দেশজয়ে বহির্গত হয়েছেন—নবরত্ন সভা বিদ্যাচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেছে—শয়তান চণ্ডরাজ স্থির করেছে, এই অবকাশে হস্তী-গুহায় লুক্কায়িত সমস্ত ধন-রত্ন নিজের পুরীতে নিয়ে যাবে। ঐ অর্থে সে যদি সত্যি ধনী হতে পারে তবে মানীর সম্মান থাকবে না, দরিদ্র নিপীড়িত হবে, আর দেশের মধ্যে অন্যায়-অত্যাচার শতগুণে বেড়ে

যাবে। এই পাপ-অভিযান তোমাদের অবিলম্বে এবং আজই বন্ধ করতে হবে জয়সেন আর জয়ন্ত। শুধু আজ নয়, দীর্ঘকাল ধরে নত শিরে তোমরা দুজন আমার বহু অনুরোধ আদেশের মতো পালন করেছ, আজও—

জয়সেন বল্লে, প্রভু, আপনাকে আর বেশী কিছু বল্‌তে হবে না। জয়ন্তকে নিয়ে আমি এখুনি রওনা হব হস্তী-গুহা অভিমুখে। আপনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

আমরা দু'জন একসঙ্গে পুরোহিতের পায়ের কাছে নত হয়ে বস্‌লাম। পুরোহিত বল্লেন, বৎস, মাকালের যে পবিত্র নির্ম্মাল্য আমি পাপাত্মা চণ্ডরাজের মাথায় দিই নি ইচ্ছে করে নিক্ষেপ করেছি ভূমিতলে, তাই আমি নিজের হাতে তুলে নিয়ে তোমাদের মাথায় ছুঁইয়ে দেবো আর সেই সঙ্গে এই কামনা করবো, যে-মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা রওনা হচ্ছ তাতে সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হয়ে আবার এই মহাকালের মন্দির-প্রাঙ্গণে ফিরে এসো। পুরোহিতের পদধূলি মাথায় নিয়ে আমরা দু'জন মন্দিরের বাইরে এলাম। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস্ করলাম, এবার কোথায় যেতে হবে জয়সেন? জয়সেন আমার দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে জবাব দিলে, সবই ত' নিজের কানে শুন্‌তে পেলে ভাই, তবে আবার কেন আমায় ছলনা করছ? আমি বল্লাম, সে ত বেশ পরিষ্কারই বুঝতে পারলাম। হস্তী-গুহার নাম যে করলে তাও বেশ মনে আছে। কিন্তু আমার জিজ্ঞেস করবার কথা এই যে, হস্তীগুহায় কি হেঁটেই পাড়ি জমাতে হবে নাকি? জয়সেন জবাব দিলে, আমাদের পুরোহিত ঠাকুর বিচক্ষণ লোক তিনি আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন, ঐ দেখ। তাকিয়ে দেখি দুটি তেজী ঘোড়া মন্দিরের পাশের একটি গাছের

ডালে বাঁধা। বল্লাম, ও! তা হলে অশ্বারোহনে? কিন্তু ঘোড়ায় কি আমি চড়তে পারবো?

জয়সেন বল্লে, দেখ ভাই জয়ন্ত, তোমার মনের মধ্যে আগাগোড়াই একটা গোল থেকে যাচ্ছে। তুমি আর বঙ্কা ছোঁড়া নও, এখন তুমি সাহসী তরুণ জয়ন্ত। আর এ কথাটিও ভুলো না যে, তুমি কল্‌কাতায় তোমার তেতলা ঘরটিতে বসে নেই, রয়েছ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে। আমি সোৎসাহে বল্লাম, এই উজ্জয়িনী? আহা! কত কসরৎ করে তবে ইতিহাসে নামটা মুখস্ত করতে পেরেছি। আমাদের পরীক্ষায় নামটা এসেছিল, তখন ভালো মনে ছিল না তাই লিখতেও পারি নি!

জয়সেন বল্লে, আহা, রাখো তোমার পরীক্ষা, এইবার শিগ্‌গীর ঘোড়ার চেপে বসো দেখি, আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।

দুইজনে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বস্‌লাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, দিব্যি চাঁদ উঠেছে। কালিদাসের বাড়ী কত দূরে কে জানে? তিনি হয়ত এরই মধ্যে এই চাঁদ দেখে কবিতা লিখছেন আর মালিনী মাসীকে শোনাচ্ছেন। মনটা একটু যেন উদাস হয়ে গেল।

জয়সেন হঠাৎ বলে বস্‌ল, চুপচাপ যে?

আমি বল্লাম, মনে কথা জোগাচ্ছে না বলে!

জয়সেন আবার বল্লে, তাহলে পথ চল্‌তে চল্‌তে আমার গোটা-কয়েক কথা শোনো—

বল্লাম, বল—

সে সুরু কর্‌ল, দেখ, এই পৃথিবীতে অর্থই হচ্ছে অনর্থের মূল। অর্থ ছাড়া কিছু করবার যো নেই, আবার এই অর্থই দুর্জ্জনের হাতে পড়ে বিষময় ফলের সৃষ্টি করে। চণ্ডরাজের কথাই ধর না কেন। ঐ

লোকটার দীর্ঘ-জীবনে অর্থের কামনা ছাড়া আর কোন মোহ নেই। সারাটা জীবন ধরে ও শুধু অসৎ উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করেছে। যে সাধনা করেছে ও এই কাজে, তাতে একাগ্রতার যদি কোন মূল্য থাকে তবে স্বর্গ থেকে দেবতার নেমে এসে বলবার সময় হয়েছে যে, তোমার তপস্যায় আমি প্রীত হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।

আমি ফোঁড়ন দিয়ে বল্লাম, সে বরের ব্যবস্থা ত' ও নিজেই করে নিচ্ছে, তবে আর স্বর্গের দেবতার দরকার কি? জয়সেন বল্লে, ঠিক কথা ভাই। অর্থের জন্যেই লোকে স্বর্গের দেবতাকে ডাকে, আবার সেই অর্থলাভ ঘট্‌লে স্বর্গের দেবতাকে ভুলতে তার বেশী দেরী হয় না!

আমি বল্লাম, কিন্তু এই অর্থ যদি সৎকাজে লাগতো তবে বোধ করি লোকের দুঃখ অনেকটা কমে যেত।

জয়সেন বল্লে, সত্যি কথা। দেশের ধনীরা যদি মনে করত যে, ভগবান শুধু তাঁদের ধনের রক্ষক করে পাঠিয়েছেন তবে এই ধনতৃষা অনেকখানি কমে যেতো। তারা সেই ধনের যথাযোগ্য ব্যবহার করতে চাইত; তার ফলে ক্ষুধার্ত্ত পেতো খাদ্য, পীড়িত পেতো ঔষধি, শিক্ষার্থী পেতো শিক্ষা; মানুষের সাধারণ অভাব অভিযোগ এক রকম মিটেই যেতো।

আমি বল্লাম, কিন্তু তাতো হবার যো নেই ভাই; পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছে চণ্ডরাজের দল। তারা অকারণে লোককে বঞ্চনা করে অর্থ সংগ্রহ করবে আর সেই অর্থ দিয়ে দিনের পর দিন সৃষ্টি করবে অনর্থের।

জয়সেন এইবার উত্তেজিত হয়ে জবাব দিলে, কিন্তু এই অনর্থের পথ আমরা বন্ধ করবো, আর তারই জন্যে আমাদের অভিযান একথা কোনো ক্রমেই ভুলো না জয়ন্ত। ঐ রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা

আমরা নিজেদের আয়ত্তে আন্‌বো। যাদের বঞ্চনা করে ও অর্থ জমিয়েছে তাদের প্রাপ্য তাদের ফিরিয়ে দেবো, তারপর যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাক্‌বে তা আমরা জনহিতকর কার্য্যে নিয়োগ করবো। ডেকে নিয়ে আস্‌বো দলে দলে বুভুক্ষিত নরনারী—যারা দুবেলা পেট পুরে খেতে পায় না। অঞ্জলি পূর্ণ করে তাদের দেবো খাদ্য; অশিক্ষায় যারা অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে তাদের জন্যে জ্ঞানের ভাণ্ডার দেবো খুলে। বিদ্যা তাদের অন্ধ আঁখিতে মায়া-অঞ্জন বুলিয়ে দেবে। ব্যাধিতে যারা জীর্ণ-শীর্ণ আর কঙ্কালসার হয়ে উঠেছে—তাদের জন্যে স্থাপন করবো আমরা চিকিৎসাগার। শুশ্রূষায় নব-জীবন লাভ করে তারা আবার জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলাই হবে আমাদের ব্রত। সেই ত' হবে আমাদের সত্যিকারের অভিযান। তাকিয়ে দেখলাম—ওর সঙ্কল্পের কথা বল্‌তে বল্‌তে জয়সেন সত্যি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। চোখ দুটি দীপ্ত হয়ে উঠেছে। দুটি ঠোঁট আবেগে কাঁপছে। কুঞ্চিত কেশ ঘর্ম্মাক্ত ললাটে খেলে বেড়াচ্ছে। ওর ঘোড়া আর আমার ঘোড়া পাশাপাশি ছুটে চলেছে। আমি ওর হাতটা চেপে ধরে বল্লাম, ভাই জয়সেন, —তোমার যা সঙ্কল্প আজ থেকে আমারও সঙ্কল্প তাই। আর আজ থেকে তরুণ আর কিশোরদের এই নব-সঙ্কল্পের আদর্শই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুক।

দীর্ঘ রাজপথ অতিক্রম করে আমরা ইতিমধ্যে অরণ্যে প্রবেশ করেছি। এই অরণ্য পার হলেই হস্তী-গুহা! চাঁদের আলো বিশাল তরুগুলির শাখা-প্রশাখার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে আমাদের পথ চিনিয়ে দিচ্ছিল। বনের মধ্যে চল্‌তে চল্‌তে আমাদের ঘোড়া দুটি ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠল। পরিশ্রমে আমরাও হয়ে পড়লাম ক্লান্ত, তাই

বন পেরুলেই আমরা অনুভব করলাম, এই সময়টায় কথা খুব কম বলেছি। তবু আমাদের উভয়ের মনে এই কথাই গুঞ্জন করে ফিরেছে যে, আমরা আমাদের এই অভিযান-বঞ্চিত, বুভুক্ষিত আর অত্যাচারিত মানুষের কাজ সার্থক করে তুল্‌ব। প্রকাণ্ড এক পাহাড়, এই পাহাড়ের তলদেশে রয়েছে হস্তীগুহা। চন্দ্রালোকে দেখলাম, সেখানে বেশ জনসমাগম হয়েছে! জয়সেন আমায় বল্লে, দেখ ভাই জয়ন্ত, আমরা সোজাসুজি মাঠের ওপর দিয়ো যাবো না; তাহলে সবাই সন্দেহ করতে পারে। তার চাইতে এসো গাছের আড়াল দিয়ে-দিয়ে এগিয়ে যাই। সেই যুক্তিই ভালো বলে মনে হ'ল—আমরা সোজা রাস্তা ছেড়ে গাছের ছায়ার তলায় তলায় এগিয়ে চল্লাম। গুহা মুখের একটু দূরে জয়সেন হঠাৎ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। বাধ্য হয়ে আমাকেও নাম্‌তে হল।

একটি ছোট পুঁটুলি জয়সেন আমার হাতে দিয়ে বল্লে, দেখ, আমাদের এইবার বেশ পরিবর্ত্তন করতে হবে। এই পুঁটলীর মধ্যে আছে চণ্ডরাজের অনুচরদের পোষাক, তাড়াতাড়ি তুমিও সাজো, আমিও সাজি।

চণ্ডরাজের অনুচর সেজে যখন আমরা গুহামুখে উপস্থিত হলাম দেখা গেল, অন্যান্য অনুচরেরা হাতি, ঘোড়া আর খচ্চরের পিঠে ভারী ভারী বস্তা তুলে দিচ্ছে। আরও আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, সেই রাত্রেও খবর পেয়ে বহু বিধবা ও বঞ্চিত লোক সেখানে এসে হাজির হয়েছে এবং কপালে করাঘাত করে অনুচরদের কাছে নিজ নিজ গচ্ছিত অর্থ ফেরৎ চাইছে। চণ্ডরাজের অনুচরেরা তাদের ভয় দেখিয়ে হটিয়ে দিচ্ছে। আমরা দুজন একটু দেরীতে এসেছি বলে দলের সর্দ্দার গোছের একটা লোক এগিয়ে এসে একবার হুমকি দিলে, তার

পর কাজে লেগে যেতে বল্লে। আমরা আর কিছু না বলে মাল তোলার কাজে লেগে গেলাম। সব মাল তোলা হয়ে গেলে দলের সর্দ্দার হুকুম দিলে, সেগুলো নিয়ে রওনা হতে। সঙ্গে রইল চণ্ডরাজের প্রহরীর দল—পাছে সেগুলো রাস্তার মাঝখানে চোরের উপর বাটপাড়ি হয়! জয়সেন আমাকে ইসারা করে জানিয়ে দিলে, ওদের সঙ্গে রওনা না হতে। ইতিমধ্যে দলটা বেশ খানিক দূর অগ্রসর হয়ে যেতে চণ্ডরাজ তার বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। তার হাব-ভাব দেখে মনে হল সে-ও ঘোড়ায় চড়ে তক্ষুণি রওনা হবে। জয়সেন এতক্ষণ গুহামুখের এক কোণে লুকিয়েছিল এবং বোধ করি এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল। সে হঠাৎ ছুটে এসে চণ্ডরাজের ঘোড়ায় চড়ায় বাধা দিয়ে বল্লে প্রভু, দুই থলি মাণিক এখনো গুহার ভেতর পড়ে আছে—আমি এক্ষুণি দেখতে পেলাম। চণ্ডরাজ তৎক্ষণাৎ তার অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। হয়ত জয়সেনকে ভালো ভাবে বিশ্বাস করতে পারলে না, নইলে তাকে নিয়ে আস্‌তে বলাই স্বাভাবিক ছিল। এমনটি যে ঘটবে জয়সেন তা' আঁচ করে নিতে পেরেছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে আমায় ইঙ্গিত করলে। আমিও তৈরী হয়েছিলাম। আমরা দু'জনে মিলে হস্তী-গুহার দ্বার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম।

জয়সেন বল্লে এইবার ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। ঐ দলের সঙ্গে মিলতে হবে। সেখানে আছে আমাদের অন্য কাজ।

আমি বল্লাম, তা হলে বেশটা পরিবর্ত্তন করে ফেলি ; জয়সেন আমায় বাধা দিয়ে বল্লে, না-না, বেশ পরিবর্ত্তন করলে সব মাটি হবে। এই অনুচরের বেশে আমাদের আরও কিছু কাজ করবার আছে—তুমি আমার সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে এসো জয়ন্ত।

আমাদের ঘোড়া ইঙ্গিত পেয়ে আবার বনপথের দিকে অগ্রসর হল। ওদের দলকে ধরতে আমাদের খুব বেশী বেগ পেতে হল না, কেন না ওদের সঙ্গে ছিল ভারী মাল, আর আমাদের ঘোড়া তীরবেগে সোজা ছুটে এসেছে। দলের সর্দ্দার আমাদেরকে দেখে মারমুখো হয়ে জিজ্ঞেস্ করলে, এতক্ষণ তোরা কি করছিলি? সোনা দানা কিছু সরিয়েছিস?

জয়সেন বল্লে, মোটেই তা নয়। চণ্ডরাজ বলেছেন, আরও বহু মাল গুপ্তস্থানে পড়ে আছে। তোমাদের সবাইকে আবার ফিরে যেতে হবে এই আদেশ তিনি দিয়েছেন—আর আমাদের দুজনের ওপর ভার পড়েছে এই সব ঘোড়া, হাতী, আর খচ্চরের পিঠে যে সব মাল আছে তা রাত্রিরের অন্ধকারের মধ্যেই তাঁর রাজধানীতে নিয়ে হাজির করবো। ভাই সব, চণ্ডরাজের আদেশ—তোমরা সব ফেরো —তিনি তোমাদের জন্য ওখানে অপেক্ষা করছেন। দলের সর্দ্দারের হয়ত মনে হল, আস্‌বার সময় চণ্ডরাজের অনুমতি নিয়ে রওনা হওয়া হয়নি। তাই বহু মণি-মাণিক্য পড়ে থাকা বিচিত্র নয়! সে আর বাদ-প্রতিবাদ না করে দলবল নিয়ে যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথেই রওনা হল। জয়সেন আর আমি সমস্ত মণি-মুক্তা আর স্বর্ণ মুদ্রার ভাণ্ডার নিয়ে রওনা হলান—আর এক অজানা পথে।

জয়সেন বল্লে, এই যে রাশি রাশি অর্থ আজ আমরা পেলাম—

সবই পাপের উপার্জ্জন—সে কথা আমরা জানি। তবে ভালো কাজে ব্যয় করে সেই পাপের দোষটা আমরা মুছে ফেল্‌বো। তখন অর্থের সত্যিকারের প্রয়োজনীয়তাটাও বড় হয়ে দেখা দেবে।

আমি বল্লাম, এই এত অর্থ তুমি কোথায় লুকিয়ে রাখবে শুনি? শেষকালে হয়ত তোমাকেই লোকে চোর

ঠাওরাবে। চোরাই মাল যার কাছে পাওয়া যাবে সেই ত আসল চোর।

মুচকি হেসে জয়সেন বল্লে, সে কথা অবশ্যি সত্যি! কিন্তু এদিকেও আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই, আমাদের বল-ভরসা সবই মহাকালের পুরোহিত ঠাকুর। তিনিই সব কিছু ব্যবস্থা করবেন এবং এই অর্থের সদ্ব্যয় যা্তে হয় সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। আমরা ত হুকুম তামিল করেই খুসী।

আমি বল্লাম, পিছনে একটা কিসের কোলাহল শোনা যাচ্ছে না? জয়সেন জবাব দিলে, যাদের ভয় তুমি করছ তাদের কোলাহল ও নয়। চণ্ডরাজের দলের ফিরতে বহু দেরী। ঘোড়া আর হাতি ত সব মনি-মুক্তা বয়ে নিয়ে চলেছে। হেঁটে হেঁটে ওদের গুহামুখে পৌঁছতেই অনেক দেরী হয়ে যাবে। তারপর ত ফিরে আসার কথা। আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তবে পিছনে গোলমালটা কিসের?

জয়সেন বল্লে আকাশের দিকে তাকালে বুঝতে পারবে যে প্রায় ভোর হয়ে এসেছে! রজকেরা গাধার পিঠে কাপড়ের গাঁট তুলে দিয়ে ঘাটের দিকে চলেছে—এ তারই কোলাহল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি শুকতারা জ্বল জ্বল করে করে জ্বলছে। আমাদের দুজনের ঘোড়া বন পথ ধরে এগিয়ে চল্লো।

.. ..

কোলাহল, ডাকাডাকি কিন্তু কার? হঠাৎ চোখ চাইতে ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। চোখ দুটো আবার বন্ধ করে এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিলাম। কিন্তু পটপরিবর্ত্তনের কারণ কি? বল্লাম, জয়সেন, আমি শায়িত কেন? আমার অশ্ব কোথায়? এক সঙ্গে হো-হো

শব্দে সবাই যেন ফেটে পড়ল! কে যেন কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লে, কিরে থিয়েটারের পার্ট মুখস্ত করছিস নাকি? কিন্তু সরস্বতী পূজোর ত এখন অনেক বাকি! তাইত! সব গুলিয়ে যাচ্ছে যে! এতগুলি ধন-রত্ন নিয়ে আমরা রওনা হয়েছি—চলছিলামও ঠিক, হঠাৎ কি জয়সেনের কোনো বিপদ হল? তাই আবার জিজ্ঞেস্ করলাম, জয়সেন, মণি-মুক্তোগুলো কোথায় রেখে এলে? এবার বিপদ হল আরও বেশী। কয়েকটি হাত আমায় টেনে বসিয়ে দিলে। তারপর একজন বল্লে, এইবার চোখ চেয়ে দেখত মানিক! আশ্চর্য্য! চোখ খুলে দেখি কোথায় বন-পথ? কোথায় জয়সেন, আর কোথায় মণি-মানিক্যের রাশি? আমি আমার তেতলার ঘরে শুয়ে আছি। আর পাশে আমার বন্ধুর দল—যারা এক সঙ্গে কাল রাত্রে নেমন্তন্ন খেয়েছি। কিন্তু আমার সে নৈশ-অভিযান, সে কি একেবারেই মিথ্যে? একজন আমার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বল্লে, কি রে? স্বপ্নের ঘোরটা এখনো ভালো করে কাটেনি বুঝি? শুধু বোকার মতো একবার দেয়ালের দিকে তাকালাম। সেখানে হিজিবিজি কয়েকটি রেখা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলনা! কিন্তু বিছানায় শুয়ে মহাকালের মন্দিরের ধূপের ধোঁয়ার গন্ধ এবং শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ আমি যেন স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম। কিন্তু মুস্কিল এই যে, বিংশ শতাব্দীর কলকাতার ছেলেরা বিক্রমাদিত্যের সময়কার লোকের মতো ভাব-প্রবণ নয়। যে সহপাঠিটি আমাদের নেমন্তন্ন খাইয়েছিল সে বল্লে, ওরে ওঠ, আজ মাছ ধরতে হবে; ছিপে কিছু তুলতে পারিস তবেই বুঝব বাহাদুর।

আমি নিজে বাহাদুর কিনা সেকথা প্রমাণ করবার জন্যে খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠলাম না। আমার মগজের ভেতর কেবলি

মহাকালের মন্দির—জয়সেন-বনপথ-চণ্ডরাজ-মণি-মানিক্য থেকে থেকে আনাগোনা করতে লাগলো। ঐ যে দেয়ালের গায় কয়েকটি রেখা তার ভেতর কি রহস্য কে সন্ধান দেবে? বর্ত্তমান আর অতীত মিলে সমস্ত বিষয়টা আমার কিশোর মনকে এমন করে আচ্ছন্ন করে ফেল্লে যে, তখন পর্য্যন্ত আমার ধারণা হতে লাগল যে বাস্তব থেকে আমি বুঝি আবার কোন নতুন স্বপ্ন-লোকে প্রবেশ করলাম। আমার এই যে নৈশ অভিযান এক শুধু ছায়া ছবির মতোই ফাঁকি? আলো-ছায়া সরে গেলে একি সাদা পর্দ্দা ছাড়া আর কিছুই নয়? আমার মনের মধ্যে থাক্‌লো অন্তরাজ্য, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে মাছ ধরতে যেতে হল সেই পুকুর পাড়ে। সারাদিন চল্লো হুল্লোড়, মাছ ধরা, পুকুরে স্নান করা, দল বেঁধে সেই মাছ রান্না করে বন-ভোজন। সত্যি কথা বলতে কি আমি নিজে একটি মাছও ছিপে আটকাতে পারলাম না। খাবার সময় বন্ধুরা বল্লে, ওকে একটি মাছও আমাদের ভাগ থেকে দেয়া হবে না। একেবারে অকর্ম্মার গোঁসাই!

আর একজন ফোঁড়ন দিলে, ষ্টেজে থিয়েটারের স্বপ্ন দেখেছে সকাল বেলা···জয়সেন না কি···তাই থেকে ও একেবারে কবি হয়ে উঠেছে। এ আবার কোন দেশী কবিত্ব হে মাছের মুড়োর দিকে নজর যায় না! পাতের উপর থেকে মুখ তুলে সবাই এক চোট হেসে নিলে। আমি মনে ভাবতে লাগ্‌লাম—তবে কি এই কথাই সত্যি যে, আমি আগাগোড়াই একটা স্বপ্ন দেখে রাত কাটিয়েছি? হতেও পারে। কেন না অনেক সময় দেখা যায় যে, ভাঙা-ভাঙা স্বপ্ন, কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, তাদের জোড়া দেয়া যায় না! মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়। তখন বুঝতে পারি এটা সত্যি নয়

স্বপ্ন ; আবার একটু ঘুমের পরে নতুন স্বপ্ন সুরু হয়। সারাটা রাত একেবারে অশান্তিতে কাটে। আবার অন্য রকম স্বপ্নও আছে। একেবারে টানা, নদীর জলের স্রোতের মতো, কোথায়ও এতটুকু ছেদ বা বিরাম নেই। সেই সব স্বপ্ন দেখার পরও অনেক দিন মনে থাকে। সব যেন স্পষ্ট চোখের ওপর ভাস্‌তে থাকে যেমন আমরা সিনেমাতে দেখি ঠিক সেই রকম। আমি তখন ভাবতে লাগল্যাম, হয়ত এটা একটানা স্বপ্নই হবে, ঘুম কোথায়ও ভাঙেনি, তাই স্বপ্নটাও কোথায়ও নষ্ট হয়ে যায়নি। এই কথা ভাবার পর মনটা অনেক হাল্‌কা হয়ে গেল। শোবার আগে হয়ত অনেকক্ষণ ধরে দেয়ালের ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, সেই কথাই ভেবেছি তাই ঘুমের মধ্যে আজে-বাজে স্বপ্ন দেখা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়! এই কথা নতুন করে মনে জাগতেই শরীরটাও আপনা থেকেই হাল্‌কা হয়ে গেল। কেন জানি না—হঠাৎ অতি আনন্দে গান গেয়ে উঠলাম। একজন বন্ধু রসিকতা করে বল্লে, এই গানটাও তোর স্বপ্নে দেখা নাটকে ছিল নাকি? আমি বল্লাম, হ্যাঁ, স্বপ্নের নাটকের গান জাগরণের বন্ধুদের শুনিয়ে দিচ্ছি। এর পরেই গানে, গল্পে আবৃত্তিতে আমাদের বন-ভোজন উৎসব ভালো ভাবে জমে উঠল। হয় ত দুঃস্বপ্নকে ভোলবার জন্যেই আমি বেপরোয়া হয়ে মেতে উঠলাম। ভুলে গেলাম সব কিছু আবোল-তাবোল স্বপ্ন, ভুলে গেলাম জয়সেনকে, ভুললাম মহাকালের মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুর মশাইকে।

আমি বল্লাম দেখ, থিয়েটারের কথাই যখন তুললি…তখন আয়, সবাই মিলে সরস্বতী পূজোর মধ্যে থিয়েটার করি। বন্ধুদের উৎসাহ এ ব্যাপারে বড় কম নয়। বল্লে, কি নাটক তা' হলে অভিনয় করবো আমরা? আমার মাথায় চমৎকার একটি

প্ল্যান এলো। জবাব দিলাম শোন, যে স্বপ্ন আমি কাল রাত্রে দেখেছি তাই নিয়ে লিখবো এক নাটক। এই বলে গোটা গল্পটা তাদের শুনিয়ে দিলাম। বন্ধুর দল কাহিনী শুনে লাফিয়ে উঠে বল্লে, চমৎকার হবে।

সারা রাত জেগে নাটক লেখা সুরু করলাম। বিক্রমাদিত্যের সময়কার কাহিনী। পাতার পর পাতা লিখে চলেছি। ভাষা আপনিই জুগিয়ে যাচ্ছে। আমি যে আবার নাটক লিখতে পারবো একদিন আগেও তা ধারণা করতে পারিনি। আরও উৎসাহে লিখে চলেছি এই ভেবে, যে আমার বন্ধুরা এই নাটকখানি অভিনয় করবে সরস্বতী পূজোর রাত্রে। লিখতে লিখতে ছুটো বেজে গেছে খেয়াল করিনি। হঠাৎ দেখি ঘরের আলোটা নিভে গেল। অবাক হয়ে সামনের দিকে চাইতেই দেওয়ালে ফুটে উঠল সেই মূর্তি। মূর্তি বল্লে, আজ আর বিক্রমাদিত্যের আমলের নয়—

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধোলাম তবে?

মূর্তি হেসে জবাব দিলে, আজ তোমায় নিয়ে যাবো বন্ধু—

আমি ভয়ে ভয়ে জবাব দিলাম, কোথায়?

মূর্তি স্থির দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চেয়ে বল্লে, আমার পানে তাকালে তোমার কি মনে হয়?

আমি একটু ভেবে নিয়ে বল্লাম, তোমার যে দেখছি রাজপুতের বেশ। মূর্তির মুখখানা এইবার খুসীতে ভরে উঠল; বল্লে হ্যাঁ তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। রাজস্থানের কাহিনী বটে। তখন আমরা ছু'জনে ছিলাম একই বংশের খুড়তুতো—জ্যাঠতুতো ভাই। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা মানে? আমিও ছিলাম নাকি? মূর্তি তেম্‌নি হেসে জবাব দিলে, তুমি ছিলে বৈকি!

আমি ছিলাম বড় ভাইয়ের ছেলে, আর তুমি ছিলে ছোট ভায়ের ছেলে! আমরা উভয়েই তখন রাণা প্রতাপের স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষিত। প্রতিজ্ঞা ছিল দেশ যতদিন না স্বাধীন হবে আমরা তৃণ-শয্যায় শয়ন করবো!

আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম, ভাই জয়সেন, মূর্তি আমায় বাধা দিয়ে বল্লে, এ যুগে আমি ত জয়সেন ছিলাম না! আমার নাম ছিল রতন সিংহ আর তোমার নাম ছিল ভূষণ সিংহ। কিন্তু আমরা রাণা প্রতাপের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে রতন-ভূষণ সমস্ত ত্যাগ করেছিলাম!

মূর্তি আর কিছু বলবার আগেই আমি বিশেষ অনিচ্ছার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, তা ভাই রতনসিংহ, আজও কি ভূষণসিংহকে সারারাত তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে হবে নাকি? আমি আজ বিশেষ ব্যস্ত। বন্ধুদের জন্যে একটা নাটক লিখছি, সরস্বতী পূজোর দিনই অভিনয়। আমার কিন্তু ভাই নিঃশেষ ফেলবার সময় নেই!

মূর্তি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জবাব দিলে, কিন্তু ভূষণসিংহ, আমাদের অভিযানের নাটক ত এখনো শেষ হয়নি, সেখানে যবনিকা পড়লে—তারপরে সুরু হবে তোমার সত্যিকারের নাটক লেখা। আজ এসো আমার সঙ্গে—

এই বলে রতনসিংহ এমন ভাবে আমায় আহ্বান করল যে, সে আমন্ত্রণকে আমি কোনমতেই ঠেলতে পারলুম না। রাজপুতদের জীবনে তখন জাগরণের এক অদ্ভুত সাড়া পড়ে গেছে। দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে—সমস্ত বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করে সবাই রাণা প্রতাপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যাঁদের দিন কাটত রাজ-প্রাসাদে, নিশা যাপন করত যারা কোমল শয্যায়, তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রত নিয়েছে—পর্ণ কুটিরে থাকবার আর পেটের

ক্ষুধা দূর করতে পোড়া রুটি খাবার! আকাশের তারাগুলির দিকে তাকালে মনে হয় অনেক রাত হয়ে গেছে। কালপুরুষ ঠিক মাথার ওপর চক্ চক্ করে জ্বল্‌ছে। আশে পাশে, নীচে ওপরে—পাহাড়ের কোলে-কোলে সূচিভেদ্য অন্ধকার। রতন আর আমি পাশাপাশি চলছিলাম—কারো মুখে কোন কথা নেই। রাণা প্রতাপের মনে যে বেদনা তা' যেন সমস্ত রাজপুত জাতি ভাগ করে নিয়েছে। নইলে একা রাণা সে দুঃখ সইতে পারবেন কেন? পাহাড়ের একটা কোণে এসে রতন থমকে দাঁড়ালো। বল্লে, ভূষণ, তোর সঙ্গে বিশেষ দরকারী কথা আছে। আমি জিজ্ঞাসু হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। রতন বল্লে, শোন, কিন্তু খুব গোপনীয়। রাণা আজ কোন রকমে জান্‌তে পেরেছেন যে, একজন রাজপুত বিশ্বাসঘাতকতা করে বহু মণিমাণিক্য নিয়ে শত্রুপক্ষে যোগ দেবার জন্য চলে যাবে। এই অন্ধকার রাতই সে পালাবার উপযুক্ত সময় বলে বেছে নিয়েছে। আজ রাত্রে পাহারা দেবার ভার পড়েছে তোমার ওপর। তাই খবরটা তোমায় জানিয়ে দিয়ে গেলাম। আমি অবাক হয়ে বল্লাম, বল কি রতন, এমন লোকও রাজপুতদের মধ্যে আছে? রতন জবাব দিলে, আছে বৈকি ভূষণ! এই পৃথিবীতে সবই সম্ভব; কর্দ্দমে যেমন কমল ফোটে ঠিক তেমনি চন্দনেও মাছি গিয়ে পড়ে! আমাদের সব সময় জাগ্রত-চক্ষু নিয়ে প্রহরায় নিযুক্ত থাকতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি তারা সংখ্যায় খুব বেশী হয়? রতন একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলে, বোধহয় তা হবে না, কেননা তাতে ধরা পড়ার বেশী সম্ভাবনা! আর যদি তোর অনুমান সত্য হয় তবে এই রইল শঙ্খ—শঙ্খধ্বনি করা মাত্রই আমরা এসে উপস্থিত হব; ভয় নেই। এই বলে একটি শঙ্খ আমার হাতে দিয়ে রতন পাহাড়ের

অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নিশীথ রাত্রে তোমরা কেউ আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কি? তাকিয়ে দেখো আর শুনো, তোমার কানে-কানে ওরা কি কথা বলে, কি প্রেরণা জাগায়, কি মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তোলে! আজ আকাশে এক টুক্‌রো মেঘ নেই! ঝিক্-মিক্ করছে লক্ষ লক্ষ, কোটি-কোটি তারা! ঘুম চোখের পাতা থেকে ছুটি নিয়ে পালালো। যদিই সে আসন নেবার কোন আয়োজন করে—মনে মনে আমি স্মরণ করি রাণা প্রতাপের অভিনব দেশ-প্রেমের কথা, তাঁর স্বেচ্ছা-দারিদ্র্য বরণের কথা, তাঁর বাণীর কথা, তাঁর বিদ্যুৎ-বেগ অশ্ব চৈতকের কথা! সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বুকে কি যেন ছবি আঁকা হয়। আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি! আরো খানিকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবার পর হঠাৎ মনে হল পৃথিবীতে কি আর লোক নেই? চেয়ে আছি ত চেয়েই আছি—শুধু পাহাড় আর পাহাড় তার ওপর জমাট অন্ধকার! মাঝে মাঝে মনে হয় অন্ধকার নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। একটু তাকিয়ে থেকে বুঝলাম যে, ওগুলো ঠিক অন্ধকার নয়,—মেঘ চলাফেরা করছে পাহাড়ের গা বেয়ে।

আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর চোখে অন্ধকারটা সয়ে এলো। তখন পাহাড়ের উঁচু-নীচুটাও একটু বোঝা যেতে লাগলো। হঠাৎ মনে হল আমারই কি চোখের ভুল? একটা ছায়া যেন ওপর থেকে নীচে নেমে আসছে। পিঠটা একটু কুঁজো মতন। পিঠে করে সে যেন কি বয়ে নিয়ে আসছে। আমার সন্দেহ হল শত্রুপক্ষের গুপ্তচর নয় ত? চুপচাপ একটি বড় পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম। মূর্তিটা ওপর থেকে নীচে নেমে আসছে—আস্‌তে যে তার বেগ পেতে হচ্ছে সেটা বুঝতে খুব কষ্ট হয় না। হয়ত কোন

বুড়ো রাজপুতের ওপর গোপনীয় কাজ পড়েছে এই ভেবে প্রথমটা থমকে দাঁড়ালাম. তারপর মনে পড়ল রতনের কথা। সে আমায় সাবধান করে গিয়েছে। হাতের তরোয়ালটা বাগিয়ে ধরে পাথরের আড়ালে শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম। যে ঝোলাটি লোকটা পিঠে নিয়েছে —নামবার সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতর থেকে টুং টাং শব্দ বেরুচ্ছে। এক মুহূর্ত, তার পরই হঠাৎ পেছন থেকে গিয়ে লোকটির একটা হাত চেপে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঝোলাটা মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু একি! আমি যে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না! লোকটা আর কেউ নয়—রতনের বাবা! আমি চীৎকার করে উঠে বল্লাম. আপনি—আপনি করেছেন এই কাজ ?

বৃদ্ধ ধারণাই করতে পারে নি যে, একজন অন্ধকারের মধ্যে তার রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে! বল্লে, ভূষণ, তুই! কিন্তু টু শব্দটি করিসনে বাবা! তা' হলে আমার প্রাণ যাবে!

আমি তখনও তার হাতটা ধরে বল্লাম, আপনার প্রাণ যাওয়াই উচিত। বুড়ো হয়েছেন—তিন কাল গিয়ে এক কালে এসে ঠেকেছে, এখনো এই চুরি করবার মতলব ছাড়তে পারেন নি? বুড়ো বল্লে, কিন্তু তুই ত জানিস বাবা ভূষণ! আমি চোর নই, রতনের আমি বাবা! এই জিনিষগুলি নিয়ে যদি আমি দিল্লীর দরবারে পৌঁছুতে পারি তবে রাজ-দরবারে মস্ত আসন পাবো, পাহাড়ের নীচে আমার জন্যে ঘোড়া অপেক্ষা করছে, তুই বাছা আমায় ছেড়ে দে— আমি তোকে আশীর্বাদ করছি।

আপনার আশীর্বাদে আমার কোন লোভ নেই—গর্জে উঠে আমি বল্লাম। বুড়ো বল্লে, তা হলে কি আমায় রাণার কাছে ধরিয়ে দিবি? আমি বল্লাম, নিশ্চয়ই দেবো। আর সেই

কাজের জন্যেই ত' আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। বৃদ্ধ যেন এইবার একেবারে ভেঙে পড়ল। বল্লে দেখ, আমি বুড়ো হয়েছি—আর তা ছাড়া আমি তোর জ্যাঠামশাই—তোরও নিজের বাবার মতো। আমায় এইভাবে ধূলোর সাথে মিশিয়ে দিবি? আমায় তুই ক্ষমা করে মুক্তি দে আমি বল্লাম, রতনের বাবা বলে আপনার ওপর আমার দয়া হচ্ছে। সে যদি জান্‌তে পারে চোর তার বাবা নিজে, তা' হলে সে কি রাজপুতদের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে? শুধু তার মাথা যাতে হেঁট না হয় সেই জন্যে আপনাকে মুক্তি দেবো—কিন্তু মণি-মুক্তোর থলি এইখানে রেখে যান। রাজপুতনার কাক-পক্ষীতেও জান্‌তে পারবে না কে এই কাজ করেছিল। হঠাৎ ওপর থেকে কার গলা শোনা গেল, কাক-পক্ষীতে জান্‌তে না পারুক, কিন্তু আমার চক্ষে কেউ ধূলো দিতে পারবে না। ভূষণ, তুমি রাণার অনুমতি না নিয়ে অপরাধীকেকিছুতেই ছেড়ে দিতে পারো না। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, রতন নিজে পাহাড়ী-পথ ধরে নেমে আসছে। এইবার আমাদের দুজনের মুখে আর কথা বেরুল না। রতন বল্লে, ভূষণ, অপরাধীকে মুক্তি দেবার অধিকার তোমার নেই। রাণার কাছে বিচারের জন্যে উপস্থিত হতে হবে। তিনি যে দণ্ড দেবেন তাই মাথা পেতে নিতে হবে এই বৃদ্ধকে।

আমি বুঝ তে পারলাম না—সব জেনে শুনেও রতন কি করে নিজের বুক বেঁধেছে! রাণার বিচারে যে তার বাবার প্রাণ দণ্ড হবে সে কথা কি রতন জানে না? জানি আমরা তিন জনই, তবু সেই কঠিন দণ্ডের সম্মুখীন হতে হবে! রতন নিজে এগিয়ে এসে তার বাবার হাত ধরলে। তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে, এই মণি-মাণিক্যের থলি নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে এসো ভূষণ। এই বিচারের প্রথম

সাক্ষী আমি আর দ্বিতীয় সাক্ষী তুমি। তিন জনে পাহাড়ী-পথ বেয়ে ওপরে উঠে চল্‌লাম। কারো মুখে একটা কথা নেই। শুধু আমার পিঠের মণি-মাণিক্যের থলির শব্দে বুঝতে পাচ্ছিলাম আমরা বেঁচে আছি আর নড়াচড়া করছি। নাঃ—দুর্বলতা আমাকে ত্যাগ করতে হবে। রতন যদি সত্যি কথা বলে আমিই বা বল্‌তে পারবো না কেন? আমি যে রাজপুত সে কথা বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে জীবনে। আমাদের পায়ের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল, হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে আমি পড়ে গেলাম। থলির সমস্ত মণি-মুক্তো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমি কেমন যেন হক্‌চকিয়ে গেলাম, হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি কোথায় রাজপুতনার পাহাড়?

আমি কোলকাতার বাসায় তেতালার ঘরে শুয়ে আছি। অনেক বেলা হয়ে গেছে—আমার বিছানার এপাশে-ওপাশে একেবারেই মণিমুক্তো নয়,—অনেকগুলি বই ছড়িয়ে পড়ে আছে। মনটা যেন কেমন ঝিমিয়ে গেল। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখি শুধু কতকগুলো হিজিবিজি লেখা—যেমন কোনো পুরোণো বাড়ীতে থাকে। স্থির করে ফেল্লাম, এই ভুতুড়ে বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। নইলে রোজ রাত্রিরে শীতের মধ্যে কোথায় আরাম করে ঘুমুবো, না—চড়কী-বাজীর মতো ঘুরে বেড়াতে হবে! চা'তে পর্য্যন্ত মন বসলো না, সোজা পিসিমার কাছে গিয়ে আবেদন পেশ করলাম। আমার মনের কথা শুনে পিসিমা ত' তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বল্লেন, আহ্লাদের কথা শুনে আর কাজ নেই। এদ্দিন পরে একটা মনের মতন ঠাকুর-ঘর পেয়েছি তা ওর কথায় ছেড়ে যাবো! ভাড়াটে বাড়ীতে এ সব পাওয়া যায় নাকি! আমি বল্লাম, পিসিমা, তোমায় আমি কথা দিচ্ছি, টালা থেকে টালিগঞ্জ অবধি ঘুরে যে করেই হোক সাত দিনের মধ্যে আমি

তোমার মনের মতো বাড়ী খুঁজে বের করে দেবো। পিসিমা ভুরু কুঁচকে জবাব দিলেন, তোমার মুরোদ ত' আমার জানা আছে—কাজেই নতুন করে তার আর হদিশ দিতে হবে না। এখন চা খেয়ে কোন রাজ্যি জয় করতে যাবে যাও। বুঝলাম, পিসিমার কাছে কোনো উপায়ে এর মীমাংসা হবে না! এক কথায় বলতে গেলে বাড়ী ছাড়বার সঙ্কল্পে জলাঞ্জলি দিয়ে এক পা-হু' পা ক'রে বাইরের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। সেদিনের খবরের কাগজটা খুলে সবে বসেছি—এমন সময় এক বন্ধু এসে উপস্থিত। বল্লাম বোস্ ভাই, অনেক কথা আছে। সঙ্গে সঙ্গে চাকরকে ডেকে হু' কাপ চা আন্তে হুকুম করলাম। চা এলো, তাতে একটা চুমুক দিয়ে বন্ধুকে সব কথা খুলে বল্লাম, যেমন নাকি লোকে গল্প বলে। বন্ধু খানিকটা গুম্ হয়ে থেকে জবাব দিলে, তুই বোধ করি কোনো গল্প পড়েছিস তাই আমায় শোনাচ্ছিস। আমি জবাব দিলাম, যে গল্প তোমাকে শোনালুম তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। এই বলে ওকে ওপরে নিয়ে গিয়ে দেয়ালের রেখাগুলো দেখালুম। বন্ধু জবাব দিলে, তাইত! আমি যে এর কিছুই বুঝতে পচ্ছি না, তবে এটা যে ভুতুড়ে ব্যাপার নয় সেটা ঠিক। লণ্ডনের স্পিরিচুয়্যাল সোসাইটিতে একখানা চিঠি লিখে প্রশ্ন করলে হয়। ওরা ওই সব ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করে কিনা! কাকার মুখে শুনেছি। আচ্ছা, তুই এক কাজ করিস! আজ রাত্তিরে যদি তোর পূর্ব্ব জন্মের বন্ধু ডাকতে আসে কিছুতেই উঠবি না, ঘাপ্টি মেরে পড়ে থাকিস! আমি বল্লাম, নিশ্চয়। আজ রাত্তিরে আর কিছুতেই যাচ্ছি না ওর সঙ্গে। পায়ের হোঁচটের ব্যথা এখনো যায় নি। কি করে জানিনা—বন্ধুর মুখে পিসিমা কথাটা জেনে ফেল্লেন; তিনি শোবার সময় আমার তেতলার ঘরে এসে হাজির। বল্লেন,

আজ কিছুতেই তোকে এ ঘরে শুতে দেবোনা। আমি বল্লাম, কেন, এ ঘর আবার কি দোষ করল? পিসিমা জবাব দিলেন, শুনলাম তোর ওপর নাকি উপদেবতা ভর করে রাত্তিরে? আজ আমার কাছে গিয়ে শুবি চল—আমি ভয় পেয়ে পিসিমার আঁচলের তলায় গিয়ে শোবো সে বান্দা আমি নই। বল্লাম, আমার বন্ধুটি তোমায় ঠকিয়েছে! ওকে বানিয়ে একটা গল্প বলেছি, ও তাই বিশ্বাস করে নিয়েছে। পিসিমার তবু যেন সন্দেহটা গেল না। বল্লেন, তা হলে তুই শুয়ে পড় আমি তোর মাথায় দুর্গা-নাম জপ করে দি; বাধ্য হয়ে টান্-টান্ শুয়ে পড়তে হল, পিসিমা আমার শিয়রে বসে মালা ঘোরাতে আর দুর্গা-নাম জপ করতে লাগলেন। এইভাবে খানিকক্ষণ থাক্‌বার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানতেও পারিনি।

*   *   *   *

ওঠ—ওঠ—ওঠ শিগগীর—কার ব্যাকুল কণ্ঠের চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আমার পূর্ব জন্মের বন্ধু। আমাকে জাগতে দেখেই ফিস ফিস করে বল্লে, কথা কইবার সময় নেই ভাই, শীগ্‌গীর চলে এসো। আমি জিজ্ঞেস করলাম কোথায়? পূর্ব জন্মের বন্ধু বল্লে, বাঙলার গাঁয়ে গাঁয়ে বর্গীরা আগুন জ্বালিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের পুড়িয়ে মারছে। চল, সেই আগুন নেভাতে হবে, ওদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। আমি লাফিয়ে উঠলাম; বল্লাম নিশ্চয় যাবো ভাই রতন। বন্ধু জবাব দিলে, এখন আমার নাম ত রতন নয়; আমার নাম মোহনলাল আর তোমার নাম যতনলাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা মোহনলাল, তুমি কি সেই মোহনলাল?

মোহনলাল আমায় থামিয়ে দিয়ে বল্লে, চুপ! এখন কথা কইবার সময় নেই যতনলাল, আমার হাত ধর, এগিয়ে যেতে হবে সামনে। অন্ধকারের বুক চিরে আমরা তুজনে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চল্লাম। তুপাশের গ্রাম গুলি আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলছে। আর তারি ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে গ্রামবাসীদের মর্মন্তুদ আর্তনাদ! চলতে চলতে মোহনলাল বল্লে, দেখতে পাচ্ছ ভাই যতনলাল, বাঙালীরা কেমন অসহায়! নিজেদের রক্ষা করবার ক্ষমতা এদের নেই। আমি দিন রাত শুধু ভাবি কে এদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারে। ভাবতে ভাবতে যখন উন্মাদ হয়ে যাই তখন মনে হয় বাঙলার নবাবের সঙ্গে একবার দেখা করবো? কিন্তু আমার ভয় হয়···প্রহরীরা হয়ত নবাবের কাছে আমায় যেতেই দেবে না। আমি বল্লাম, আমাদের মতো একদল কিশোর যদি এগিয়ে আসে তবে বোধকরি এরা নতুন করে দল বাঁধতে পারে। মোহনলাল বল্লে, সত্যি কথা ভাই যতনলাল! শুধু দল বাঁধলে ত হবে না, প্রথমে এদের বাঁচাতে হবে—ক্ষুধায় দিতে হবে অন্ন, রুগ্নকে করতে হবে শুশ্রূষা, বাঁচিয়ে তুলতে হবে এই মৃতপ্রায় জাতকে। তারপর অত্যাচারের হাত থেকে এদের রক্ষা করবার ভার আমাদেরই নিতে হবে। আমি বল্লাম, এ দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারছি না ভাই মোহনলাল। মোহনলাল হেসে উঠে জবাব দিলে, আমাদের সামনে দৃশ্য এখনো তত ভয়ংকর হয়ে দেখা দেয় নি ভাই। আমরা ত শুধু দেখছি অগ্নির লেলিহান শিখা; কিন্তু এই শিখার বুক চিরে যদি চাইতে পারতে তবে দেখতে কত মা তার সন্তানকে বুকে চে:পে ধরে দগ্ধ হয়ে বেঁচে গিয়েছে। কত মা সন্তানকে খেতে দিতে পারেনি! সেই

অনাহারে রুগ্ন ছেলেকে মায়ের কোল থেকে টেনে নিয়ে বর্গীরা আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে; কত সতী এই জ্বলন্ত আগুনকে তাদের সিঁথের সিঁদুরের রক্তে আরও গাঢ় লাল করে রাঙিয়ে দিয়েছে। যদি মনে জোর থাকে, যদি বুকে সাহস থাকে আমার সঙ্গে দেখবে এসো। মোহনলাল উন্মাদের মতো আমায় গ্রামের ভেতর টেনে নিয়ে চল্লো। হঠাৎ তখন অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা লোক। চুলগুলো তার উস্ক-খুস্কো, চোখ দুটো আগুনের তাপে লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। সামনে মোহনলালকে দেখতে পেয়ে বল্লে, এই যে মোহনলাল, আমি তোমাকেই এতক্ষণ ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। বর্গীরা তোমার বোনকে ধরে নিয়ে গেছে। নিয়ে যাবার সময় মেয়েটার 'দাদা' 'দাদা' বলে সে কী কান্না! সে চীৎকার শুনলে বুঝি পাষাণের চোখেও জল আসে। মোহনলালের চোখ দুটো একবার জোনাকীর মত জ্বলে উঠল। সে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে শুনলে যতনলাল, শুনলে? আমরা বাঙালী, আমাদের মা-বোনদের রক্ষা করতে পারি না! সমুদ্রের জলে গোটা এই দেশটা ভেসে যায় না কেন? তাতে নতুন ফসল ফলবার সুযোগ আসবে! কিন্তু লাফিয়ে উঠলাম আমি। বল্লাম, তোমার কথা শোনবার সময় নেই মোহনলাল। তোমার বোনকে ধরে নিয়ে গেছে···সে ত আমারও বোন। আমাদের বোনকে বাঁচাতে হবে। মোলনলাল ছুটে এসে আমার দুটি হাত চেপে ধরে বল্লে, পারবে যতনলাল···আমার বোনকে···তোমার বোনকে বাঁচাতে? আমি জবাব দিলাম, পারবো ভাই, নিশ্চয়ই পারবো। আমাদের সামনেই একটা কুঁড়ে ঘর পুড়ে যাচ্ছিল—আমি সেই আগুন থেকে জ্বালিয়ে নিলাম

একটা মশাল। মোহনলাল বল্লে, নিজের হাতে তুমি যে মশাল জ্বালালে যতনলাল, তা কখনো নিভতে দিও না। মশাল হাতে আমি ছুটে চললাম,—যে দিকে বর্গীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গিয়েছে। সঙ্গে রইল মোহনলাল। আমাদের মনে হতে লাগলো পথগুলো তীরবেগে আমাদের পেছু হটে যাচ্ছে আর আমরা সামনে এগিয়ে চলেছি উল্কার মতো। পথ—পথ—পথ! পথ আর ফুরোয় না! আমি বল্লাম, পথের কি আর শেষ নাই ভাই? মোহনলাল বল্লে, পথ হয়ত আমাদের ধৈর্য। এই ধৈর্যের পরীক্ষায় যদি আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি তবেই হবে আমাদের জয়লাভ। আমি জবাব দিলাম, তুমি ঠিক কথা বলেছ ভাই। অল্পতেই আমরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠবো না। আমাদের কাজ রয়েছে সামনে। এগিয়ে আমাদের যেতেই হবে। পেছু হঠবার মন্ত্র ত' আমরা নিই নি। মরা দেশকে আর···আধমরা প্রাণকে যারা জাগিয়ে তোলবার দীক্ষা নিয়েছে···তাদের দৃষ্টি থাকবে শুধু সামনের দিকে। অবশেষে দীর্ঘ পথ চলার পর দেখা মিলল বর্গীদের ছাউনীর। সারাদিন লুটপাট আর অত্যাচার করবার পর ওরা সবাই অঘোর ঘুমুচ্ছে। মোহনলাল বল্লে, আমি প্রত্যেকটি তাঁবুতে খুঁজে দেখবো—কোথায় আমার বোন। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চল্লো অনুসন্ধান। কিন্তু না, সে নেই! সকলের শেষে একটি সৈনিককে আমরা মাঠের ধারে খুঁজে পেলাম। তাকে ভয় দেখাতে সে বল্লে, আমি ত কিছু জানি না! কিন্তু আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম; এ ছাউনিতে যদি না থাকে তবে অন্য ছাউনীতে আমাদের খুঁজে বেড়াতে হবে। গোটা দেশময় বর্গীদের ছাউনী পড়েছে। চল ভাই মোহনলাল,

—অভিযান আমাদের অসমাপ্ত থাক্‌তে পারে না…এই বলে আমি আমার হাতের মশাল তুলে ধরলাম উঁচুতে। তার শিখা গিয়ে বর্গীদের শিবির স্পর্শ করল। মোহনলাল অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আমি বল্লাম, কি দেখছ বন্ধু আমার মুখে? মোহনলাল জবাব দিলে আমার বোনকে আমি খুঁজে পেলাম না বটে তবে তার চাইতে বড় সম্পদ আমি পেয়েছি। আমি আরো বিস্মিত হয়ে শুধোলাম, সে সম্পদটি কি? মোহনলাল আমার কাঁধে হাত রেখে জবাব দিলে, সে তোমার দেশাত্মবোধ। তুমি তোমার নিজের দেশকে চিনেছ, নিজের ভাই-বোনদের বাঁচাবার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেছ…আর সকলের উপর জ্ঞানের-মশাল জ্বালিয়েছ তোমার হাতে। আবার বলি বন্ধু, ওই জ্ঞানের প্রদীপকে নিভতে দিও না। যেখানে দেখবে অজ্ঞানতা—তোমার ওই মশাল দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে যেখানে জ্ঞানের দীপ-শিখা। যেখানে দেখবে ক্ষুধাতুর কাঁদছে…সেখানে তুমি…অন্ন যোগাবার ভার গ্রহণ করবে; যেখানে দেখবে…রুগ্ন রোগে কাতর সেখানে তুমি শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচিয়ে তুলবে। এই মহান কাজে তুমি তোমার কিশোর বন্ধুদের ডাকো…আমার অসমাপ্ত কাজ তারাই সম্পূর্ণ করে তুলবে। আজ আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ভাই—

আমি বল্লাম, মোহনলাল, তুমি কি সত্যিই চলে যাবে? আর তোমার দেখা পাবো না? মোহনলাল জবাব দিলে, দেখা আমার সব সময়েই পাবে তোমার অন্তরে। প্রেরণা হয়ে যেখানে আমি বাসা বাঁধবো।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল।

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি—আমি আমার তেতলার ঘরে শুয়ে আছি। সকলের আগে দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি গেল। সেখানে কালো রেখাতে আঁকা-আঁকি একটিও নেই, শুধু রয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি ছত্র—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—
তুই একলা চল্‌রে—।"

একি স্বপ্ন না আর কিছু?

যদি স্বপ্ন হয় তবে সে স্বপ্ন যেন আর না ভাঙে!

রূপকথা

পরীর দৃষ্টি

এক

তারা চার বন্ধু।

—গলায় গলায় ভাব।

রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে, সেনাপতির ছেলে আর শেষেরটি রাজগুরুর ছেলে।

লোকে দশ-মুখে তাদের গুণের কথা বল্‌তো।

রাজপুত্র যেমন হ'য়েছিল রাজকার্যে পটু আর যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, মন্ত্রীপুত্র তেমন কূট রাজনীতিতে অদ্বিতীয়, সেনাপতি-পুত্র ঠিক তেম্‌নি যোদ্ধা বলেই খ্যাতিলাভ করেছিল—আর গুরুপুত্র হ'য়েছিল সবার সেরা পণ্ডিত।

শোনা যেত যে, রাজপুত্রের কাছে জিজ্ঞেস না করে রাজা কোন কাজেই হাত দিতেন না। মন্ত্রণা-গৃহে যাবার আগে, মন্ত্রী ছেলের সঙ্গে বেশ একটু পরামর্শ করতেন। ছেলে পাশে না থাক্‌লে নাকি সেনাপতি যুদ্ধে হেরে আসতেন; আর রাজসভায় কোন বড় পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার করতে হ'লে রাজগুরু ছেলের সঙ্গে আগে সে বিষয়ের মীমাংসা করে যেতেন।

এদের চারজন ছিলেন যেন রাজ্যের চারটি থাম। লোকে বলতো, ব্রহ্মার চারমুখ থেকে জন্ম নিয়ে এরা চার জনে তাদের রাজ্যের কল্যাণেই পৃথিবীতে নেমে এসেছে।

একদিন রাজপুরীর দেউলের নহবৎখানা থেকে ভোরের সানাই জানিয়ে দিলে—চারকুমার তাদের পাঠ শেষ করে গুরু-গৃহ থেকে ফিরে এসেছে।

রাজা ডেকে বল্লেন, ওরে তোরা বাজা—বাজা, আজ আমার রাজ্যে আনন্দের মেলা বস্‌বে। দুঃখী যেন রাজ্যে কেউ না থাকে। সক্কলকার মুখে আমি হাসি দেখতে চাই।

সাতদিন সাতরাত আনন্দের মেলা বস্‌ল। কারো মুখে দুঃখের ছায়াটুকুও নেই। শুধু খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, হাসি-খেলা! রাজ্যের ছেলে বুড়ো দলে দলে এসে তাতে মেতে উঠল।

শেষকালে চার বন্ধুর একদিন রাজসভায় ডাক পড়ল।

রাজা তাদের কাছে ডেকে আদর জানিয়ে বল্লেন,—তোরা আমার বাগানের সেরা চারটি ফুল। তোদের এমন কিছু কাজ দেখাতে হ'বে যাতে বুঝতে পারবো, গুরুর কাছে তোরা যথার্থই বিদ্যালাভ করেছিস্‌।

তারা মাথা নুইয়ে উত্তরে জানালে,—মহারাজ, আমরা চার বন্ধু এ রাজ্যের স্নেহের পাত্র। রাজ্যে ছেলে-বুড়ো সকলেই আমাদের ভালবাসে। সামান্য একটু কাজ করলেও আমাদের প্রশংসায় রাজ্য ভ'রে ওঠে। এখানে আমাদের কাজের ঠিক যাচাই হবে না। সাধারণ বেশে আমরা ভিন্-দেশে গিয়ে আমাদের বিদ্যার পরিচয় দেবো। সেইখানেই আমাদের কাজ যাচাই করবার ঠিক মাপ-কাঠি মিল্‌বে।

কথাটা শুনে রাজসভা শুদ্ধ সব লোক চম্‌কে উঠল। রাজ-সিংহাসন কেঁপে উঠল!

মন্ত্রীর স্থির মস্তিষ্ক বিচলিত হ'ল।—সেনাপতির তলোয়ার খাপের ভেতর একটু রিন্—রিন্ শব্দ করেই থেমে গেল।

গুরুর মুখের শ্লোক, বলতে বলতে আট্‌কে গেল।

তাঁদের যে প্রত্যেকেরই ঐ একটী ক'রে মাণিক—তাঁদের নয়ন—তাঁদের সব!

তবু তাঁদের ছেড়ে দিতে হ'ল! অশ্রুজলের ফাঁকে-ফাঁকে বিদায়ের বাঁশী বেজে উঠল।

কে জান্‌তো—এত আনন্দের পর—এত বেদনা তাঁদের জন্যে জমা ছিল!

চার বন্ধুর জন্যে রাজা চারটি পক্ষীরাজ ঘোড়া আন্‌তে আদেশ দিলেন। তারা বল্লে,—না মহারাজ,—আমরা তো বলেছি সাধারণ বেশে যাবো। পক্ষীরাজ সঙ্গে থাক্‌লে আমাদের সকলেই চিনে ফেলবে।

রাজা দুঃখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।—তাঁর ছেলেকেও শেষকালে ভিখিরী সাজতে হ'ল!

কৃষকের পোষাক প'রে চার বন্ধু বেরিয়ে পড়ল—দেশ-দেশান্তরের সন্ধানে।

সমস্ত দিন চলার পর যখন গোধূলিতে পশ্চিম আকাশ লাল হ'য়ে উঠেছে তারা যখন অন্য এক রাজার রাজপুরীতে এসে পৌঁছুল।

পুরীতে ঢুকেই দেখলে—মহারাজের সান্ধ্য-সম্মিলনী বসে গেছে।

দলে দলে প্রার্থী—রাজসভায় কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজা দেখতে যেমন তেজস্বী, মুখখানাও তাঁর আবার তেমনি করুণা-মাখানো।

সকলেই আপন আপন পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফিরে গেল—বাকি রইল তারা চার বন্ধু।

রাজার দৃষ্টি হঠাৎ তাদের ওপর পড়ল। কাছে ডেকে রাজা তাঁদের শুধোলেন,—বাছা, চেহারা দেখে বোধ হচ্ছে তোমরা উঁচু ঘরের ছেলে। কিন্তু তোমাদের এ বেশ কেন?

তারা নমস্কার জানিয়ে বল্লে, মহারাজ আমরা চার বন্ধু চাক্‌রীর খোঁজে এসেছি। আমাদের বড়লোক বলে ভুল করবেন না।

রাজা বল্লেন, তোমাদের এই সুকোমল চেহারা—তোমরা কি কাজ করবে বল?

উত্তরে রাজপুত্র বল্লে, মহারাজ আমরা যে-সে কাজ করি না। আমরা চার বন্ধু মিলে অসাধ্য-সাধন করতে বেরিয়েছি। সাধারণ লোকের মত মাইনেও আমরা চাইনে, কাজ দেখে আমাদের পুরস্কার দেবেন। আপনার হাতে যদি তেমন কিছু অদ্ভুত আর অসাধ্য কাজ

থাকে—আমাদের বঞ্চিত ক'রবেন না। নৈলে আমাদের ভিন্‌দেশের উদ্দেশে যেতে হ'বে।

রাজার হাসি-খুসী-মুখখানা হঠাৎ ঝরে-পড়া-যুঁইয়ের মত ম্লান হ'য়ে এলো। তিনি ধীরে ধীরে বল্লেন, হ্যাঁ, আমার হাতে একটা শক্ত কাজ আছে বটে। কিন্তু তা তোমরা কি পারবে?

তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন,—না থাক্—কাজ নেই, তোমাদের এই কচি চেহারা—তোমাদের দিয়ে জগতে অনেক কাজ হ'বে। কেন মিছি মিছি প্রাণ খোয়াতে যাবে বল?

সেনাপতি-পুত্র বল্লে, না মহারাজ, আপনি কিচ্ছু সঙ্কোচ করবেন না। আমাদের কাজই তো এই! আর যখন আমরা একবার এর খোঁজ পেয়েছি—তখন এখান থেকে নড়ছিনে!

রাজা সুরু করলেন;—আমার এক মাত্র ছেলে ছিল—শুধু একটি ছেলে! দেবতার ছেলে যেন পথ হারিয়ে আমার পুরীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। দিব্যি ফুটফুটে চেহারা।

বড় বড় জ্যোতিষীদের আনালুম—ছেলের ভবিষ্যৎ দেখ্‌তে। তাঁরা দেখে বল্লেন, ছেলেতে সমস্ত রাজ্যশ্রী বর্ত্তমান।

বড় আশায় নামকরা-সব-পণ্ডিত রেখে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলুম। কিন্তু এক কাল-রাত্রে সকলকে ফাঁকি দিয়ে, বাছা আমার স্বর্গে চলে গেল! কি রোগে যে সে চলে গেল! —আমার সভার বড় বড় রাজ-বৈদ্যেরাও কিছু টের পেলেন না। —একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রাজা থাম্‌লেন।

কিছুক্ষণ বাদে আবার ধীরে ধীরে সুরু করলেন, প্রাণ ধরে ওর শব দাহ করাতে পারলুম না।

—রাজার দু'গাল বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগলো। তারপর লোহার একটা বাড়ী তৈরী করিয়ে তার ভেতর দেহটা রাখবার ব্যবস্থা করলুম।

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—যেতে লাগলো আর তার শরীর থেকে মাংস পঁচে-গলে পড়তে লাগলো!

শেষকালে হাড় ক'খানা বাকী রইল। আমি তা-ও ছাড়তে পারলুম না। তারও মায়া বড় মায়া—

রাজা মাথা নাড়তে লাগলেন।

তারপর একটি সুন্দর সোনার কৌটো তৈরী করিয়ে হাড় ক'খানা তার ভেতর রাখলুম।

এই হাড় ক'খানা খুলে দেখা আমার রোজকার এক কাজ হ'য়ে উঠল। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার—মাঝে মাঝে কৌটোটি চুরি যেতো!

রাজার চোখ রাগে জ্বলে উঠল!

তিনি বলতে লাগলেন, লোহার বাড়ী—আমি নিজ হাতে তালা বন্ধ করেছি—চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা রেখেছি—কিন্তু কিচ্ছু করতে পারিনি! রাত্তিরে মাঝে মাঝে কৌটোটি কোথায় উধাও হ'য়ে যেতো!

তার ওপর কাল রাত্রে এক দুঃস্বপ্ন দেখে মন আমার আরও খারাপ হ'য়ে গেছে। আমি দেখলুম, আমার রাজলক্ষ্মী যেন আমার শিয়রে এসে বলছেন—বাছা, তিন দিনের মধ্যে যদি কৌটোটি আর একবার চুরি যায়—তবে তুমি তোমার ছেলের হাড়গুলি জন্মের মত হারাবে—আর আমাকেও তোমার পুরী ছেড়ে যেতে হবে!

বলতে বলতে রাজা চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। তারপর হঠাৎ

দাঁড়িয়ে উঠে রাজপুত্রের হাত চেপে ধরে বল্লেন,—তোমরা আমার ছেলের হাড় ক'খানা বাঁচাও—অর্দ্ধেক রাজত্ব তোমাদের দোবো। যদি না পার তবে আর আমি বাঁচবো না।

রাজার স্বর আবেগে কাঁপতে লাগলো।

রাজপুত্র বল্‌লে,—কোন ভয় নেই মহারাজ—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা থাক্‌তে কৌটো চুরি যাবে না।

রাজা আশ্বস্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—বেশ, তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে এসো। কৌটোটি তোমাদের হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।

চার বন্ধুতে অতিথি শালায় রাত্রের আহার শেষ করে যখন আবার রাজবাড়ীতে ঢুকল তখন রাজসভা ভেঙে গেছে—মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি নীরব।

রাজা তাদের নিয়ে অন্দরে ঢুকলেন। ছুটো তোরণ পার হবার পর তারা এক প্রাঙ্গনে এসে পৌঁছলেন; সেই প্রাঙ্গনের সাম্‌নে মাথা উঁচু করে বিরাট কালো দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে এক লৌহ-পুরী।

রাজা তাদের নিয়ে সেখানে পৌঁছতেই প্রহরীরা প্রণাম করে সরে দঁাড়াল।

তাঁদের দেখিয়ে রাজা প্রহরীদের বল্‌লেন, ওরা এখন যেখানে খুসী যেতে চায়—যেতে দিবি। আর আমায় যেমন তোরা সম্মান করিস এদেরও ঠিক তেম্‌নি করবি।

প্রহরীরা সম্মতি জানালে।

রাজা সেই লৌহ-পুরীতে ঢুকে একটা ঘরের তালা খুলে ফেল্‌লেন। সেই ঘরের ভেতর মস্ত বড এক লোহার

সিন্দুক। সেই লোহার সিন্দুকের ভেতর সুন্দর একটি সোনার কৌটো।

কৌটোটি রাজপুত্রের হাতে দিয়ে রাজা বল্‌লেন,—আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাদের হাতে সঁপে দিলুম। হাত ছাড়া করো না।

রাজার চোখ জলে ভরে এলো। চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে তিনি চলে গেলেন।

—তিন—

তখন চার বন্ধু বসে পরামর্শ ক'রলে—এক সঙ্গে চারজনে জাগ্‌লে সমস্ত রাত কাটানো মুস্কিল হবে—শেষ রাতে হয়তো ঘুমিয়ে পড়তে হ'বে।

তার চেয়ে এক-এক প্রহর এক-এক জনের জেগে থাকা ভালো।

শেষে ঠিক হলও তাই।

প্রথম প্রহর জাগবে রাজপুত্র, দ্বিতীয় প্রহর—মন্ত্রীর পুত্র, তৃতীয় প্রহর সেনাপতি পুত্র,—আর শেষ প্রহর জাগবে গুরুপুত্র।

তাই তিন বন্ধু শুয়ে পড়ল—আর রাজপুত্র নিজের উত্তরীয় দিয়ে কৌটোটি কোমরের সঙ্গে বেঁধে স্থির হ'য়ে বস্‌ল!

থম্‌থমে রাত্তির—একে তো লৌহপুরী; তার ওপর কৃষ্ণপক্ষ। চারদিক থেকে যেন রাশি রাশি অন্ধকার তাঁকে গিলে খেতে আস্‌ছে।

রাজপুত্র হাতের তলোয়ার শক্ত করে চেপে ধ'রল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল—রাজপুত্র স্থির হ'য়ে বসেই আছে—হঠাৎ একটা আলো দেখে সে চম্‌কে উঠলো।

ধীরে ধীরে আলোটি বড় হ'য়ে এলো। রাজপুত্র অবাক হ'য়ে দেখলে—অন্ধকারের মতো কালো একটা কদাকার রমণীমূর্ত্তি—একটা মশাল হাতে নিয়ে লৌহ-পুরীতে ঢুকছে।

ভেতরে ঢুকেই মূর্ত্তিটি মশালটা নিবিয়ে ফেল্‌লে।

তারপর রাজপুত্রের ঘর পেরিয়ে সোজা দক্ষিণ মুখো চলে গেল।

রাজপুত্র ভাবলে এর ভেতর নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। এই না ভেবে হাতের মুঠোয় শক্ত করে তলোয়ারখানা বাগিয়ে নিয়ে মূর্ত্তিটির পেছু ধরলে।

মূর্ত্তিটি আস্তে আস্তে গিয়ে ছাদে উঠল। রাজপুত্রও সঙ্গে সঙ্গে উঠতে লাগলো।

ছাদের ওপর গিয়ে রাজপুত্র তো একেবারে অবাক্।

দেখে—খুব সুন্দরী একটি মেয়ে সেখানে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চারদিকে এত অন্ধকার কিন্তু মেয়েটির মাথা থেকে চাঁদের আলোর মত জ্যোতি বেরুচ্ছিল।

কদাকার মূর্ত্তিটি ঐ মেয়েটির কাছে গিয়ে বল্‌লে,—তুই এ বাড়ী থেকে যাবি কিনা বল্?

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে রাজপুত্রের হাড় ক'খানা রাজবাড়ী থেকে গেলে আমাকে বাধ্য হয়েই চলে যেতে হবে। তবু যতদিন এ বাড়ীতে রাজপুত্রের হাড়গুলো থাক্‌বে কেউ আমাকে এখান থেকে তাড়াতে পারবে না।

* * ঝট্‌পট্ করে একটা বাদুড় উড়ে গেল! * *

রাজপুত্রের বুঝতে বাকি রইল না যে, এই কদাকার মূর্ত্তিটা অলক্ষ্মী ছাড়া আর কেউ নয়, আর যে মেয়েটি বসে কাঁদছেন—তিনিই রাজলক্ষ্মী।

রাজপুত্র তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দিয়ে নীচে নেমে এলো।

কিছুবাদেই রাজপুরীর ঘণ্টা জানিয়ে দিলে এক প্রহর রাত শেষ হয়েছে।

রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রের গায়ে হাত দিয়ে ডাক্‌লে,—বন্ধু ওঠ, এবার তোমার পালা।

মন্ত্রীপুত্র উঠে হাই তুলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, কিছু দেখেছ কি বন্ধু?

রাজপুত্র বললে, হ্যা, কিন্তু আজ কিছু বলা হ'বে না। কাল দুপুরে এক সঙ্গে সকলের কথা শুনবো এখন।

মন্ত্রীপুত্র বললে—বেশ তাই হ'বে।

রাজপুত্র শুয়ে পড়লো, আর মন্ত্রীপুত্র সোজা হয়ে বসলো।

বহুক্ষণ কেটে গেল—মন্ত্রীপুত্র ব'সেই আছে হঠাৎ একটা খস্‌খস্ আওয়াজ পেয়ে মন্ত্রীপুত্র উঠে দাঁড়াল। তারপর চারদিক পাতি পাতি করে খুঁজে দেখলে—কৈ, কিচ্ছু নেই তো!

মন্ত্রীপুত্র আবার স্থির হয়ে বসল। কিছুক্ষণ পরেই দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়ে গেল। মন্ত্রীপুত্র সেনাপতি-পুত্রকে ডেকে দিলে।

সেনাপতি পুত্র শুধোলে, কি দেখ্‌লে বন্ধু? মন্ত্রীপুত্র উত্তরে বল্‌লে,—আজ তা জানানো হবে না, কাল দুপুরে সব কথা হবে।

সেনাপতি পুত্র পাহারায় বস্‌লো।

অনেকক্ষণ অম্‌নি কেটে গেল। হঠাৎ সে দেখ্‌লে একটা কালো মূর্ত্তি ধীরে ধীরে লৌহপুরীর তোরণদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।—প্রহরীরা কিন্তু লক্ষ্যই করছে না।

সেনাপতিপুত্র ভাবলে—এর ভেতর কিছু নেই তো? আর

দ্বিরুক্তি না ক'রে কোমরে শক্ত করে সোনার কৌটোটি বেঁধে সে ছুট্‌ল তার পেছনে।

সে শুধু চলেছে—আর চলেছে।—চল্‌তে চল্‌তে বহুদূর এগিয়ে এলো ; এতক্ষণ মূর্ত্তিটি বেশ দেখা যাচ্ছিল, হঠাৎ যেন একেবারে হাওয়ায় মিশে গেল।

সেনাপতিপুত্র এই অদ্ভুত ব্যাপারের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ফিরে আস্‌ছে এমন সময় দেখতে পেলে—রাস্তার পাশে বটগাছের নীচে একটি মেয়ে এক থালা পায়েস হাতে নিয়ে কাঁদছে।

এত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার কারণ শুধোতে মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে, আমার স্বামী একদিন পায়েস খেতে চেয়েছিল ; আমরা গরীব বামুন—গেরস্ত মানুষ, তাই সে কথা শুনে রেগে বলেছিলাম—যার এক পয়সা রোজগার করবার মুরোদ নেই—তার আবার পায়েস খাওয়ার রোগ কেন ? গলায় দড়ি জোটে না ?

এই কথা শুনে দুঃখে সত্যি সত্যিই তিনি বটগাছের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়েছেন।

মেয়েটি ফোঁপাতে লাগ্‌লো। সেনাপতিপুত্র চেয়ে দেখ্‌লে—বটগাছের ওপর সত্যি একটি মরা ঝুল্‌ছে। মেয়েটি বল্‌তে লাগ্‌লো, আমার মত অভাগী কে ? বেঁচে থাক্‌তে প্রাণে ধরে তো পায়েস তাঁকে খাওয়াতে পারলুম না—এখন যদি মরা মুখেও একটু পায়েস দিতে পারি তবে আমার প্রাণ একটু ঠাণ্ডা হয়। আপনি যদি দয়া করে মরটা নীচে নামিয়ে আনেন, তবে আমার বড় উপকার হয়।

সেনাপতিপুত্র মেয়েটির প্রশংসা না করে থাক্‌তে পারলে না। শবটি নীচে নামাবার জন্যে গাছে চড়্‌তে যাবে—এমন সময় মেয়েটি পেছু ডেকে বল্‌লে, আপনার কোমরে বাঁধা ওটা কি ?

সেনাপতিপুত্র বল্‌লে, হাড়ের কৌটো! মেয়েটি বল্‌লে, আমার জন্যে এতই যখন করতে যাচ্ছেন তখন দয়া করে ও অপবিত্র হাড় গুলো নিয়ে আর আমার স্বামীর দেহ ছোঁবেন না।

সেনাপতিপুত্র ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, তাতো মা আমি পার্‌বো না। এ জিনিষ কোনমতেই হাত ছাড়া ক'রবার উপায় নেই।

মেয়েটি মিনতি জানিয়ে বল্‌লে, কৌটোটি এই খানেই রেখে যান, আমি আগ্‌লাচ্ছি।—আমার কাছ থেকে ও জিনিষ হারাবে না।

—তা হয় না মা—বলে যেই সেনাপতিপুত্র গাছে চড়্‌তে যাবে অম্‌নি দেখে গাছের ওপর মড়া নেই। পেছন ফিরে দেখে মেয়েটিও অদৃশ্য হ'য়ে গেছে!

সেনাপতিপুত্র ভাবলে—এ নিশ্চয়ই সেই কালো মূর্ত্তির কাজ।

এই সব কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে ফিরে এসে দেখে তৃতীয় প্রহর শেষ হ'য়ে গেছে।

গুরুপুত্রকে ডেকে দিয়ে সেনাপতিপুত্র শু'য়ে পড়ল।

গুরুপুত্র জিজ্ঞেস্ ক'রলে—কি ব্যাপার বন্ধু?

সেনাপতিপুত্র পাশ ফিরে শুয়ে বল্লে, সবই কাল শুন্‌বে।

কতক্ষণ বসে আছে ঠিক নেই, হঠাৎ গুরুপুত্র শুন্‌তে পেলে ঘরের বাইরে যেন ভীষণ মারামারি আর চ্যাঁচামেচির শব্দ হ'চ্ছে।

কৌটোটি কোমরে শক্ত করে জড়িয়ে নিয়ে গুরুপুত্র বাইরে এলো। এসেই তো তার চক্ষু স্থির!

বিকট চেহারা-ওয়ালা সব দৈত্য, দানা মিলে ভয়ানক হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে।

কারো কপালের ওপর একটা চোখ, কারো মাথাই নেই—পেটের

ভেতর দুই চোখ—আর মস্ত বড় এক হা। কারো একটা হাতই নেই ; কেউ বা এক পায়ে লাফাচ্ছে।

তাকে দেখে সব লাফাতে লাফাতে এসে তার চার পাশে জড় হল।

কেউ বললে, ও—রে, কৌটোটা আমায় দে—না—রে—তোকে রাজা করে দে—বো।

কেউ বললে, ও মড়ার হাড় ফেলে দে, ফেলে—দে।

গুরুপুত্রের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

এমন সময় একটা লম্বা একপা-ওয়ালা দানা লাফাতে লাফাতে এসে গুরুপুত্রের কোমরে-বাধা কৌটোটিকে একটা লম্বা লাঠি দিয়ে ছুঁলে। যেমনি ছোঁয়া অম্নি কৌটোর ভিতর হাড়গুলো মানুষের মত কথা কয়ে উঠল।

—অমি তো যেতেই চাই, তোরাই তো আমাকে নিতে পারিস্ নে, তা আমি কি করবো ?

এই ভুতুড়ে কাণ্ড দেখে ভয়ে গুরুপুত্র এক দৌড়ে ঘরের ভেতর পালিয়ে এলো। তারপর আর কোনো গোলমালের শব্দ পাওয়া গেল না।

ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে এলো। গুরুপুত্র তিন বন্ধুকে জাগিয়ে বাসায় ফিরে এলো।

—চার—

সকাল বেলা চার বন্ধুকে রাজসভায় ডাকিয়ে রাজা গত রাতের খবর জিজ্ঞেস্ করলেন।

রাজপুত্র বললে, মহারাজ আজ ক্ষমা করুন, তিন দিন বাদে সব আপনাকে জানাবো।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর চার বন্ধুতে মিলে জটলা ক'রে কে কি দেখেছে সব বলাবলি ক'রলে! সকলেই বুঝতে পারলে, এ সবই ঐ কালো উপদেবতার কাজ।

সবাই প্রতিজ্ঞা করলে, যাই কেন ঘটুক না, কেউ ক্ষণেকের তরেও কৌটা হাত ছাড়া ক'রবে না।

তারপর যার যে দিকে খুসী নতুন দেশটাকে একবার ঘুরে দেখবার জন্যে এদিক-সেদিক বেরিয়ে পড়ল! সন্ধ্যে বেলা আবার চারবন্ধু এসে লোহপুরীতে হাজির। আগের রাত্তিরের মতো তিন বন্ধু শু'য়ে পড়ল—আর রাজপুত্র পাহারায় বস্‌ল।

অনেকক্ষণ বসে আছে হঠাৎ রাজপুত্র দেখতে পেলো—ঘর যেন একেবারে আলো হয়ে উঠল। আর সেই আলোর ভেতর ধীরে ধীরে ফুটে উঠল—শিব আর দুর্গার মূর্ত্তি!

শিব-দুর্গা তাকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন,—বাছা, তোমার কাজে আমরা খুব খুসী হ'য়েছি। তাই তোমার মতো ভক্তকে আর দেখা না দিয়ে থাকতে পার্‌লুম না, ছুটে আমরা তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাদের কাছ থেকে বর নাও।

রাজপুত্র তাঁদের ভক্তিভরে প্রণাম করে বল্লে,—দয়া ক'রে আপনারা যখন আমায় দেখা দিতে এসেছেন—তখন পূজো না নিয়ে যেতে দেবো না।

সাধু-সন্ন্যাসীরা জন্ম জন্ম তপস্যা ক'রেও যাঁর দেখা পান না—তাঁকে পেয়ে অম্‌নি কি ছেড়ে দিতে পারি?

যখন এসেছেন—দয়া ক'রে একটু দাঁড়ান, আমি বেলপাতা আর জল নিয়ে আসি। জানি ওতেই আপনারা খুসী হবেন।

রাজপুত্র বেলপাতা আর জল নিয়ে ফিরে আস্‌তেই শিব-দুর্গা

বল্লেন, তোমার ভক্তি দেখে আরো খুসী হ'লেম। কিন্তু তোমার কোমরে বাঁধা ওটা কি?

রাজপুত্র বল্লে, ও একটা হাড়ের কৌটো।

তখন দুর্গা বল্লেন, বাছা ঐ অশুচি মরার হাড়গুলো নিয়ে পূজো করলে—ও জল তো আমরা নিতে পারবো না। ও কৌটোটি তুমি নামিয়ে রাখ।

রাজপুত্র হাত জোড় ক'রে বল্লে, ও আদেশ ক'রবেন না মা। আমি কিছুতেই ওটি হাতছাড়া ক'রতে পারবো না।

শিব-দুর্গা বল্লেন, তা হ'লে তো বাছা—তোমার পূজা আমরা নিতে পারবো না।

রাজপুত্র উত্তর দিলে, আমায় যদি ভক্ত ব'লেই জেনে থাকেন, তবে পূজো আমার নিতেই হবে।—এই ব'লে সে যেই তাঁদের পূজো করতে যাবে, অমনি দেখে শিব-দুর্গা হঠাৎ আকাশে মিলিয়ে গেলেন।

রাজপুত্র উপদেবতার ছলনা দেখে তো অবাক্!

এদিকে এক প্রহর রাত শেষ হ'তে রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রকে জাগিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো।

মন্ত্রীপুত্র বসে আছে। হঠাৎ তার মাথার ওপর দৈববাণী হ'ল—বাছা, মরার হাড়গুলো ফেলে দাও। নৈলে তোমার বাবার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।

মন্ত্রীপুত্র ওপর দিকে চেয়ে দেখে, মাথার ওপর খানিকটা যায়গা আলোয় আলোময় হ'য়ে গেছে। আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে মা কালী লক্‌লক্ জিহ্বা বে'র করে বলছেন—হাড়গুলো ফেলে দে!

মন্ত্রীপুত্রের বাবা ছিলেন গোঁড়া কালী-ভক্ত। মন্ত্রীপুত্র কালীকে

গড় করে বল্লে,—মা, আমি কিছুতেই আপনার কথা রাখতে পারবো না ; আমায় ক্ষমা করুন।

মা কালী চোখ লাল করে বল্লেন, কী আমার কথা রাখবিনে ?

মন্ত্রীপুত্র বল্লে, না মা, তা কিছুতেই পারবো না—এই ব'লে ওপর দিকে চাইতেই দেখতে পেলে কালী অদৃশ্য হ'য়ে গেছেন !

মন্ত্রীপুত্র উপদেবতার চালাকী দেখে একটু মুচ্‌কি হাস্‌লে।

এদিকে দ্বিতীয় প্রহরও শেষ হ'ল, মন্ত্রীপুত্র সেনাপতিপুত্রকে ডেকে দিয়ে শু'য়ে পড়ল।

খানিক বাদে সেনাপতিপুত্র দেখতে পেলে, একটা বুড়ো আর একটা বুড়ী লাঠি ভর দিয়ে তাদের ঘরে ঢুক্‌লো।

সেনাপতিপুত্র শুধোলে, আপনারা কে ?

বুড়ো হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল, এখন তো আমাদের চিন্‌তেই পার্‌বিনে ! আমরা তোর ঠাকুর্দ্দা আর ঠানদি রে।

তোর যখন বয়স এক বছর—তখন আমাদের ওপারে যাবার ডাক আসে।

সেনাপতিপুত্র বল্লে, আপনাদের কথা আমি মার কাছে সব শুনেছি। এই বলে যেই তাদের পায়ের ধূলো নিতে যাবে অমনি তারা ছু'পা পেছিয়ে গিয়ে বল্‌সে, তোর কোমরে ওটা কি রে ?

সেনাপতিপুত্র বল্লে, ও একটা হাড়ের কৌটো।

বুড়ো চেঁচিয়ে বল্লে, ওরে ছুঁস্‌নি—ছুঁস্‌নি। ঐ হাড়গুলো ফেলে দিয়ে আয়। —আহা ! কতদিন তোকে দেখিনি, আমাদের কোলে এসে বোস্ ; তোর গা-মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দি।

সেনাপতিপুত্র বল্লে, তা ক'রবার যো নাই, আমি হাড় কিছুতেই ছাড়তে পারবো না।

বুড়ী বল্লে,—বাছা কত কষ্ট ক'রে তোকে দেখতে এসেছি, একটা হাড়ের জন্যে আমাদের মায়া কাটিয়ে যাবি ?—আয়, ও গুলো ফেলে দিয়ে, আমার কাছে এসে বোস্।

সেনাপতিপুত্র উত্তরে বল্লে, সে আমি কিছুতেই পারবো না; আমার ওপর যদি স্নেহ থাকে তবে এই কৌটো নিয়েই আপনাদের প্রণাম করতে দিন্।

তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই বুড়ো-বুড়ী যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় প্রহরও শেষ হ'য়ে গেল।

সেনাপতিপুত্র গুরুপুত্রকে জাগিয়ে দিল।

গুরুপুত্র খানিকক্ষণ বসে আছে, হঠাৎ চেয়ে দেখে একটা বুড়ো বামুন, লাঠি ভর দিয়ে তাদের ঘরে ঢুক্‌লে।

বামুনকে দেখেই বোধ হয়—সে অনেক দূর থেকে আসছে। তার ছ'পা ধুলোয় ভরা। বুড়ো হাপাতে হাপাতে বললে, বড্ড পিপাসা,—আমায় একটু জল দিয়ে প্রাণ বাঁচাও। তোমায় দেখে বামুনের ছেলে বলেই ত বোধ হচ্ছে!

গুরুপুত্র বললে, আপনি একটু বসুন—আমি জল এনে দিচ্ছি।

এদিক সেদিক খুঁজে কোথাও জল না পেয়ে গুরুপুত্র ফিরে এসে বললে, কোথাও তো জল পেলুম না। দৌড়ে ঘাট থেকে জল নিয়ে আসি।

বামুন বল্‌লে, বাছা, এতক্ষণ আমি কিছুতেই থাক্‌তে পারবো না; তার চেয়ে আমায় ঘাটেই নিয়ে চল।

গুরুপুত্রের কাঁধে ভর দিয়ে বামুন ঘাটে এসে পৌঁছুল। যেই

গুরুপুত্র জল আন্‌তে যাবে—বামুন পেছু ডেকে বল্লে, বাছা, তোমার কোমরে ওটা কি ?

গুরুপুত্র বল্‌লে, হাড়ের কৌটো। বামুন বল্‌লে, ঐ অপবিত্র জিনিষটা নিয়ে জল আন্‌বে বাবা !

গুরুপুত্র পেছন ফিরে বল্‌লে, মাফ্‌ করবেন, কৌটো কিছুতেই হাত ছাড়া কর্‌তে পারবো না।

বামুন বল্‌লে, বাছা, তুমি তো বামুনের ছেলে ?—তুমিই বল দেখি ঐ হাড়-ছোঁয়া জল বুড়ো বয়সে খাই কি করে ? কৌটোটা সিড়ির ওপর রেখে জল নিয়ে এসো, এখানে নেবেই বা কে ?—উঃ—পিপাসায় প্রাণ যায় ! বুড়ো নেতিয়ে পড়ল।

গুরুপুত্র ভাবলে, তাইতো, বুড়ো মানুষ, জল না খেয়ে মারা যাবে? এই ভেবে সিড়ির ওপর কৌটোটি রেখে যেমনি জলে নেমেছে—অমনি পেছন থেকে খন্‌খনে গলায় একটা বিকট হাসির আওয়াজ কানে এলো।

ফিরে চেয়ে দেখে—আকাশের মত উঁচু একটা মস্ত বড় দৈত্য তার কৌটোটি নিয়ে পালাচ্ছে। দেখে তার শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল। তিন বন্ধু সমস্ত রাত জেগে তার ভরসায় কৌটোটি ছেড়ে দিয়েছে—আর সেটি চুরি যাবে তার কাছ থেকেই !

গুরুপুত্র মরিয়া হয়ে তার পেছনে ছুট্‌লো।

খানিক দূরে গিয়ে দৈত্যটা বনে ঢুক্‌লো—কাঁটায় গুরুপুত্রের গা-পা সব কেটে গেল ; দরদর করে রক্ত বেরুতে লাগলো। কিন্তু কিছুর দিকেই তার নজর নেই। গুরুপুত্র ছুটেছে একেবারে মরিয়া হ'য়ে। প্রাণ দেবে তাও ভাল, তবু ওর পেছু ছাড়বে না—নৈলে কাল সকালে বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাবে কি করে ?

দৌড়ুতে দৌড়ুতে তারা বনের মাঝে একটা ফাঁকা যায়গায় এসে পৌঁছল। সেখানে মস্তবড় একটা পাথর পড়ে ছিল। দৈত্যটা দু'হাত দিয়ে সেই পাথরটাকে সরিয়ে ফেললে। গুরুপুত্র অবাক হ'য়ে দেখলে, তার ভেতর মস্ত বড় একটা সুড়ঙ্গ।

দৈত্যটা সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমে গেল। গুরুপুত্রও তার পেছু পেছু সুড়ঙ্গের পথ ধ'রলে। নেমে খানিকটা খুব অন্ধকার। কিছুদূর গিয়েই দেখতে পেলে মস্ত বড় একটা কামরা—

একেবারে আলোয় আলোময়।

গুরুপুত্র অবাক হয়ে দেখলে অনেক রাজার বাড়ীও এমন সুন্দর নয়।

কাম্‌রার মাঝখানে শ্বেত পাথরের একটি ছোট্ট চৌকী।

গুরুপুত্র গিয়ে একটি থামের পেছনে দাঁড়ালো।

দৈত্যটা পৌঁছুতেই কামরায় আনন্দের একটা ঢেউ ব'য়ে গেল। চারদিক থেকে সব ডানাওয়ালা পরীরা এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলেই বল্‌তে লাগলো, কৈ এনেছ ?—আমায় দাও—আমায় দাও।

তার ভেতর যে মেয়েটি সুন্দরীর সেরা, কৌটোটি তার হাতে দিয়ে দৈত্যটা কুর্ণিশ করলে। মেয়েটি কৌটো খুলে, হাড়গুলো ঘরের মাঝখানে-পাতা শ্বেত-পাথরের চৌকীর উপর ছড়িয়ে দিলে। তারপর ঘরের কোন্ থেকে একটা লম্বা লাঠি এনে হাড়গুলো দপাদপ্ পিট্‌তে লাগলো।

লাঠি দেখেই তো গুরুপুত্র চিন্‌তে পারলে—পাহারা দেবার প্রথম রাত্রে দৈত্য-দানবের হাতে এটা সে দেখেছিল।

আস্তে আস্তে হাড়গুলো এক সঙ্গে জুড়ে গিয়ে একটা নরকঙ্কাল হ'য়ে উঠল।

গুরুপুত্র একেবারে থ' মেরে গেল।

তারপর আস্তে আস্তে মাংস জুড়ে গিয়ে দিব্যি এক রাজপুত্রের চেহারা হয়ে উঠল। এমন সুন্দর চেহারা গুরুপুত্রের চোখে কখনো পড়েনি।

আর একবার মারতেই রাজপুত্র উঠে বসলে।

তখন সেখানে এক আনন্দের হাট বসে গেল।

পরী:দের গানে গানে ঘর ভরে গেল। তারা বল্লে, তুমি কবে আমাদের হ'বে ?

রাজপুত্র উত্তরে বল্লেন, আমি তো তোমাদেরই ! তোমরা আমায় আন্‌তে পার না—তা আমি কি ক'রবো বল ?

আমোদ আহ্লাদ শেষ হবার পর আবার সেই মেয়েটি এসে লাঠিটা উল্টো করে নিয়ে রাজপুত্রের গায় ছোঁয়ালে। রাজপুত্র অম্‌নি অচেতন হয়ে পড়ে গেল।

তারপর পিট্‌তে পিট্‌তে শেষে হাড় ক' খানা বাকী রইল।

হাড়গুলো কৌটোয় পুরে পরীরা পাশের ঘরে চলে গেল।

গুরুপুত্র এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল।—যেম্‌নি ওদের যাওয়া—বাজ পাখীর মত ছোঁ মেরে কৌটো আর লাঠিটা নিয়ে এক ছুটে সে গুহার বাইরে চলে এলো।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে যখন সে এসে লোহপুরীতে পৌঁছল—তখন ফর্সা হ'য়ে গেছে।

চার বন্ধুতে তখন বাসায় ফিরে এলো।

দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর, চার বন্ধু ঠিক করলে—আজ শেষ দিন,—খুব কড়া পাহারার দরকার। সকলকেই খুব সাবধান হ'য়ে রাত জাগতে হবে।

তাই সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই চার বন্ধু লৌহপুরীতে এসে হাজির হ'ল।

আগের দু'দিনের মত রাজপুত্র পাহারায় বস্‌ল—আর তিন বন্ধু বিছানা করে শুয়ে পড়ল।

রাজপুত্র বসে আছে—কিছুক্ষণ যায়—হঠাৎ যেন মনে হ'ল তার চার দিক্ দিয়ে কে একজন ঘুরছে।

তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠতেই প্রথম রাতের সেই কালো মূর্ত্তিটা হুড়-মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাজপুত্র হাতের তলোয়ার বাগিয়ে ধরে স্থির হ'য়ে বসে রইল।

প্রথম প্রহর শেষ হ'তে রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রকে ডেকে দিয়ে শুয়ে পড়ল ; মন্ত্রীপুত্র উঠে পাহারায় বস্‌ল।

খানিক বাদে মন্ত্রীপুত্রের ভয়ানক ঘুম পেতে লাগলো। হঠাৎ খুট্ করে একটা শব্দ শুনে উঠে দেখে—লাঠি নেই।

দেখেই সে চম্‌কে উঠল। গুরুপুত্রের এটি আন্‌তে বেগ পেতে হয়েছে কত! আর তার অবহেলায়ই সেটি হারিয়ে গেল!

মন্ত্রীপুত্র ভারী মুস্‌ড়ে গেল।

খানিক পরে দ্বিতীয় প্রহর শেষ হ'তে মন্ত্রীপুত্র সেনাপতিপুত্রকে জাগিয়ে বল্লে, ভাই লাঠিটি চুরি গেছে!

সেনাপতিপুত্র শুনে বল্‌লে—অ্যাঁ, বল কি? ছিঃ, গুরুপুত্র এত করে লাঠিটি নিয়ে এলো—আর তা তুমি হারিয়ে ফেল্লে?

মন্ত্রীপুত্র মুখ নীচু করলে।

সেনাপতিপুত্র বললে, যাক্ যা হবার তা তো হয়েছে; আচ্ছা তুমি শোও গে—আমি দেখছি।

সেনাপতিপুত্র বসে আছে—হঠাৎ তার সাম্‌নে একটি পরমা সুন্দরী পরী এসে বল্লে, দেখুন আপনাদের অনেক করে ঠকাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই পারিনি।

এখন আপনাকে সব সত্যি কথা খুলে বলছি। ঐ রাজপুত্র ছিলেন—আমার আগের জন্মের স্বামী। দেবতার শাপে এদেশের রাজার ছেলে হয়ে জন্ম নিয়েছেন।

আমি আর আমার সব সখীরা রাজকুমারকে আমাদের প্রাণের চাইতেও ভালবাসি; কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে থাক্‌তে পারি না। তাই আপনাদের কৌটো মাঝে মাঝে চুরি করে নিয়ে যেতাম—তাঁকে দেখতে।

আমাদের বড় আশা ছিল—আজও তাঁকে নিয়ে যাবো ঠিক তেম্‌নি করেই। আজ নিতে পারলেই আপনারা তাঁকে আর ফেরাতে পারতেন না। কিন্তু আমাদের সে আশায় ছাই পড়েছে! এখন যদি আপনি একবার দয়া করেন তো ওঁকে বাঁচিয়ে জন্মের শোধ বিদায় নিয়ে যাই।

সেনাপতিপুত্র বল্লে, আগে আমাদের লাঠিটা ফিরিয়ে দিন; তবে অন্য কথার জবাব দেবো।

পরী-কন্যা বল্লে, আচ্ছা।—বলে লাঠি আন্‌তে চলে গেল।

এর ভেতর সেনাপতিপুত্রের পালা শেষ হয়ে গেল। সে গুরু-পুত্রকে জাগিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

গুরুপুত্র বসে রইল, খানিক বাদে সেই পরীটি এসে হাজির

হ'ল। গুরুপুত্র তো দেখেই চিনতে পারলে—এ সেই গুহায় পরীকন্যা যার কাছে দৈত্যটা কৌটো দিয়েছিল।

পরীটি সেনাপতি পুত্রকে যেমনটি বলেছিল—একেও তেম্‌নি তার মিনতি জানালে।

গুরুপুত্র বল্লে, আমি রাজপুত্রকে বাঁচাবার অনুমতি দিতে পারি—কিন্তু আমার কতকগুলি সর্ত্ত আছে।

পরীটি বল্লে, বলুন।

গুরুপুত্র বল্লে, আমার প্রথম কথা এই যে, শ্বেত পাথরের চৌকীখানা এইখানে এনে ওঁকে বাঁচাতে হবে। দ্বিতীয় কথা বিদায় নিয়ে ফিরে যাবার সময় চৌকী আর লাঠিটা রেখে যেতে হবে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পরী বল্লে, তা ছাড়া যখন তাকে দেখ্‌বার আর কোন উপায় নেই—তখন ওতেই রাজী হলুম।

*　　*　　*　　*

কিছু সময় পরেই সেই চৌকীখানা এসে ঘরে হাজির হ'ল ; আর গান গাইতে গাইতে দলে দলে সব পরীরা এলো।

পরীকন্যা এসে ঠিক আগেকার মত রাজকুমারকে বাঁচিয়ে তুল্‌লো, তারপর কতক্ষণ খুব আমোদ আহ্লাদ গানবাজ্‌না চল্‌লো।

শেষকালে বিদায়ের পালা। রাজকুমারের হাড়গুলো কৌটোয় পুরে যখন পরীরা সব ধীরে ধীরে চলে গেল—তখন ফর্সা হবার আর বেশী বাকী নেই।

গুরুপুত্র দেখ্‌লে—চৌকী আর লাঠি ঠিকই আছে।

পরদিন সকাল বেলা চারবন্ধু রাজাকে বল্লে, মহারাজ আজ এক বিরাট সভার আয়োজন করুন। আমরা আজকে সব খুলে বল্‌ব।

রাজা তাদের হাত চেপে ধরে বল্‌লেন, হাড়গুলো আবার ফিরে পাবো তো? বল—কি চাও, রাজভাণ্ডার খুলে সব তোমাদের পায়ে ঢেলে দেবো।

রাজপুত্র বল্‌লে, মহারাজ, ব্যস্ত হবেন না। সভায় বসেই সব জান্‌তে পার্‌বেন। আপনি শুধু রাজ্যের গ্রামে-গ্রামে ঘোষণা ক'রে দিন্ আজ রাজপুরীতে অসাধ্য-সাধনের সভা হবে। সকলকার আসা চাই।

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে গ্রামে গ্রামে সভার কথা ঘোষণা ক'রে দিতে আদেশ দিলেন।

মন্ত্রীর আদেশে রাজপুরীর সব ঢ্যাঁড়া-ওয়ালা গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই কথা বলে বাজাতে লাগলো,—আজ—রাজপুরীতে অসাধ্য সাধন হবে—সকলে যাবে—সভা বস্‌বে ঠিক সন্ধ্যার সময়—ঢ্যাং—ঢ্যাং—ঢ্যাং—

ঠিক সন্ধ্যার সময় রাজার সান্ধ্য-সম্মিলনী বস্‌ল। রাজ্য ভেঙে লোক এসে সভায় জুট্‌ল।

শ্বেত পাথরের চৌকী, লাঠি আর হাড়ের কৌটোটি নিয়ে ঠিক সময় চার বন্ধু এসে সভায় হাজির হ'ল।

চারিদিকে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল।

প্রথম রাজপুত্রের পালা। সে পর পর তিন রাত্রে কি কি দেখলে সব খুলে বল্‌লো। তারপর মন্ত্রীপুত্র, তারপর সেনাপতিপুত্র, সব শেষে গুরুপুত্র তার কথা বল্‌তে উঠে দাঁড়াল।

তার কথা যখন শেষ হ'য়ে এলো তখন সে ঠিক পরীকন্যার মত কৌটো থেকে হাড়গুলো বের করে—চৌকির ওপর ছড়িয়ে, লাঠি দিয়ে দমাদ্দম পিট্‌তে লাগলো।

ক্রমে ক্রমে হাড় থেকে মাংস—না, তারপর রাজকুমার একেবারে উঠে বস্‌লেন।

সভার সকলে আনন্দে চীৎকার করে উঠল।

রাজকুমার গিয়ে রাজার পায়ের ধূলো নিলেন। রাজা দু'হাতে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেল্‌তে লাগলেন।

তারপর চারবন্ধুর দিকে ফিরে বল্লেন, তোমরা যে আমার কি উপকার করেছ—তা' আমি বলে উঠতে পাচ্ছিনে—তোমরা কি চাও বল ?

তারা বল্লে মহারাজ, চাইনে আমরা কিছুই। শুধু আমাদের কাজের সাক্ষ্য দেবার জন্যে—আপনার হাতের আংটিটি চাই। রাজা তক্ষুনি আংটি খুলে তাদের দিয়ে বল্‌লেন, এ'টি দেখিয়ে তোমরা আমার রাজ্যের যাকে যা করতে বল্‌বে—মাথা নুইয়ে সে তাই ক'রবে।

রাজপুত্র বল্লে, মহারাজ, আমাদের আর কিছুরই দরকার নেই, এখানকার কাজ আমাদের ফুরোলো। এখন আমরা বেরুবো অন্য কাজের খোঁজে।

রাজা বল্লে, সে কি ? আমার রাজপুরীকে পরীর-দৃষ্টি থেকে বাঁচালে তোমরাই ! তোমরা আমার এখানেই থাকো। যখন যা চাইবে—আমি দেবো।

কিন্তু তারা কিছুতেই রাজী হ'ল না !

রাজাকে নমস্কার জানিয়ে তারা ভিন্ দেশের উদ্দেশে যাত্রা করলে।

বিদেশী রূপকথা

মিশরের উপকথা

মিশরের রাজাদের নাম ছিল ফ্যারাও।

একদিন ফ্যারাও খুফু তার ছেলেদের নিয়ে রাজপ্রাসাদের বারান্দায় বসে গল্প করছিলেন।

'দ্বিতীয় রাজকুমার হোরদাদেফ কথায় কথায় তাঁকে বল্লে, মহারাজ, আপনি ত সেদিন এক যাদুকরের অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার দেখেছিলেন, কিন্তু আমি তার চাইতেও এক ক্ষমতাশালী যাদুকরের খোঁজ জানি—যিনি মানুষের মাথা কেটে ফেলে আবার তাকে জোড়া লাগাতে পারেন। আর শুধু তাই নয়, তিনি ভগবান থোতের

বাসস্থান কোথায়, তাও জানেন। আপনি যদি সত্যি তা জানতে পারেন, তাহলে তার কাছ থেকে পিরামিডের জন্যে নক্সা পাওয়াও খুব শক্ত হবে না। রাজা খুফু খুব খুসী হোয়ে বল্‌লেন, বেশ, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। পিতার অনুমতি পেয়ে হোরদাদেফ সেই বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিকের খোঁজে নীল নদের বুকে নৌকা ভাসিয়ে দিলেন।

মিশরের এই বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিকের নাম দেদী। একশ দশ বছর তার বয়স। কিন্তু বুড়ো থুত্থুড়ে হলে হবে কি? ঐ বয়সেও সে একটা ষাঁড়ের অনেকটা একাই খেয়ে ফেলতে পারে—আর শুধু তাই নয়—তার সঙ্গে চাই পাঁচশ রুটি আর একশ গেলাস মদ। এমনিই তার খাওয়ার ঘটা।

রাজকুমারের নৌকা গিয়ে যেখানে যাদুকরের বাস, সেই দেদ সেফ্রু সহরে নোঙর করলে।

রাজপুত্র যখন গিয়ে তার দোর গোড়ায় পৌঁছুলো, যাদুকর তখন দরজার কাছে শুয়ে খুব ঘুমুচ্ছিলো। ঘুম ভাঙতে রাজকুমারকে দেখে উঠতে যাবে এমন সময় সে বল্লে, মিশরের ফ্যারাও আপনাকে উপযুক্ত সম্মানে অভ্যর্থনা করবেন; আমি সেইজন্যই আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

যাদুকর খুসী হোয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লে, তোমার পিতার মঙ্গল হোক।

যাদুকরকে নিয়ে দেশে ফিরে এসে রাজকুমার পিতাকে তার সংবাদ দিতেই তিনি খুসী হয়ে বল্লেন, তুমি এক্ষুনি তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

রাজাকে অভিবাদন করে বুড়ো যাদুকর তার সাম্‌নে এসে

দাঁড়ালো। রাজা বল্লেন, কৈ, এর আগে তো তোমাকে আর কখনো দেখিনি ?

যাদুকর বল্লে, আপনি খবর পাঠিয়েছেন—আর আমিও এসে হাজির হোয়েছি।

রাজা বল্লেন, তুমি নাকি মানুষের মাথা কেটে ফেলে আবার জোড়া লাগাতে পারো, সত্যি ?

যাদুকর মাথা নুইয়ে বল্লে, সত্যি মহারাজ।

রাজা তক্ষুনি একজন বন্দীকে সেইখানে আনতে আদেশ দিলেন। যাদুকর বল্লে, বিনা প্রয়োজনে কেন মিছামিছি মানুষকে নিয়ে টানাটানি, মহারাজ ? রাজা তখন একটি হাঁস আনতে বল্লেন।

হাঁসটাকে কেটে একদিকে ফেলে রাখা হোলো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! কতকগুলো মন্ত্র উচ্চারণ করতেই দুটো আলাদা জিনিষ বেমালুম জুড়ে গেল—আর হাঁসটা ঘরের ভিতর প্যাঁক্-প্যাঁক্ করে ঘুরে বেড়াতে লাগ্ল।

এইবার নিয়ে আসা হেলো প্রকাণ্ড এক রাজহাঁস। এর বেলাতেও ঠিক তেমনি অবাক্ কাণ্ড।

তারপর এলো এক গরু। তার মাথা কাটা হল ! যাদুকরের মন্ত্রে গরু যে শুধু বেঁচে উঠল তা নয়, একেবারে তার পেছন পেছন চল্লো।

রাজা খুসী হয়ে বল্লেন, শুনতে পাই ভগবান থোতের বাসস্থানেরও সন্ধান রাখো, তাও কি সত্য ?

দেদী বল্লে, সে নক্সা অবশ্য আমার কাছে নেই, কিন্তু তা কোথায় লুকোনো আছে সে সন্ধান আমি জানি। হেলিও পেলিসের এক মন্দিরের কোন বিশেষ কক্ষে সেগুলো গুপ্ত আছে। একটা বাক্সের

ভেতর সমস্ত নক্সাগুলো রেখে দেয়া হয়েছে, কিন্তু সাধারণ লোকের ক্ষমতা নেই যে গিয়ে তা নিয়ে আসতে পারে। রাজা খুফু জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, সে নক্সা কে আন্‌তে পারে বলতো ? যাদুকর জবাব দিলে, রা নগরের প্রধান পুরোহিতের স্ত্রী রুদ দেদিৎ এর গর্ভে তিনটি ছেলে জন্মাবে। এদের মধ্যে বড় ছেলেই হবে হেলিও পে'লসের প্রধান পুরোহিত আর সেই এই নক্সাগুলো পাবে। আর শুনুন মহারাজ ! সেই তার ভাইদের নিয়ে এই বিশাল মিশর দেশ শাসন করবে।

যাদুকরের এই ভবিষ্যৎ বাণী শুনে রাজার মুখখানা মেঘ ঢাকা আকাশের মত থম্‌-থমে হয়ে উঠল।

রাজাকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে যাদুকর আবার বল্লে, কি ভাবছেন মহারাজ ? আপনার পর আপনার ছেলেই রাজা হবে। তারপর রাজা হবে আপনার নাতি। আর এই নাতির পরেই প্রধান পুরোহিতের তিন ছেলের একজন এই রাজ্যের ভার গ্রহণ কর্‌বে।

রাজা খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা, এই ছেলেরা কখন জন্মাবে তা তুমি বলতে পারো ? যাদুকর সময়টা বলে দিলে রাজা বল্লেন, আমি ঠিক সেই সময় সেই মন্দিরে হাজির থাকবো।

তারপর রাজা যাদুকরকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে তার প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিলেন। যাদুকর সেদিন দ্বিগুণ খাবার খেয়ে ফেললে।

আস্তে আস্তে পুরোহিত-পত্নীর সন্তান জন্মগ্রহণ করার দিন এগিয়ে এলো। প্রধান পুরোহিত আর তার স্ত্রী একসঙ্গে বসে দেবী আইসিস্‌ আর বোন নেপথিস্‌ এবং জন্ম-দেবতা মেস্‌থেষ্ট আর ব্যাঙের দেবতা হেট এবং সৃষ্টিকর্তা ক্নুমুর কাছে প্রার্থনা কর্‌লেন।

তারা স্বামী-স্ত্রীতে প্রার্থনা করলেন—ওগো দেবতারা, তোমরা আমার ছেলে তিনটিকে দেখো। এরাই ভবিষ্যতে সমস্ত মিশর দেশের রাজা হবে।

দেবতারা তাদের প্রার্থনা শুনে খুব খুসী হলেন এবং নর্ত্তকীর বেশে পৃথিবীতে নেমে এলেন। আর তাদের সঙ্গে পেছনে এলেন সৃষ্টিদেবতা ক্ষুমু—সকলকার জিনিষ পত্তর নিয়ে।

প্রধান পুরোহিতে গৃহদ্বারের সম্মুখে এসে তাঁরা সকলে মিলে নৃত্যের এক তরঙ্গ তুললেন।

পুরোহিত এসে তাদের গৃহে প্রবেশ করতে অনুরোধ করলেন। দেবতারা সকলে মিলে চুপি চুপি পুরোহিত পত্নীর ঘরে লুকিয়ে রইলেন।

প্রথম ছেলে জন্মালে দেবী আইসিস তার নাম দিলেন উসার কফ, দেবী মেস্থেন্ট ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—এই হবে মিসরের সম্রাট। সৃষ্টি দেবতা বর দিলেন, তুমি বীর হবে।

দ্বিতীয় পুত্রের নাম হলো সাহুরা। দেবতারাও আগের মত তাকে বর দিলেন। তৃতীয় পুত্রের বেলাতেও তাই। নাম হল তার কাকা। তারপর দেবতারা বিদায় নিয়ে ফিরে চল্লেন।

পুরোহিত তাদের এক বস্তা বার্লি উপঢৌকন দিলে সৃষ্টি-দেবতা ক্ষুমু তা' কাধে তুলে নিলেন।

ফির্তি মুখে দেবী আইসিস্ বল্লেন,—দেখো, একটা অলৌকিক কাণ্ড কিছু করা যাক, তাহলে পুরোহিত বুঝতে পার্বে সত্যি সত্যি আমরা কে আর কেনই বা এসেছিলাম।

তারা করলেন কি, চুপি চুপি বার্লির বস্তার ভেতর একটা রাজ-মুকুট লুকিয়ে রাখলেন! তারপর ভীষণ ঝড়ের সৃষ্টি করে পুরোহিতের

বাড়ী ফিরে গিয়ে বল্লেন, আজকের এই দুর্য্যোগে এটা আপনার এখানেই রেখে যাই—দিন পনের পরে এসে আবার নিয়ে যাব। পুরোহিত বস্তা তাঁর ভাণ্ডারে তুলে রাখলেন। এর দিন কয়েক বাদে পুরোহিত পত্নী দাসীকে ডেকে বল্লে, যা'তো ভাণ্ডার থেকে বার্লি বের করে নিয়ে আয়. মদ তৈরী করতে হবে। দাসী ফিরে এসে বল্লে সেই নাচ্‌নীওয়ালীদের বস্তা ছাড়া আর বার্লি ত নেই মা! পুরোহিত পত্নী বল্লে, আচ্ছা, তাই নিয়ে আয়।

দাসী যখন গিয়ে আবার ঘরে ঢুকলো—হঠাৎ কোত্থেকে নাচ গানের শব্দ তার কানে ভেসে এলো। সে অবাক হয়ে ছুটে গিয়ে তার প্রভু পত্নীকে খবর দিলে।

পুরোহিত পত্নী প্রথমটা ধরতে পারলে না কোত্থেকে গান বেরুচ্ছে। তারপর বালির থলিতেই কান রাখতে সব জানা গেল। সে তাড়াতাড়ি থলিটা একটা সিন্দুকে ভর্ত্তি করে স্বামীকে খবর দিলে। তারপর দুজনের আনন্দ দেখে কে?

দাসীটা একদিন পুরোহিতের স্ত্রীর খুব বকুনি খেয়ে এদের ছেলে যে রাজা হবে সে কথা বলবার জন্যে তার মামা বাড়ী চলে গেল এবং তার মামাকে সব কথা খুলে বল্লে।

কিন্তু তার মামা এই সব কথা শুনে তার ওপর ভয়ানক চটে গিয়ে তাকে নদীতে জল আন্‌তে পাঠিয়ে দিলে। নদীতে ছিল কুমীর, মেয়েটাকে সে ভুস্ করে ডুবিয়ে নিয়ে কোথায় তলিয়ে গেল! দাসীটার মামা তখন পুরোহিতের বাড়ী গিয়ে দেখে,—পুরোহিতের পত্নী বসে বসে কাঁদ্‌ছে। সে বল্লে, ঠাকরুণ, আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন?

পুরোহিত পত্নী বল্লে, আমার ছেলে রাজা হবে, আমার দাসী

সেই খবর রাজাকে বলে দিতে গেছে। লোকটা বল্লে, ঠাকরুণ,—আপনি দুঃখ করবেন না। আমায় গিয়ে সব কথা বলেই সে গেল নদীতে জল আন্‌তে, সেখানে তাকে কুমীরে ধরে নিয়ে গেছে। কাজেই রাজা খুফু পুরোহিতের ছেলেদের জন্মের খবর আর পেলেন না।

যাদুকরের ভবিষ্যদ্বানী সার্থক হল। কালক্রমে তারাই হলো মিশরের একচ্ছত্র সম্রাট। *

* এই গল্পটির বয়স প্রায় সাত হাজার বৎসর।

করুণ কাহিনী

স্বপ্ন

গরীবের ছেলের নাম মহারাজ কি করে হ'ল তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু যে করেই হোক ব্যাপারটা হয়েছিল বাঁশ পাপতা গ্রামে। গরীবদাস যখন হঠাৎ একদিনের জ্বরে মারা গেল, মহারাজের বয়স তখন সবে মাত্র তিন বছর। একদিন বাপ ভবিষ্যতের খুব একটা বড় স্বপ্ন দেখে হয়ত ছেলের ঐ নাম রেখেছিল, কিন্তু বাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা প্রকাণ্ড একটা ঠাট্টার মত শোনাতে লাগল!

গরীবদাস সামান্য মাইনেতে গ্রামের মুদিখানায় খাতা লিখত।

এ ছাড়া অল্প বিস্তর জমিজমাও কিছু ছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে যে সেগুলি জ্ঞাতিদের হাতে চলে গেল মহারাজের মায়ের কাছে তা' একটি রহস্যজনক ঘটনা।

সেই থেকে মহারাজের মা পাড়ায় পাড়ায় চিড়ে কুটে, ধান ভেনে ছেলেকে মানুষ করে এসেছে, এতটুকু লজ্জা করেনি। কেননা তার ধারণা মহারাজ একদিন বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে উপার্জ্জন করবে এবং মায়ের সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

এতদিন ছিল লালন-পালনের সময়। কিন্তু এইবার মহারাজ ছয় পেরিয়ে সাতে পড়ল। এখন থেকে লেখাপড়া শেখা সুরু না হলে ও মানুষ হবে কি করে? বুকে ক'রে মানুষ করতে পারে মা—দেহের রক্ত জল করে; কিন্তু শিক্ষার ব্যবস্থা করা অনাথা বিধবার পক্ষে কি করে সম্ভব?

একদিন সাত-পাঁচ ভেবে কিছু শালি ধানের চিঁড়ে আঁচলে বেঁধে মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে তার মা গাঁয়ের পাঠশালায় গিয়ে হাজির হ'ল। তারপর চিঁড়ে কটি পণ্ডিতমশাইয়ের পায়ের কাছে রেখে বললে, আমার বাছাকে আপনার লেখাপড়া শেখাতেই হবে।

আড়চোখে একবার চিঁড়েগুলোর দিকে তাকিয়ে পণ্ডিতমশাই বললেন, বড্ড শক্ত কথা গরীবদাসের বৌ; লেখাপড়া শিখতে হ'লে অমনি ত' চলবে না, টাকা পয়সা খরচ করতে হবে।

মহারাজের মা মনে করেছিল, তাদের কষ্টের কথা পণ্ডিতমশাই ত সবই জানেন, একবার বললে, এই অনাথার ছেলেটিকে মানুষ করে তুলতে তিনি রাজী হবেন। কিন্তু তাঁর মুখে টাকা পয়সার কথা শুনে মায়ের প্রাণটা ধড়াস্-ধড়াস্ করতে লাগল।

তা হ'লে বোধকরি কোন আশাই নেই। অপরাধীর মত সঙ্কুচিত

হ'য়ে মহারাজের মা ছেলের হাত ধরে আস্তে আস্তে পাঠশালা থেকে বেরিয়ে এল।

গ্রামের দু একটি ছেলে কলকাতায় থেকে লেখাপড়া শেখে। মহারাজের মা তাদের কাছে গিয়েও নিজের দুঃখের কথা জানালে এবং মহারাজ যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে সেজন্য সমস্ত লাজ-লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে কিছু কিছু অর্থসাহায্যও চাইলে। হাত পেতে কিছু চাওয়া গরীবদাসের স্ত্রীর এই প্রথম।

কিন্তু গরীবের মর্য্যাদা কেউ রাখলে না। সকলেই বললে, লেখাপড়া শেখানোতে অনেক খরচ-পত্র....নিত্য নূতন বই খাতা পত্তর···এসব হ্যাঙ্গামা কে পোয়াবে বল?

বাধ্য হয়ে মহারাজের মাকে আবার শুক্‌নো মুখে ফিরতে হ'ল। ইতিমধ্যে মহারাজ পাড়ার বৈরাগীদের আখড়ায় গিয়ে বোষ্টম বাবাজীদের সঙ্গে হাত তালি দিয়ে কীর্ত্তন গাইতে সুরু করে দিল। গলাটি ছিল ভারী মিষ্টি....অল্পদিনের ভেতরেই চমৎকার গান শিখে ফেললো। গ্রামের সবাই ডেকে ডেকে গান শোনে···কেউ খুসী হয়ে চাল দেয়, কেউ এক ফালি কুমড়ো দেয়, কেউ বা ঘরের তৈরী নারকোলের নাড়ু হাতে দেয় গুঁজে।

এমনি ভাবে মায়ে-পোয়ের দিন চলে! কিন্তু মায়ের মনে এতটুকু সুখ নেই। এ ভাবে গান গেয়ে বেড়ালে ত' ছেলে মানুষ হ'বে না! তাকে লেখাপড়া শেখাবার কি ব্যবস্থা করা যায়, এই কথা ভেবে মা রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে এপাশ-ওপাশ করে। কোন দিন হয়ত ভাল ঘুমই হয় না! মুখ ফুঁটে কাউকে কিছু আর বলতেও পারে না—মনের কথা মনেই চেপে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি খেটে মরে!

মহারাজের মনে কিন্তু সেজন্যে এতটুকু দুঃখ নেই! আর মায়ের মনের কষ্ট বোঝবার মত বয়েসও তার হয় নি। গান গেয়ে সে নিজে যেমন বিশ্ব-সংসার ভুলে থাকে আর সবাইকেও তেমনি ভুলিয়ে দিতে চায়।

ক্রমে ক্রমে তার মধুর কণ্ঠের এমন নাম হয়ে গেল যে, আশপাশের গ্রাম থেকেও দলে দলে লোক এসে প্রাণভরে কীর্তন শুনে দু কান মিঠে করে চলে যেত।

একদিন বামুন পাড়ায় চিঁড়ে কুটে বিকেলের মুখে বাড়ী ফিরে মা দেখলে ঘরের দাওয়ায় একজন ভদ্রলোক মোড়া পেতে বসে আছে আর মহারাজ তাকে গান শোনাচ্ছে। তিনি তন্ময় হ'য়ে বসে হাততালি দিচ্চেন আর ক্রমাগত মাথা নাড়ছেন।

তাকে বাড়ীর ভিতর ঢুকতে দেখে মহারাজ হঠাৎ গান থামিয়ে চীৎকার করে উঠল, ঐ যে মা এসেছে। হঠাৎ রসভঙ্গ হওয়ায় ভদ্রলোকও উঠে দাঁড়ালেন। তারপর গলার চাদরের দুটো মাথা এক সঙ্গে দুই হাতে মুঠো করে নমস্কারের ভঙ্গীতে বললে, আজ্ঞে আপনার কাছেই এসেছি। অপরিচিত লোক দেখে মা মাথায় ঘোমটা টেনে আস্তে আস্তে বললে,—আপনাকে ত' আমি কখন দেখিনি—

ভদ্রলোক বিনয় করে বললে,—আজ্ঞে, দেখবার ত' কথা নয়— আমি 'শিকদার অপেরা পার্টি'র অধিকারী, আপনার ছেলেটির গান শুনে বড় খুসী হয়েছি। ও যদি পেল্লাদের পার্ট করে ত' গান গেয়ে দশ হাজার লোকের আসরকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিতে পারে। তাই ভাবছিলাম কি—

দৃঢ় কণ্ঠে মা জবাব দিলে, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন

তা বুঝতে পেরেছি কিন্তু এই দুধের ছেলেকে আমি যাত্রার দলের ছোকরা করে দিতে পারব না! দশটা বদখেয়াল হ'বে—গাঁজা-ভাঙ খেতে শিখবে—

অধিকারীমশাই প্রকাণ্ড জিভ কেটে বললেন, রামচন্দর! আমাদের সে রকম যাত্রার দলই নয়—সব ভদ্দর লোকের ছেলে! ওই ওরির মত বাচ্ছা ছেলে কত আছে। দু'বেলা ঘটি ঘটি দুধ খায়—আর কি মিঠে গলা। তাদের সঙ্গে থাকলে ওর গান আরো ভালো হবে। বিশ্বেস না হয় আপনি ছ'মাছ পরে দেখে নেবেন।

এতগুলো কথা এক সঙ্গে বলে অধিকারীমশাই হাঁফাতে লাগলেন এবং গলার চাদরটা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগলেন। কিন্তু তার কথায় মায়ের মন এতটুকুও ভিজল না। ঘোমটার আড়াল থেকে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে মা বললে, দেখুন আমি গরীব হতে পারি কিন্তু তাই বলে ছেলের ভবিষ্যৎ খোয়াতে পারব না। ওকে আমি লেখাপড়া শেখাব, মানুষ করব।

অধিকারীমশাই বুঝলেন—এ বড় শক্ত ঠাঁই। তাই আর বেশী না ঘাঁটিয়ে এক পা, দু পা করে উঠে পড়লেন। কিন্তু প্রলোভন বড় কম নয়—কেন না ছেলেটির গলা বড় ভালো। একবার শেষ চেষ্টার মত বাড়ীর সীমানা পেরুবার সময় পেছন ফিরে বললেন, আমরা ভালো মাইনে দিতাম ওকে। এখুনি ত' দশটা টাকা, খাওয়া দাওয়া আর পূজোর সময় ভালো জুতা জামা কাপড় পেত,—বছর খানেক পরে হয়ত ডবল মাইনেই হয়ে যেতে পারে!

দরিদ্র পল্লীবাসীর পক্ষে এ বড় কম প্রলোভন নয়! কিন্তু ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন কল্পনা করে মা সমস্তই উপেক্ষা করল।

বললে, আপনি অন্য ভালো ছেলের খোঁজ করুন, আমার ছেলেকে আমি কোন মতেই দিতে পারব না।

কিন্তু খোঁজ করলেই কি আর সব সময়ে ভালো ছেলে পাওয়া যায়? অধিকারীমশাই রেগে গর্-গর্ করতে করতে চলে গেলেন।

দলে ফিরে গিয়ে বললেন, দাঁড়াও না—আমি বিশ্বম্ভর অধিকারী; মাইনে দিতে চাইলাম তা ভাল লাগল না, বিনে পয়সায় ওকে নিয়ে এসে আমার দলে রাখব তবে আমার নাম—হুঁ!

ইতিমধ্যে মহারাজা আরও বড় হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে তার একটা বাতিক দাঁড়িয়ে গেছে। কানে যদি একবার এল অমুক গাঁয়ে কীর্তন কি যাত্রা হ'বে—তাকে আটকে রাখে কার সাধ্য। জল হোক, ঝড় হোক গিয়ে হাজির হবেই।

তাছাড়া তার একটা দলও জুটে গিয়েছিল। মায়ের তিরস্কার চোখের জল, মার-ধোর কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারে না।

ক্রমে এমনও দেখা গেল যে, যাত্রা দেখতে গিয়ে দু'তিন দিন সে আর বাড়িই ফিরল না! মা তখন গাঁয়ের জানা শোনা দু-একটি বৈরাগী-বোষ্টমকে পাঠিয়ে দেয় খোঁজ করতে। তারা গিয়ে দেখে ভিন গাঁয়ে অষ্ট প্রহর সঙ্কীর্ত্তনে মেতে গেছে।

বুঝিয়ে সুঝিয়ে তারা তাকে বাড়ী নিয়ে আসে তবে মায়ের মুখে অন্নজল ওঠে। মায়ের কথায় তখন হয়ত আবার কিছুদিন সে বাড়ী থেকে বেরোয় না, কিন্তু গাজনের ঢাকের শব্দে যেমন চড়ুকে পিঠ সুড়-সুড় করে, ওরও ঠিক তাই। গানের আসরের কথা শুনলে ও যেন একেবারে পাগল হয়ে যায়। না থাকে নাওয়ার জ্ঞান না থাকে খাওয়ার জ্ঞান। একেবারে যতক্ষণ গিয়ে না সেই আসরে পৌঁছুবে ততক্ষণ যেন সে আর এই পৃথিবীর কেউ না। চোখ

ছুটো অকারণে বড় বড় হয়ে ওঠে···কারুর কিছু কথা শুনতে পায় না। ডাক দিলে সাড়া নেই! যেন বহুদূরের খোলের আওয়াজের সঙ্গে মাথা নাড়তে থাকে।

ছেলের অবস্থা দেখে তখন বাধ্য হয়ে যাবার অনুমতি দিতে হয়। কিন্তু ওর যে পড়াশুনা হ'ল না—সে কথা প্রতি মুহূর্ত্তে মায়ের বুকে শেল হয়ে বিঁধতে থাকে।

হঠাৎ একবার সাতদিন ধরে মহারাজ নিখোঁজ; এত দীর্ঘদিন ধরে নিরুদ্দেশ ও কোনবারই হয় না। মা কেঁদে কেটে চোখ ফুলিয়ে ফেললে। শেষকালে কোথাকার বৈরাগীর দল খবর আন্‌লে "শিকদার যাত্রা পার্টি'র অধিকারী তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। শুনে আখ্‌ড়ার অন্যান্য বোষ্টমের দল খাপ্পা হয়ে উঠল! কীর্ত্তনের অমন দোহা যে গায় সে যাবে যাত্রার দলে? যে করেই হোক তাকে ফিরিয়ে আনতে হবেই। মা অসীম ধৈর্য্য নিয়ে দিন গুনতে লাগ্‌ল। যাই হোক শেষ পর্য্যন্ত বোষ্টমের দল তাদের কথা রাখলে।

মা ছুটে গিয়ে মহারাজকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে, আর কিছুতেই আমি তোকে ছেড়ে দেব না।

*　　*　　*　　*

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, দেশের জমিদারের ছেলে আসছেন মহাল দেখতে। চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। গাঁয়ের নায়েব পুরোনো কাছারি বাড়ী মেরামত করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল। কলাগাছ পোঁতা হল, নহবৎ উঠল, পটকা ফুটল, সামিয়ানা টাঙানো হল,—ফুলের মালা-দেবদারু

পাতা, লাল-নীল কাগজের নিশান উড়িয়ে একদিন সত্যিই ঘোড়ায় চেপে জমিদারের ছেলে গাঁয়ে হাজির হলেন।

গ্রামের সকলের আগ্রহে জমিদারের ছেলেকে আনন্দ দেবার জন্যে এক বিরাট কীর্ত্তনের আসর বসানো হয়েছে। সেই আসরে গান গেয়ে মহারাজ সবাইকে একেবারে মাতিয়ে তুলল। জমিদারের ছেলের সঙ্গে ছিলেন তারি এক বন্ধু! জমিদার নন্দন তার কানে কানে বললেন, ওহে, চমৎকার গায় তো ছোকরা ; ওকে আমাদের ড্রামাটিক ক্লাবের মর্জ্জিনা সাজালে গানে একাই মাৎ করে দেবে। বন্ধুটি তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, তা মন্দ কথা বলনি ভাই! 'ছি-ছি এত্তা জঞ্জাল' ওর মুখে যা মিষ্টি লাগবে! একটু খোঁজ নিয়ে দেখনা, তোমারই ত' জমিদারী।

জমিদারের ছেলে মাথা নাড়লেন। ইতিমধ্যে মহারাজের মা ভেবে স্থির করেছে, জমিদারের ছেলেকে গিয়ে ধরলে মহারাজের পড়ার একটা ব্যবস্থা করে দেবে। ওরা ত রাজা লোক বললেই হয়, একটা গরীব প্রজার ছেলের পড়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন না?

তাই পরদিন দুর্গা নাম স্মরণ করে মা ছেলের হাত ধরে জমিদার বাড়ীর কাছারিতে হাজির হ'ল।

জমিদারের ছেলে তখন বন্ধুর সঙ্গে বসে চা পান করছিলেন।

ছেলে নিয়ে গরীবদাসের বৌকে জমিদারের কাছে এগুতে দেখে নায়েব হুঙ্কার দিয়ে বললেন, হুজুরের কাছে যেতে হলে যে নজর দিতে হয় সে জ্ঞান কি তোদের নেই?

জমিদারের ছেলে আর তাঁর বন্ধুটি মহারাজকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন, তাই নায়েবকে থামিয়ে দিয়ে ওর মাকে জিজ্ঞেস্ করলেন, এ ছেলেটি কি তোমার?

মা মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ কর্ত্তা, আপনারই প্রজা! ওর বাপ বেঁচে নেই। আপনি রাজা লোক, দয়া করে ওর লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থা করে দিন। জমিদারের ছেলে একবার বন্ধুর দিকে তাকালেন। তার পর মাথা নেড়ে বললেন, বেশ! ও আমার সঙ্গে চলুক—আমার বাড়ীতে থেকেই লেখাপড়া শিখবে। মহারাজের মা যেন স্বর্গ হাতে খুঁজে পেল! জমিদারের ছেলের পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, আপনি গরীবের মা-বাপ, ভগবান আপনাকে রাজ-রাজেশ্বর করবেন।

পরদিনই মহারাজ জমিদারের সঙ্গে সহরে চলে গেল।

গ্রামস্থ লোক গরীবদাসের স্ত্রীর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে বললে, হ্যাঁ, এ্যাদ্দিনে ছোকরার একটা হিল্লে হ'ল বটে!

মহারাজ সহরে জমিদার বাড়ীতে এসে একেবারে হক্‌চকিয়ে গেল। বনের ফুল গাছকে উপড়ে এনে টবের শুক্‌নো মাটিতে পুঁতে দিলে যে অবস্থা হয়—এ যেন ঠিক তাই!

ওঠা, বসা, খাওয়া-দাওয়া সব ঘড়ি ধরে! একটু জোরে কথা বলবার যো নেই! কীর্ত্তনের তান দিলে ত' সাত সাতটা দারোয়ান ছুটে আসবে!

কোথায় বা রইল কাজল দীঘির জল, মাঠের পাশ দিয়ে ভিন গাঁয়ে যাবার লম্বা সড়ক আর কোথায় বা রইল চাঁদনী রাতে কীর্ত্তন গেয়ে রাত ভোর করা। জমিদারের ছেলেকে একলা পেয়ে সে পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বললেন শিগ্‌গিরই তাদের ক্লাবে আলিবাবা প্লে হবে, সেখানে তাকে মর্জ্জিনা সাজতে হবে, পড়াশুনার কথা তারপরে।

অবশেষে তাকে সঁপে দেওয়া হল গানের মাস্টারের হাতে—দু'

বেলা তাকে "ছি ছি এত্তা জঞ্জাল" শেখায় আর বেতের আগায় ওঠায় বসায়।

সেদিন গানের মাষ্টার হুম্‌কি দিয়ে বললেন, আরে, গাঁজা না খেলে কি গলা খোলে? আজ থেকে একটু একটু করে গাঁজা খাবি বুঝ্‌লি?

আসল কথা হচ্ছে এই যে, মাস্টার মশায়ের গাঁজা সেজে দেবার লোকের অভাব হয়েছিল, সেই ভার আজকে পড়ল মহারাজের ওপর। সেদিন মাস্টারের পাল্লায় পড়ে খুব করে গাঁজায় দম দিয়ে মহারাজ বেহুঁস হয়ে পড়ে রইল। যাবার সময় অনেক করেও মাস্টার তাকে টেনে তুলতে না পেরে বল্লেন, থাক বেটা আজ এই ক্লাব ঘরেই পড়ে। কাল সকালে আপনিই জ্ঞান ফিরে আসবে। অনেক রাত্তিরে তেষ্টায় মহারাজের দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগ্‌ল। অতি কষ্টে সে আস্তে আস্তে উঠে বস্‌ল। সে কোথায়? চারদিকে ভয়ানক অন্ধকার; আবার সে মাথা ঘুরে পড়ে গেল! শুধু একবার অস্ফুট কণ্ঠে বল্লে—মাগো, একটু জল—

ঠিক সেই সময় বাঁশ-পাপ্‌তা গাঁয়ে ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে শুয়ে মহারাজের মা স্বপ্ন দেখছেন—মহারাজ লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে। তার মায়ের জন্য অনেক টাকা রোজগার করে ফিরে আসছে, তার জুড়ি গাড়ি যেন হাওয়ার ওপর দিয়ে উড়ে আসছে। হ্যাঁ, সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সেই গাড়ী এসে তার ভাঙা কুঁড়ে ঘরের সামনে দাঁড়াল, মায়ের কাণে গেল শুধু একটি ডাক—মাগো—

মায়ের ঘুম ভেঙে গেল!

বাইরে তখন শুধু একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলেছে।

পিণ্টু দিদিমার কোলে মানুষ।

পিণ্টু যখন হয়, সেই সময় তার মা মারা যায়।

দিদিমা প্রথমে খুব খানিকটা কাঁদলেন, তারপর পিণ্টুকে গাল দিয়ে বল্লেন, মাকে খেতে এসেছিস……এইবার আমাকে খা—হাড় জুড়োক আমার।

অনেকক্ষণ ধরে চোখের জল ফেলবার পর সেই দিদিমাই পিণ্টুকে আঁচলে জড়িয়ে নিয়ে মুখে চুমু খেলেন।

সেই থেকে পিণ্টু দিদিমার আঁচলের তলাতেই বড় হতে হতে আজ ইস্কুলে পড়ছে।

খুব যখন ছোটটি ছিল তখন পিণ্টুই দিদিমার কাছে নানারকম গল্প শুনত। রূপকথা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কাহিনী, আদ্যিকালের বৈদ্যিবুড়ীর কথা! শুনত আর অবাক হয়ে যেতো।

এখন কিন্তু একেবারে উল্টো ব্যাপার ঘটেছে।

ইস্কুলের বইয়েতে নানান রকম অদ্ভুত ব্যাপার পড়ে আর মাষ্টারমশায়ের কাছে শুনে এবার পিণ্টুই দিদিমাকে গল্প শোনাতে সুরু করেছে। দিদিমা অবাক হয়ে সেই সব কাহিনী শুনছে আর তাঁর ফোকলা দেঁতো মুখের হাঁ কেবলি বেড়ে যাচ্ছে! সূর্যি ঘোরে না, পৃথিবী ঘোরে,—মা বাসুকীর নড়াচড়ায় ভূমিকম্প হয় না, তার আলাদা কারণ রয়েছে—এসব কথা পিণ্টু বহু চেষ্টা করেও দিদিমাকে বোঝাতে পারে না!

দিদিমা কিন্তু নাতির বিদ্যার বহর দেখে খুব আমোদ পাচ্ছেন, অবাক হচ্ছেন, কিন্তু বিশ্বাস কিছুই করছেন না।

এমনি ভাবে দিদিমা ও নাতির দিনগুলি—কান্না আর হাসি, মান আর অভিমানের ভেতর দিয়ে বেশ এগিয়ে চল্‌ছে।

দুটি ত' মাত্র প্রাণী, তাই একজন ছাড়া আর একজনের কোনো মতেই চলে না। দিদিমা যদি কোনোদিন একটু ভাল রান্না করেন, আর পিণ্টু যদি সেইদিন তার কোনো বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী থেকে খেয়ে আসে ত' বাড়ীতে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড সুরু হয়ে যায়! কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীর এ-সব ব্যাপার একেবারে গা সহা হয়ে গেছে। তারা সবাই ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, নাতিকে দিদিমার সোহাগ জানানো হচ্ছে!

ঠিক তেমনি উল্টো ব্যাপারটিও যে না ঘটে, তা নয়। পিণ্টু হয়ত হন্তদন্ত হয়ে দিদিমার জন্য নদীর ওপার থেকে মুরারি ঘোষের খাসা দৈ কিনে এনেছে, কিন্তু বাড়ী এসে ভাঁড় সামনে করে দাঁড়াতেই দিদিমা বল্লেন, এনেছিস্ বেশ করেছিস্! তোর বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে ফলার কর, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

পিণ্টু মাথা নেড়ে জবাব দেয়, বয়ে গেছে আমার বন্ধুদের ফলার খাওয়াতে! আমি সেই নদীর ওপার থেকে বয়ে নিয়ে এলাম তোমার জন্যে।

দিদিমা এইবার ফোকলা দাঁতে ফিক্ করে হেসে ফেলেন! জবাব দেন, পাগল ছেলে! আজ যে নির্জ্জলা একাদশী রে! তোর ঐ দৈ খেয়ে আমি অনন্ত নরকে বাস করি আর কি!

এর বেশী আর কিছু বলতে হল না! পাগল ছেলে ততক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে। দুম করে এক হাঁড়ি দৈ এমন ভাবে উঠোনের

মাঝখানে ভেঙে ফেল্লে যে, গোটা পাড়ার ছেলে ছুটে এলো তামাসা দেখতে !

পরে ছেলেরা পুকুর ধারে গিয়ে জটলা করে রায় দিলে যে, এতটা বাড়াবাড়ি করা পিণ্টুর আদপেই উচিত হয় নি। দিদিমা দৈ খেলোনা বলে এক হাঁড়ি দৈ এমন করে নষ্ট করে ফেল্লি !

ফলারের কথাটা ওদের কানেও গিয়েছিল। কেউ কেউ ফোঁড়ন দিয়ে বল্লে, ভালো কথাই ত' বলেছিলেন দিদিমা ! একাদশীর দিন এতগুলো ছেলেকে ফলার করালে পুণ্যি ছাড়া পাপ হত না দিদিমার।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী ! দিদিমার ওপর পিণ্টুর রাগ সাত দিনের ভেতর পড়েনি।

কি ভাবে পিণ্টুর রাগ পড়ল সেই কথাই বল্‌ছি।

দিদিমা তো ওকে নিয়ে জ্বালাতনের একশেষ ! কেননা সেই দিন থেকে সে দিদিমার হাতের তৈরি কিচ্ছুই খাবে না। নারকেল নাড়ু না, মোয়া না, এমন কি ওর এত লোভনীয় আমের মোরব্বা অবধি না ! দু' বেলা দু' মুঠো ভাত তাও সে হতভাগা কোত্থেকে খেয়ে আসে,—আদপেই খায়, না উপোস করে থাকে,—বোঝবার যো নেই !

সেদিন সন্ধ্যের মুখে মাঠের খেলা-ধূলো শেষ করে এক হাঁটু ধূলো নিয়ে পিণ্টু হঠাৎ বাড়ীতে এসে ঢুকলো। বই নিয়ে বসবে, না বারান্দায় চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে থাকবে সেই কথা যখন বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে ভাবছিল, দিদিমা আস্তে আস্তে নাম জপের মালাটা মাথায় ঠেকিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আলগোচে পিঠের উপর একটা হাত রেখে শুধু বল্লেন, আবার বেরিয়ে

যাস্‌নি যেন! সারাদিন উড়ন-চণ্ডীর মতো ঘুরে বেড়ালে শরীরের কি ছিরি হয়—একটা আয়না এনে না হয় দেখ —

পিণ্টু বোধ করি খুব একটা শক্ত জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু দিদিমার ভারী গলা দেখে আর জলভরা চোখের দিকে চেয়ে নিজেকে সামলে নিলে।

দিদিমা বল্লেন, আয়, আমার সঙ্গে ঘরে এসে বোস, তোর মায়ের হাতের একটি জিনিষ আজ তোকে দেখাবো।

পিণ্টর বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল।

মায়ের হাতের জিনিস?

কৈ, দিদিমা ত কোনোদিন এমন কথা বলেন নি, আর সেও ত কোনোদিন তার মায়ের কথা শুন্‌তে চায়নি। সে আর তার দিদিমা এই যেন পৃথিবীর সব, এই ছিল পিণ্টুর ধারণা। মাঝখানে যে আর কেউ থাকতে পারে, অথবা না থাকলে তার জন্যে অভাব বোধ হতে পারে—একথা ওর মনে কোনদিন জাগতেই পারে নি! হয়ত দিদিমাই তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখে কোনো কথা জানবার ফুরস্থৎ দেন নি।

মন যে কখনো-সখনো একেবারে খারাপ হত না—তা নয়! যখন কোনো বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে দেখত, তার মা তাকে আদর করে কথা বলছে, বুকে টেনে নিচ্ছে, ইস্কুলের পড়ার কথা জিজ্ঞেস করছে……কি জানি কেন পিণ্টু সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না! ধোপারা কাপড় কেচে শুকোতে দেবার আগে যে ভাবে দুজনে মিলে জল নিংড়ে নেয়—পিণ্টুর মনে হত, তার মনটাকেও কেউ বা অমনি করে দুমড়ে নিংড়ে নিচ্ছে।

মনের কেমন যেন একটা অসহ্য ভাব……ও ঠিক ভালো করে প্রকাশ করতে পারে না।

না হয় মনের সে কথা লুকোনই থাকত। আজ দিদিমা নূতন করে সে কথা প্রকাশ করছেন কেন?

শান্ত সুবোধ ছেলেটির মতো পিন্টু ঘরের ভেতর গিয়ে খাটের ওপর বসলে। এককোণে একটি মাটির প্রদীপ জ্বলছে। তারই কাঁপা-কাঁপা ছায়া দেয়ালের গায়ে যেন মাথা কুটছে! সে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

দিদিমা তাঁর আঁচল থেকে চাবির গোছা খুলে নিয়ে বেছে বেছে একটা মরচে পড়া চাবি খুঁজে বের করলেন। সেইটে দিয়ে খোলা হল একটা সেকেলে তোরঙ্গ। তারই ভিতর এক কাঁথা। চমৎকার সব পদ্ম আঁকা সেই কাঁথার ওপরে। খুব সরু ছুঁচ দিয়ে সেই পদ্ম আঁকতে যে কত মাস, কত বছর লেগেছে সে কথা পিন্টুর পক্ষে ধারণা করা মুস্কিল। তবু পিন্টু বুঝতে পারলে যে পদ্মগুলির দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়।

পিন্টু এক দৃষ্টিতে কাঁথাটির দিকে তাকিয়ে আছে দেখে দিদিমা ধীরে ধীরে তার চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে বল্লেন, এই পদ্ম কাঁথা তোর মায়ের হাতের তৈরী। ওর আর কিছু আমার কাছে নেই, তাই এই কাঁথাটি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। ভয়ে কখনো বের করি না পাছে খোয়া যায়। ছেলে বেলায় আমার কাছেই সে কাঁথা তৈরী করতে শিখেছিল বিয়ের পর যখন সে শ্বশুর ঘর করতে যায় এই কাঁথাটি আমি রেখে দিই। ওর হাতের ত কিছুই আর রইল না আমার কাছে। সে কাঁথা আজও তেমনি আছে…কিন্তু তোর মা আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে!

পিণ্টু বল্লে, এই কাঁথাটি আমায় দাও না দিদিমা, আমি রাত্তিরে গায়ে দেবো।

লোকে সাপ দেখলে যেমন আঁৎকে ওঠে দিদিমা ঠিক তেমনি খাটের ওপর থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন, তুই বলিস কি হতভাগা! এই কাঁথা আ।ম তোকে দেবো? এসেই তো মাকে আগে খেয়েছিস। তার হাতের এইটুকু পদার্থ আমার কাছে রয়েছে—তা ও বুঝি তোর সহ্য হচ্ছে না? আর এ ব্যবহার করতে সুরু করলে ক'দিন? এমন জিনিস তেল চিটে ময়লা হয়ে ছিঁড়ে যাক্ তাইত তুই চাস? না বাপু, এ আমি প্রাণ থাকতে কারো হাতে তুলে দিতে পারবো না। লোকে বহুমূল্য মণি-মাণিক্য যেমন করে চোরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে, দিদিমা ঠিক তেমনি কাঁথাটি তোরঙ্গের ভেতর বন্ধ করে চাবি গোপন করে রেখে দিলেন।

পিণ্টুর মনটাও খুব ভারী হয়ে এসেছিল। তাই দিদিমার মুখ থেকে এতখানি গাল-মন্দ খেয়েও আর কোন জবাব দিলে না। শুধু মনে মনে এই কথাই বুঝলে যে, দিদিমা তার মাকে কত ভালোই না বাসত!

* * * *

এই ঘটনার অল্প কয়েক মাস পরেই এলো সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। চালের জন্যে লোকে পোকার মতো মরতে লাগল।

দিদিমার ছিল কিছু ধানী জমি। যারা চাষ করত তারা অর্দ্ধেক নিত, বাকি অর্দ্ধেক দিদিমা আর নাতির দুটি পেট কোনো রকমে চলে যেত।

ছুটি পেটে খেয়ে প্রাণ যদি বা বাঁচল কিন্তু তার পরেই এলো কাপড়ের টানাটানি। পিণ্টু ব্যাটা-ছেলে আর ছেলে মানুষ।

কাপড়ের টুক্‌রো হাফ-প্যাণ্ট, ছেড়া চট যা হোক পরে দিন কাটাতে লাগল। কিন্তু মুস্কিল হল দিদিমার।

ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে উঠল যে, ঘরের বার হতে পারেন না। পুকুরে নাইতে যাওয়ার অসুবিধে।

পিণ্টু বল্লে, তোমার ত আগেকার দিনের গয়না আছে, তাই একটা দাও আমি শহরে চলে যাই। সেখানে স্যাঁকরার কাছে গয়না বিক্রী করে একটা না একটা দোকানে যাই কাপড় মিলবেই। আমাদের পাড়াগাঁয়েই হয় ত কাপড় আসছে না। শহরের লোক ত আর তাই বলে ন্যাংটো নেই। দিদিমা আঁচলে চোখ মুছে বল্লেন, আচ্ছা, তাই না হয় যা! না খেয়ে তবু ত কোন রকমে বেঁচে আছি। না পরে জীবন রাখা আরও মুস্কিল!

একটা সাবেকী আমলের গয়না নিয়ে পিণ্টু শহরের পথে পা বাড়িয়ে দিলে।

পিণ্টু জীবনে শহর দেখেনি। যে দিকে তাকায়, শুধু মাথা আর মাথা! তাদের দেশে রাম-নবমীর মেলা, চড়কপূজোর মেলা হয় বটে কিন্তু এত লোক তাতে জমেনা। এই যে হাজারে হাজারে লোক—এর সব আসেই বা কোত্থেকে?

এদেরকে রক্তবীজের বংশ বল্লেও চলে।

অনেক খুঁজে খুঁজে একটা স্যাঁকরার দোকান বের করল পিণ্টু।

ভেতরে ঢুকে দেখে—টাকপড়া একটি বুড়ো লোক নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে কি কাজ করছে। তাকে

দোকানে ঢুকতে দেখে আড় চোখে চেয়ে শুধোলে, তোমার আবার এখানে কি চাই ?

পিন্টু জবাব দিলে, আমার দিদিমার একটি পুরোনো গয়না, তাই বিক্রী করতে এসেছি।

ছেঁড়া প্যান্ট-পরা একটি পাড়াগাঁয়ের ছেলের হাতে দামী গয়না দেখে স্যাঁকরার চোখ দুটো লোভী নেকড়ের মতো জ্বলে উঠল। বল্লে দেখি,—দেখি, কি রকম গয়না।

গয়নাটি হাতে নিয়ে আর একবার পিন্টুর দিকে আড়চোখে চেয়ে স্যাঁকরা দোকানের ভেতর চলে গেল।

পিন্টু বসে আছে ত বসেই আছে! লোকটি সেই যে ভেতরে গেল—আর তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। খানিক বাদে আর একটা মোটা সোটা লোক দোকানে ঢুকে বল্লে, এই তুই এখানে কি কচ্ছিস ? চুরি করবার মতলব বুঝি ?—

পিন্টু অবাক হয়ে বল্লে, বা—রে! আমার গয়না যে নিয়ে গেল ভেতরে! আমি টাকার জন্যে বসে আছি।

লোকটা ফ্যাক্—ফ্যাক্ করে বিশ্রী ভাবে হেসে উঠ্‌ল। পানে গোটা মুখটা ভরতি, তার ওপর সামনের দিকে দুটো দাঁত নেই। বল্লে, হ্যাঁ, গয়না বিক্রী করবার মতোই চেহারা বটে! কোত্থেকে চুরি করে এনেছিস্ বল ? নইলে এক্ষুণি পুলিশে দেবো। এই বলে মাথায় এক চাঁটি মেরে ধাক্কা দিয়ে পিন্টুকে ঘরের বার করে দিলে।

দিদিমার গয়না বিক্রী করতে এসে সে হল চোর!

গরীবদের কি কোনো ঠাঁই নেই পৃথিবীতে ? পাগলের মতো সে আবার রাস্তা ধরে হাঁটতে সুরু করে দিলে। আপন মনে কি

যে ভাবছিল তা সে-ই জানে। রাস্তার লোকের চীৎকারে তার চমক ভাঙল। একটা বিশেষ ধরণের লরী তাকে অল্পের জন্য চাপা দেয়নি। চালক একটা বিকটাকার নিগ্রো—নিজের দেশী ভাষায় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পিণ্টুকে বকুনি দিয়ে উঠল।

পিণ্টু ভাবলে, অজান্তে এই ভাবে মরাও যে ছিল ভালো। দিদিমার কাছে গিয়ে সে মুখ দেখাবে কি করে?

হঠাৎ তার চোখে পড়ল—একটা বাড়ীর আলসের দিকে। সেইখানে একটি থান-কাপড় ঝুলছে।

সাদা থান কাপড়।

তার দিদিমা এই রকম একখানি কাপড়ের জন্যই দিন গুণছে।

শহরের লোকরা যদি তার হাত থেকে সোনার গয়না ছিনিয়ে নিতে পারে, সে-ই বা একখানি কাপড়—প্রয়োজনের কাপড় লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না কেন?

পিণ্টুর মনে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। লাফিয়ে উঠে সে কাপড়খানি ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে হেঁড়ে গলায় একটা হাঁক শোনা গেল—কে-রে, কাপড় ধরে টানাটানি করে? পাহারা-ওয়ালা—পাকড়ো—পাকড়ো।

পিণ্টুর কপাল মন্দ! তাই ঠিক সেই সময় একজন পাহারাওয়ালা গোঁফে চাড়া দিতে দিতে জুতোর খট্ খট শব্দ তুলে সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিল।

এরা হাতে কাজ না থাকলে কাজ তৈরী করে নেয়। কাজেই এমন একটা সুযোগ হাত ছাড়া করে কি ভাবে? ছুটে গিয়ে খপ করে পিণ্টুর কান পাক্ড়ে ধরল।

ততক্ষণে এক ভূঁড়েল জমিদার নীচে নেমে এসেছেন। ভূঁড়ি

দুলিয়ে বল্লেন, পাড়াগাঁয়ের এই সব ছিঁচকে চোরের জ্বালায় শহরে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠছে। আরে বাপু, টাকা চুরি গেলে এই যুদ্ধের বাজারে টাকা পাওয়া যায় অঢেল! কিন্তু কাপড় গেলে ন্যাংটো হয়ে থাকতে হবে। গাছের ছাল ত' আর পরতে পারবো না আগেকার দিনের মতো। নিয়ে যাও হে, পাহারাওলা, পুঁচকে চোরটাকে হাজতে পুরে রাখো।

কথায় বলে, ধরে আনতে বল্লে বেঁধে নিয়ে আসে। পাহারাওলা ত' তাই চায়! হিড় হিড় করে পিণ্টুকে টেনে নিয়ে এসে হাজতে পূরে রাখলে।

তিন দিন পরে পিণ্টু যখন ছাড়া পেলে—তার চেহারা দেখে চেন্‌বার যো নেই! পেটের ক্ষিদে? তা সওয়া যাবে—আগে সে দিদিমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

তাই সে প্রাণপণে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে ছুটল। সন্ধ্যের মুখে পিণ্টু বাড়ীর সামনে গিয়ে হাজির হল। কিন্তু তুলসী-তলায় পিদিম কৈ?

এ ভুল ত' দিদিমার জীবনে কোনদিন হয় নি!

উঠোনে পা দিতে যাবে—পাড়ার বৈকুণ্ঠ খুড়ো এগিয়ে এসে বল্লেন, এই যে আমরা তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে—আমি গামছাটা নিয়ে আসি।

পিণ্টুর মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ব্যাপার কি?

জানতে ওর কিছুই বাকি রইল না! দিদিমা তার জন্যে তিন দিন অপেক্ষা করে লজ্জা নিবারণের আর কোন উপায় না দেখে গলায় দড়ি দিয়ে সকল জ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

দিদিমার শব উঠোনের মাঝখানে শোয়ানো। কিন্তু একি!

যে পদ্মকাঁথা তিনি কাউকে ছুঁতে দিতেন না, তাই দিয়ে তিনি শেষকালে লজ্জা নিবারণ করে গেছেন। দিদিমার দেহ পদ্মকাঁথা আঁকড়ে আছে।

পরলোক থেকে মেয়ে কি এসে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর সকল জ্বালা শেষ করে দিচ্ছে?

কাল সকাল বেলা বৈকুণ্ঠ খুড়োর বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়ার হট্টগোল উঠবে। তাতে হিট্‌লারের হুম্‌কি থেকে শুরু করে জিন্নার জিদ পর্য্যন্ত সব আলোচনা থাকবে—কিন্তু বাঙলা দেশের বন-তুলসী গাঁয়ের একটি বৃদ্ধার ভার যে মা বসুমতী সইতে পারলেন না, তার কোন সংবাদই খুঁজে পাওয়া যাবে না! পিণ্টু এক দৃষ্টে দিদিমার পদ্মকাঁথার দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু তার চোখে এক ফোঁটা জল নেই কেন?

সভাপতির গলার মালা

হলুদরাঙা গাঁয়ে আজ হৈ-চৈ পড়ে গেছে।

এই জাতীয় উত্তেজনা ছোট্ট গ্রামখানির জীবনে আর কখনও দেখা যায়নি।

একটা শান্ত পুকুরে হঠাৎ একটা ঢিল ছুঁড়লে যেমন ঢেউ কেঁপে উঠে পুকুরের পাড় পর্য্যন্ত এসে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, হলুদরাঙা গাঁয়ে আজ সেই রকম সাড়া পড়ে গেছে।

ব্যাপারটা আর একটু খোলাসা করে বললেই বোঝবার আর কোনো অসুবিধা হবে না।

এক নামকরা নেতা আজ শহর থেকে হলুদগাঁয়ে আসবেন গ্রামের বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ-সভায় সভাপতিত্ব করতে। সেইজন্য গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই বিশেষ উৎসাহিত।

প্রধান শিক্ষকমশাই বিদ্যালয়ের ছেলেদের ডেকে কাজের ভার দিয়ে দিয়েছেন। কারা কারা কলাগাছ কেটে এনে তোরণদ্বার সাজাবে, কারা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, উঁচু ক্লাসের কোন্ কোন্ ছেলে আবৃত্তি আর গান শোনাবে, কে কে উদ্বোধন-গীতি আর শেষ সঙ্গীত গাইবে, আলো জ্বালিয়ে দেবার ভার কোন্ ক্লাসের ছেলেদের ওপর থাকবে, বেঞ্চগুলো শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কারা সাজিয়ে রাখবে, মঞ্চ তৈরীর দায়িত্ব গ্রহণ করবে কারা, পানীয় জল সরবরাহ করবার ভার কাদের ওপর থাকবে,—সব কিছু খুঁটিনাটি ব্যবস্থা প্রধান শিক্ষক মশাই করে ফেলেছেন।

সব শেষে তিনি তাঁর বসবার ঘরে ডেকে পাঠালেন বিদ্যালয়ের সব চেয়ে নিরীহ আর ভালো ছেলে শুভকে। ছোটো-খাটো ছেলেটি —ঢলঢলে দুটি সুন্দর দীপ্তিমাখা চোখ,—কথা কয় কম। কিন্তু জন্ম থেকেই একটি পা তার খাটো, সেইজন্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে।

প্রধান শিক্ষকমশাই শুভকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, আচ্ছা শুভ, আমাদের বিদ্যালয়ের পুরস্কারের দিনে সবাইকে সব কাজ ভাগ করে দিলাম, কিন্তু তুমি ত আমার কাছে এসে কোনো কাজের ভার চেয়ে নিলে না!

শুভ মাথা নীচু করে উত্তর দিলে, আজ্ঞে, আমি ত অকেজো লোক,—ভালো করে চলতেই পারি না, আমি কোন্ কাজের ভার নেবো?

প্রধান শিক্ষকমশাই ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, তোমাকে দেবো সব চাইতে বড় কাজ।

শুভ অবাক্ হয়ে প্রধান শিক্ষকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না। তারপর সে শুধোলে, আপনি আমায় দেবেন সব চাইতে বড় কাজে? কিন্তু কি করে আমি পারবো? আমি যে একেবারে কাজের বাইরে!

এইবার প্রধান শিক্ষকমশাই হেসে ফেলে বললেন, কে বললে তুমি সব চাইতে অকেজো মানুষ? প্রতি বছর বিদ্যালয় থেকে তুমি যেমন পুরস্কার নিয়ে গিয়ে সবাইকার কাছে তোমার দাম জানিয়ে দাও—ঠিক তেমনি দামী কাজ আমি তোমার জন্যে ঠিক করে রেখেছি। প্রকৃত নিষ্ঠা না থাকলে যে কাজ করা যায় না—সেই সম্মানের কাজ আমি তোমায় দেবো।

শুভ কিন্তু কিছু বুঝতে পারে না,—শুধু অবাক্ হয়ে বোকার মত তাকিয়ে থাকে!

শিক্ষক মশাই তখন মিটি মিটি হাসতে হাসতে বললেন, তোমায় দেবো আমি সভাপতির গলার মালা তৈরী করার ভার। এর চাইতে সম্মানের কাজ আর কিছু হতে পারে না। তুমি নিজ হাতে নানা রকম ফুল জোগাড় করে মনের মতো একটি সুন্দর মালা তৈরী করবে! তুমি কেমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারো—আমি জানি তোমার তৈরী মালাও ঠিক সেই রকম ছবির মতো হবে। সভাপতি মশায়ের গলায় তুমি নিজে সেই মালা পরিয়ে দেবে। তিনি কাছে ডেকে তোমায় কত আদর করবেন, তোমার পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞেস করবেন। আমিও সেই ফাঁকে জানিয়ে দেবো যে, প্রতি বছর তুমি কত পুরস্কার পাও।

শুনতে শুনতে শুভর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হ্যাঁ, এইবার সে মনের মতো কাজ সত্যি পেয়েছে। ধীরে ধীরে একটি একটি করে ফুল সাজিয়ে সে নিপুণ হাতে মালা তৈরী করবে—যা দেখে সভাপতি-মশাই প্রশংসা না করে থাকতে পারবেন না। তিনি যখন বক্তৃতা দেবেন, সেই মালা তাঁর গলায় দুলবে। শত শত দর্শক তার হাতের গুণপনা দেখতে পাবে। সভাপতির প্রকৃত যে পূজা সেই পূজার ভার তাকে দেয়া হয়েছে! তারপর সভার শেষে সভাপতি মশাই যখন শহরে ফিরে যাবার জন্য গাড়ীতে উঠবেন—সেই মালা তিনি হাতে করে ফিরে যাবেন। হয়ত তারই মতো ছেলেমেয়ে তাঁর বাড়ীতে আছে। তিনি যখন ফিরে যাবেন নিজের বাসায় তখন সবাই মালা দেখে কত খুশি হবে। হয়ত জিজ্ঞেস করবে—বাবা, এ মালা তোমায় কে তৈরী করে দিয়েছে? সভাপতিমশাই তখন নিশ্চয়ই তার কথা বলবেন। তার নামটা কি তাঁর মনে থাকবে না? সবাই বলে শুভ নামটা বেশ ভালো!

ভাবতে ভাবতে শুভ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

প্রধান শিক্ষকমশাই এবার ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, তাহলে কাজটা তোমার মনের মত হয়েছে কি বলো?···শুভ ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানিয়ে চলে এলো।

তারপর ধীরে ধীরে এসে পড়লো উৎসবের দিন। সারা গাঁয়ের রাস্তাঘাট একেবারে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। দু'ধারের জঙ্গল সাফ করা হয়েছে। পথের মাঝে তৈরী করা হয়েছে বিরাট বিরাট সব তোরণদ্বার।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে শুভর আর ফুরসৎ নেই। গোটা গাঁয়ের বাগানে ঘুরে ঘুরে সে জোগাড় করেছে নানা রকমের ফুল।

তবু তার মন ওঠেনি। আরো রকমারি ফুল তার চাই। গণেশদের বাগানে অনেক বাহারী ফুল আছে। তাই নিয়ে আসতে হবে। সংগ্রহ করা ফুলগুলো ঘরের এক কোণে সাজিয়ে রেখে সে আবার বেরুতে যাচ্ছিল, এমন সময় তার ঠাকুমা ডেকে বললেন, হ্যারে শুভ, সেই সকাল থেকে কোথায় এতো আনাগোনা করছিস্ বল্‌ত ? এদিকে ত বই থেকে মাথা তুলিসনে। আজ এত বাইরে যাচ্ছিস কেন ?

শুভ চোখ দুটি বড় বড় করে জবাব দিল, অ্যাঁ ! তুমি এখনো শোনোনি ঠাকুমা ? ইস্কুলের সবাই জানে—আর তুমি ঘরের লোক হয়ে কিছু খবর রাখোনা ?

ঠাকুমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের আমি খবর রাখি না—রে ? হঠাৎ তুই কাজের লোক হয়ে গেলি নাকি ? অন্যদিন ত কুটোগাছাটিও ভাঙতে দেখিনি।

শুভ আঙুল নেড়ে জবাব দিলে, তবে বলি শোনো ঠাকুমা, প্রধান শিক্ষকমশাই আমাকে যে সভাপতির জন্যে মালা তৈরী করতে বলেছেন ! সেই মালা দিয়েই ত সভাপতি বরণ করা হবে।

ঠাকুমা এইবার ফোক্‌লা দাঁতে ফিক্ করে হেসে ফেলে জবাব দিলেন বেশ ত ! মালা তৈরী করবি ভালো কথা। সকাল থেকে যে মুখে কিছু দিস্‌নি ! যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না ? তালের বড়া আর ক্ষীর তৈরী করে রেখেছি। খেয়ে নিয়ে যত খুশি তৈরী কর।

শুভ ভ্রূ কুঁচকে বললে, তালের বড়া তুমি হেঁসেলে তুলে রেখে দাও ঠাকুমা। ও বেলা খাবো'খন। এখন আমায় ফুল যোগাড় করে আনতেই হবে।

শুভ এক পা দু' পা করে বেরিয়ে গেল। ঠাকুমা ঝঙ্কার দিয়ে শুভর মাকে ডেকে বললেন, হ্যাঁ বৌমা, ও যে বাসিমুখে বেরিয়ে গেল আবার, তা তুমি কিছু বললে না ?

শুভর মা জবাব দিলেন, আপনার কথাই শুনলো না, আমি বললে আর কি ফিরবো ? যা খুশি করুক, যখন খুশি খাবে 'খন্।

ঠাকুরা কিন্তু নিজের হাতে তৈরী তালের বড়ার জন্য গজ-গজ করতে লাগলেন।

শুভ ততক্ষণে গণেশদের বাগানের উদ্দেশ্যে পা চালিয়ে দিয়েছে। পথে হঠাৎ ও পাড়ার মণ্টুর সঙ্গে দেখা। মণ্টু বললে, ওরে শুভ, চল চল মাছ ধরে নিয়ে আসি গে। দুটো ছিপ জোগাড় করেছি। ক্যাবলাদের পুকুরে অনেক কৈ মাছ। কৈ মাছের ঝাল যা হবে! সে একবার মুখ চট্‌কে নিলে।

শুভ গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে, আমার সময় নেই, যাচ্ছি ফুল আনতে। সভাপতির জন্য মালা তৈরী করতে হবে—জানিস নে ?

মণ্টু ধমক দিয়ে বললে, জানি রে জানি। ভারী ত মালা—তার জন্যে আমার এত গুমোর। বিকেলের দিকে গোটা কয়েক ফুল তুলে হাতে হাতে গেঁথে নিলেই হবে। তার জন্যে তুই এত ভাবছিস কেন ? এখন চল আমার সঙ্গে। এতো বড় বড় কই মাছ—বুঝলি ?···মণ্টু হাতের ইশারা করে মাছের মাপটা একবার দেখিয়ে দিলে।

শুভ মনে মনে ভাবলে, মণ্টুর মাথায় গোবর পোরা। নইলে এমন একটা সম্মানের কাজের ভার তার ওপর রয়েছে—আর সে কিনা বলছে, যেমন-তেমন করে বিকেল বেলা মালা গেঁথে

দিলেই হবে। কৈ মাছ আর জীবনে কেউ কখনো খায়নি। কৈ মাছ কি গাঁ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে ?

ও শুধু গম্ভীর ভাবে বললে, তোর যত খুশি কৈ মাছের ঝাল তৈরী করগে—আমার সময় নেই—সোজা কথা।—এই বলে শুভ গণেশদের বাগানের দিকে আবার রওনা হলো।

সত্যি, প্রশংসা করতে হয় গণেশদের বাগানটাকে, যে দিকে তাকানো যায় চোখ যেন জুড়িয়ে আসে! কত রঙ-বেরঙের ফুল আর তাদের গন্ধ কি মধুর!

শুভ আপন মনে গুন-গুন করে গান গায় আর টুক্ টুক্ করে ফুল তোলে।

এমন সময় গণেশ সেখানে এসে হাজির। বললে, কিরে শুভ? সভাপতির জন্য মালা গাঁথবি বুঝি? সে না হয় গাঁথিস। কিন্তু এই বকুল গাছটায় চড়াই পাখী বাসা বেঁধেছে। চল দু'জনে উঠে বাসা ভেঙে নিয়ে আসি—ভারী মজা হবে।

শুভ বললে, না—না আমি গাছে উঠ্‌তে পারি না; আর তা ছাড়া মিছিমিছি চড়াই পাখীর বাসা ভেঙে কি লাভ হবে শুনি? তোদের এমন সুন্দর বাগান—কেমন ফুল ফুটে রয়েছে—মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে; আর তোর দুষ্টুমির দিকে এক নজর কেন বলত?

গণেশ চটে উঠে জবাব দিলে, কী? আমার দুষ্টুমির দিকে নজর? আর তুই বুঝি খুব ভাল ছেলে? ইস্কুলে নাম কেনা হয়েছে, আবার সভাপতির গলায় মালা দিয়ে বাহাদুরী দেখানো হবে? যা আমি তোকে আমাদের বাগান থেকে ফুল তুলতে দেবো না।

শুভ অবাক হয়ে বললে, বা-রে, হেড্‌মাষ্টার মশাই যে বললেন, তোর বাবা এর জন্যে কিছু বলবেন না।

গনেশ ফোঁস করে উঠে কইলে, যা পালা,—ভাগ,—ভারী ভালো ছেলে হয়েছিস! তোর মালা গাঁথা আজি বের করে দিচ্ছি! এই বলে ছুটে এসে ওর কোঁচড় থেকে সব ফুল মাটিতে ফেলে দিলে, তারপর ধাক্কা মেরে ওকে বাগানের বাইরে বের করে দিলে।

ভারী রাগ হলো শুভর। একবার ভাবলে প্রধান শিক্ষক মশাইকে গিয়ে নালিশ করে দেবে। কিন্তু কেবল ছুটোছুটিই যদি সে করবে তবে মালা গাঁথবে কখন?

তাই আর কোন রকম ঝগড়া-বিবাদ না বাঁধিয়ে সে বাড়ীতেই ফিরে এলো। অবশ্যি অনেক ফুল তার যোগাড় করা আছে। সুন্দর একটা মালা সে তা থেকেই তৈরী করে নিতে পারবে। না হয় ফিরতি পথে চৈতনদের বাগানের আরো কয়েকটি রকমারি ফুল যোগাড় করে নিলেই হবে।

বাড়ীতে ফিরতেই শুভর মা মারমুখী হয়ে এলেন, বললেন, সারাদিন খালি পেটে থেকে তারপর একটা অসুখ বাঁধিয়ে বোস্! তখন কিন্তু আমি কিচ্ছু করতে পারবো না। আগে নেয়ে-খেয়ে নে, তারপর যে 'রাজকার্যি' আছে করগে।

শুভ দেখলে, মা চটলে আর রক্ষে নেই। তাই মুখ বুজে কোন রকমে ঝুপ-ঝুপ করে পুকুরে স্নান করে, গপাগপ্ কয়েক গ্রাস ভাত খেয়ে মালা গাঁথতে বসে গেল।

অবশ্যি সে বেশ ভালো রকমই জানে যে, তার অসুখ করলে মা সংসারের সব কাজ ফেলে রাত-দিন তার শিয়রে বসে থাকবে, তবু মাকে চটিয়ে কোনো কাজ হবার যো নেই।

শুভর একটি মস্ত বড় গুণ যে, সে যখন কোনো কাজ নিয়ে মেতে যায় তখন মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও কোন হুঁস

তার থাকে না! পড়তে বসলেও তাই, কোনো কাজ করতে দিলেও তাই! ঘরের দরজা বন্ধ করে সে এক মনে মালা গাঁথতে লাগলো।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো। কিন্তু শুভর সে দিকে কোনো খেয়াল নেই! সে শুধু ফুল বেছে বেছে মালা গাঁথছে।

ঠাকুমা ডেকে বললেন, ওরে শুভ, সারারাত ধরে কি তুই মালা গাঁথবি!

শুভ জবাব দিলে, এমন মালা গাঁথবো ঠাকুমা, যে, তোমরা সবাই দেখে তাকিয়ে থাকবে,—সভাপতি মশাই প্রশংসা করবার ভাষা খুঁজে পাবেন না!

মা বললেন, সারা জীবন ধরে মালা গাঁথ···কিন্তু বিকেলের জল খাবারটা খেয়ে নে। আমি আর আগলে থাকতে পারিনে বাপু।

শুভ মুখ না তুলেই উত্তর দিলে, ঢেকে রাখো না মা! মালাটা শেষ না করে আমি কিছুই করতে পারবো না।

মা রাগ করে সন্ধ্যে-প্রদীপ দিতে তুলসীতলায় চলে গেলেন।

ওদিকে প্রধান শিক্ষকমশাই মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সভাপতিমশাই শহর থেকে মোটরে করে এসে পৌঁছেছেন, কিন্তু বরণ করবার মালা নেই!

শুভ কোথায়? খোঁজ—খোঁজ—শিক্ষক মশাই গেট পর্যন্ত ছুটোছুটি করতে লাগলেন, কিন্তু শুভর টিকিটি অবধি দেখা যাচ্ছে না।

শেষকালে শিক্ষকমশাই অসহিষ্ণু হয়ে দুটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন—শুভকে ধরে নিয়ে আসতে। তারা শুভকে নিয়ে যখন উৎসব-প্রাঙ্গণে হাজির হলো, তখন উদ্বোধন-সঙ্গীত শুরু হয়ে গেছে।

প্রধান শিক্ষকমশাই ধমক দিয়ে বললেন, এ কি শুভ, এত দেরী করে তুমি অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেবে দেখছি! যাও সভাপতির গলায় মালা দিয়ে এসো।

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল শুভর দিকে। তিনি থমকে রইলেন খানিকক্ষণ! ওর উস্কুখুস্কু চুল, ময়লা কাপড়। একটা ছেঁড়া জামা গায়ে!

উৎসব-সভায় আসবার এই কি বেশ-ভূষা? শিক্ষকমশাই শুভকে হাত ধরে টেনে দাঁড় করালেন, বললেন, এই চেহারা আর এই বেশ নিয়ে তুমি সভাপতিকে মালা দিতে যাবে নাকি?

শুভ এইবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলে—তাই ত! সারাদিন ধরে সে শুধু মালা গেঁথেছে; নিজেকে সাজিয়ে নেবার কথা একবারও ভাবেনি!

কিন্তু প্রধান শিক্ষকমশাই আর অপেক্ষা করতে পারেন না। তিনি তাড়াতাড়ি শুভর হাত থেকে মালাটা ছিনিয়ে নিয়ে বিদ্যালয়ের সম্পাদকের ছোট্ট মেয়ের হাতে দিয়ে সভাপতি-বরণের ব্যবস্থা করে ফেললেন। মাল্যদানের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত দর্শকবৃন্দের ঘন-ঘন করতালি ধ্বনিতে সভাগৃহ মুখরিত হলো।

শুভ পাথরের মূর্তির মতো উৎসব-প্রাঙ্গনের এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলো। সে সব কিছুই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কিছুই যেন সে বুঝতে পারছে না এমনি তার মনের অবস্থা!

উৎসবে অনেক গান হলো, বহু আবৃত্তি হলো, হরেক রকম বক্তৃতা দিলেন উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ। প্রাইজও শুভ পেল। সভাপতির বক্তৃতা কখনো নরমে কখনো চরমে চললো। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি পুরো একঘণ্টা চীৎকার করে জানিয়ে দিলেন

যে, আজকের দিনে ছেলেদের কোনো আন্তরিকতা নেই কোনো নিষ্ঠা নেই। তাঁদের ছেলে বেলায় তিনি ছিলেন বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র, সবাইকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

সভাপতির বক্তৃতা শেষ হতে আবার করতালি ধ্বনিতে সারা বিদ্যালয় মুখরিত হয়ে উঠলো। 'বন্দে মাতরম্' আর 'জয়হিন্দ্' চীৎকারের ভেতর দিয়ে তিনি গিয়ে মোটরে উঠলেন!

পেট্রোলের একটা উগ্র গন্ধের ধোঁয়া ছেড়ে মোটর ভেপু বাজিয়ে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়েছে! সমগ্র জনতা উৎসুক হয়ে পথে দাঁড়িয়ে সেই দিকে তাকিয়ে।

শুভ হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলো।

দেখলো, উৎসব-প্রাঙ্গনে সে একা প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে ছেঁড়া কাগজ, ভাঙা নিশান, দেবদারুর পাতা, রঙবেরঙের কাগজের তৈরী শেকল,—তারই এক কোণে সভাপতির টেবিলের পাশে তার গাঁথা মালা ছেঁড়া অবস্থায় পড়ে আছে—সতরঞ্জির ওপর!

হয়ত বহু লোক পা দিয়ে মাড়িয়ে গেছে সেই ফোটা ফুলের মালা!

কিন্তু কী আশ্চর্য!

শুভ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে, একটা গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে পড়েছে সেই ছেঁড়া মালাগাছির ওপর!

সেই কাল রাত্রির কথা কি ভোলা যায় ?

সে রাত্রেও পিণ্টু আর পারুল মায়ের ছু'পাশে শুয়ে ; মা কাকে বেশী ভালবাসে তারই খুন্‌সুটি চল্‌ছিল।

সেই সন্ধ্যে বেলাতেও ঠাকুমা উঠোনের তুলসী তলায় হরির লুট দিয়েছে, ঘরে ঘরে সন্ধ্যে-প্রদীপ দেখাবার পর তাদের ভাই-বোনের কাছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প করেছে। ওদের গোয়ালের বুধি গাইয়ের ছুধে রান্না হয়েছিল বাটি-বাটি পায়েস। তাই রাত্তিরে খেয়ে ওরা ছুজন মাকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে ছিল তার ছু' পাশে।

ভাই-বোনে রাত্তিরে যে স্বপ্ন দেখছিল তাতেও মাখা ছিল সুষমা আর সৌন্দর্য্য···ফোটা ফুলের গন্ধ আর ফুল-পরীর গান !

কেননা অভাব নেই ওদের কিছুরই। ক্ষেত ভরা ফসল, পুকুর ভরতি মাছ, গাই-বলদে ভরা গোয়াল। পোষা টিয়া, চন্দনা, কাকাতুয়া, মেনী আর বাঘা কুকুর।

লোকে বলত যেন লক্ষ্মীর সংসার ! ঠাকুমা, বাবা, মা আর ভাই-বোন—পিণ্টু, পারুল।

পিণ্টু বারো বছরের ছেলে, আর পারুল ছয় বছরের ছুধে-আলতা রঙের ছোট্ট ঢল্‌ঢলে বোন, যেন শিশির-ধোয়া মুখখানি।

কিন্তু সেই রাত্তিরেই একটা বাছুড় যে পাখনা মেলে তাদের খেলাঘরের উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল—একটা কালপ্যাঁচা যে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠেছিল, সে শব্দ কি কেউ শুন্‌তে পেয়েছিল ?

হঠাৎ তাদের জীবনে এলো ঝোড়ো হাওয়া ! অন্ধকার রাত্তিরে কোথা দিয়ে যে কি ঘট্‌ল ঠাহর করা মুস্কিল !

একটা ধস্তাধস্তির শব্দে প্রথমে পিণ্টুর ঘুম ভেঙে গেল।

দেখে, মুখোস পরা দুটো গুণ্ডা তার বাবার গলা টিপে ধরেছে। ওদিকে আর একটা গুণ্ডা তার মায়ের গা থেকে টেনে টেনে গয়না খুলে নিচ্ছে।

ছোট্ট ছেলে হলে কি হবে! পিণ্টুর মাথায় যেন সব রক্ত চন্‌ করে উঠে গেল! সে একটা কাটারী নিয়ে একটা গুণ্ডার পায়ে এমন জোরে কোপ বসিয়ে দিলে যে, সে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই গুণ্ডাটা এক ধাক্কায় পিণ্টুকে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। কাঠের থামের সঙ্গে চোট্‌ লাগতে পিণ্টু সেইখানেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। তারপর যে কি হল, সে কিছু জানে না।

যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো—সে তাকিয়ে দেখলে তাদের বাঘা কুকুরটা মাথার এক দিক কেবল চাট্‌ছে। সেইখানটাতেই সে চোট পেয়েছিল।

কুকুরটা সত্যি তাকে ভালোবাসে, তাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত থাক্‌তে চায় না।

তখনো পিণ্টুর মাথার ঝিমঝিমে ভাবটা একেবারে কেটে যায় নি! যেন আধো ঘুম, আধো জাগরণ! তবু তারি মধ্যে হাত বাড়িয়ে সে বাঘার গলাটা জড়িয়ে ধরল।

বাঘাটা বুঝতে পারল যে, পিণ্টুর জ্ঞান ফিরে এসেছে, তাই সে আনন্দে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। পিণ্টু এইবার উঠে বসল, কিন্তু মাথা তুলে যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল—তাতে সে বুক ফাটা চীৎকার করে উঠল! দেখলে—তার বাবাকে গুণ্ডারা গলা টিপে মেরে ফেলেছে। তাঁর চোখ দুটো আর জিবটা বেরিয়ে এসেছে—তাকিয়ে দেখা যায় না! আর একদিকে চোখ পড়তে দেখলে,

তার মার গলা কাটা! যে কাটারী দিয়ে সে গুণ্ডাটাকে আঘাত করেছিল—বোধ করি রাগের মাথায় গুণ্ডাটা সেই দা দিয়েই তার মাকে কেটে রেখে গেছে।

পিণ্টুর মনে হল, একটা চাপা কান্না তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আস্‌তে চাইছে, কিন্তু সে কিছুতেই কাঁদতে পারছে না। চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও তার বেরুচ্ছে না! কান দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা ছুটছে। তার কেবলি মনে হতে লাগল যে, ছোট্ট দুই মুঠির ভেতর চেপে গোটা পৃথিবীটাকে গুঁড়িয়ে দেয়। কিন্তু কিছুই সে করতে পারল না—শুধু বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ তার মনে হল—পারুল? তার ছোট্ট তুলতুলে বোন? সে কোথায় গেল? তাকেও কি গুণ্ডারা মেরে ফেলেছে? কি আশ্চর্য্য! বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখে—তাদের সংসারে ওলট-পালট হয়ে গেলেও ছোট বোন পারুল বিছানায় শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে! সে এর কিছুই জানতে পারেনি। হঠাৎ পিণ্টুর মনে হল সে পারুলের দাদা। তাকে কিছুতেই ভেঙ্গে পড়লে চলবেনা—ছোট বোনটিকে তার বাঁচাতেই হবে। চোখে দেখা যায় না এই যে ঘটনা ঘটে গেল তাদের বাড়িতে, এ দৃশ্য দেখলে পারুল আর বাঁচবে না; সে আঁৎকে উঠে মরে যাবে!

পিণ্টু ঠিক করলে সে পারুলকে নিয়ে আর বাঘাকে সঙ্গে করে এই বাড়ী থেকে এক্ষুণি পালিয়ে যাবে। কোথায় যাবে তা সে জানে না;—কিন্তু এইটুকু বুঝেছে যে, পারুলের ঘুম ভাঙার আগেই তাকে নিয়ে এ বাড়ী ছেড়ে দূরে পালিয়ে যেতে হবে।

অতি ধীরে ধীরে অনেক কষ্টে সে পারুলকে বুকে তুলে নিলে।

ওর ঠোঁটে এখনো মিষ্টি হাসি লেগে রয়েছে। ও হয়ত স্বপ্ন দেখছে ঠাকুরমার কোল, মায়ের চুমো আর বাবার আদর! কিন্তু জেগে উঠে পিন্টু যে দৃশ্য দেখেছে পারুলকে সে কিছুতেই তা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে দেবে না! ফুলের মতো ওর মন—ও কি সইতে পারবে? তার চাইতে পিন্টু রয়েছে পারুলের দাদা, এখন থেকে তাকে সব ঝড়-ঝাপটা থেকে সেই বাঁচিয়ে রাখবে। ওর মনে এতটুকু ব্যথা যাতে লাগে, এমন কাজ সে হতে দেবে না। পিন্টু মন বাঁধলে, তাকে শক্ত হতে হবে।

বাঘাটাও কোনো সাড়া-শব্দ আর করছে না। যেন সে বোবা হয়ে গেছে! সজল চোখে একবার পিন্টুর দিকে আর একবার ঘুমন্ত পারুলের দিকে শুধু তাকাচ্ছে, আর অকারণে মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছে।

ধীরে ধীরে পিন্টু বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু ও কি? কুয়োর ধারে ঠাকুমার মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে! ঠাকুমা হয়ত গুণ্ডাদের বাধা দিতে গিয়েছিল!

নাঃ, ওদিকে পিন্টু তাকাবে না। সে সোজা এগিয়ে চল্লো রাস্তা ধরে। ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকে আর চাইবে না—নিজের মনকে চুপি চুপি পরামর্শ দিলে। সে আজ ঠাকুমার নাতি নয়, মা-বাপের ছেলে নয়, শুধু পারুলের দাদা। অনেক দায়িত্ব তার কাঁধে।

উস্কুখুস্কো চুল, শুকনো মুখ, জবাফুলের মতো টক্‌টকে চোখ—সে শুধু পথ চলতে লাগলো। এপাশে-ওপাশে দু'একবার যেদিকে দৃষ্টি পড়ল তাতে সে বুঝতে পারলে যে, গত রাত্তিরে গুণ্ডাদের অত্যাচারে গাঁ ছেড়ে অনেকেই পালিয়ে গেছে! আরো খানিকটা এগুবার পর পারুলের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

পারুল চোখ কচ্‌লে জেগে উঠেই বল্লে, একি দাদা, তুমি আমায় কোলে কোরে কোথায় চলেছো? তারপর একটু ভেবে নিয়ে বল্লে, ও! বুঝতে পেরেছি! খুব ভোরে আমরা মিত্তিরদের বাগানে লিচু আনতে যাচ্ছি—সত্যি কিনা বলো! মা-বাবা যখন ঘুম থেকে উঠে আমাদের দেখতে পাবে না—তখন ভারী জব্দ হবে।

এইবার পিন্টুর বুক ঠেলে কান্না আসে, কিন্তু তবু সে দাঁতে দাঁত চেপে রাখে—কথা কয় না।

—ও দাদা! কথা কইছ না কেন? পারুলের মুখে হুষ্টুমীর হাসি।

পিন্টু বল্লে, আমরা এক নতুন জায়গায় যাচ্ছি রে—চল—। কিছুটা পথ চলার পর দেখা গেল—দলে দলে বহু লোক নানা পথ ধরে পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় রেল ষ্টেশনের দিকে চলেছে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, গুণ্ডাদের অত্যাচার সারাটা অঞ্চল জুড়েই হয়েছে।

পারুল আর বাঘাকে নিয়ে পিন্টু সেই মানুষের মিছিলের মধ্যে মিশে গেল। পথ যেন আর ফুরোয় না। পারুল শুধোয়, এ তুমি কোথায় চলেছ দাদা? আমি যে আর হাঁটতে পারছি নে!

পিন্টু ওর মুখের দিকে তাকালে! পারুল ভারী লজ্জা পেলে। তার কোঁকড়া চুল দুলিয়ে বল্লে, না-না, আমি কোলে উঠতে চাইছি না। আমি নাকি আর ছোট্টটি আছি? কত্ত বড় হয়েছি আমি। কি বলিস্ রে বাঘা?

বাঘা ওকে উৎসাহ দেবার জন্য ল্যাজ নাড়লে। তিনজন আবার হাঁটতে সুরু করে। তাদের কচি পা ধুলোয় ভরে উঠে!

ষ্টেশনে যেতেই একটি বুড়ো ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্ম্মের আর এক

কোণ থেকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে পারুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে পিণ্টুর মুখের পানে জল ভরা চোখে চেয়ে কাতর কণ্ঠে বল্লেন, তোরা আমায় ছেড়ে যাস্ নি। তোরই মতো এক মেয়ে আমার ঘর আলো করে ছিল। শয়তানরা মুখোস পরে এসে আমার বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে দেয়ালে আছড়ে মেরেছে। পর মুহূর্তেই বুড়ো মানুষটি মাটিতে বসে পড়ে—একেবারে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন।

পিণ্টু অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এই সময় পারুল আস্তে আস্তে বল্লে, দাদা আমি আর থাকতে পারছিনে। আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

ক্ষিদের কথা শুনে বুড়ো ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন, ক্ষিদে পেয়েছে ? খাবে ? আ হা হা ! সেও ক্ষিদে সইতে পারতো না ! তোরা দাঁড়া, আমি এক্ষুনি খাবার আর দুধ নিয়ে আসছি। পালাস্‌নে যেন—

বুড়ো মানুষটি যেমন ছুটে এসেছিলেন তেমনি দ্রুতবেগে খাবারের দোকানের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। তারপর ঠোঙাতে করে প্রচুর খাবার আর মাটির ভাঁড়ে করে দুধ নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। ভাইবোনে খেয়ে বাকি খাবারগুলো বাঘাকে দিয়ে দিল। বাঘা প্রথমটা কিছুতেই খাবে না, তারপর পিণ্টু ওর গলা ধরে সাধতে বাঘা খাবার খেলে। বুড়ো ভদ্রলোক একেবারে যেন আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোর ভেতর খুঁজে পেলেন। বল্লেন, তোদের আর আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না। আমার সঙ্গে চল্ তোরা কলকাতায়। সেখানে আমার নিজের বাড়ী আছে। আমি তোদের মানুষ করে তুলবো। ভয় কি তোদের ? তিনি একে একে

পিণ্টুর কাছ থেকে সব কথা জেনে নিলেন। বোন যেন শুনতে না পায় এই ভাবে সে সব কথা বুড়ো মানুষটিকে খুলে বল্লে। শুনে তার চোখের জল আর বাঁধ মানতে চায় না, বল্লেন, তোরা যেমন দুঃখ পেয়েছিস আমিও ঠিক তাইরে! সেই জন্যেই বুঝি ভগবান এমন করে আমাদের মিলিয়ে দিয়েছেন। বুড়ো কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে নীরবে পিণ্টুর মাথায় হাত রেখে অনেকক্ষণ বসে রইলেন।

পিণ্টু এইবার ভয়ে ভয়ে শুধোলে, কলকাতায় যাবো কি করে? আমার কাছে ত কোনো টাকা পয়সা নেই! আমরা এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছি। বোনটিকে কিছু জানতেও দিই নি। বুড়ো মানুষটি জবাব দিলেন, সেজন্যে তোদের কিছু ভাবতে হবে না রে! আজ থেকে তোদের ভাইবোনের সব ভার আমি নিলাম। ট্রেনে উঠে পারুল প্রথমে খুব খানিকটা আনন্দ করলে, বল্লে বাড়ী গিয়ে মা বাবা ঠাকুমাকে রেলগাড়ীর গল্প বলতে হবে। জানালার ধারে বসে সে তারের ওপর ফিঙের নাচন দেখলে, তারপর একসময় বুড়ো ভদ্রলোকের কোলে ঘুমিয়ে পড়ল। সারাদিন ধরে গাড়ী চললো। তারপর সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলো। এই সময় পারুলের ঘুম ভাঙতে সে উঠে বসল। ভয়ে ভয়ে বল্লে, মায়ের কাছে যাবো। পিণ্টু ওকে ভোলাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বল্লে, পারুল, আগে আমরা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দেশটা ঘুরে আসি, তারপর বাড়ী যাব, কেমন? বুড়ো মানুষটি ওর জন্যে মিষ্টি কিনে রেখেছিলেন তাই ওর হাতে গুঁজে দিলেন। গাড়ী লোকজনে ঠাসা! সবাইকার দুঃখের কথা এত কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে যে, কেউ আর কথা কইতে পারছে না; সবাই ভাবছে, এ রাজ্যি কখন ছাড়িয়ে যেতে পারবে। আস্তে আস্তে গাড়ীর আলো

স্তিমিত হয়ে এলো—আরোহীদের চোখেও লাগলো ঢুল। গভীর রাত, বাইরে ঝোপঝাড় জঙ্গলে জোনাক পোকার ছড়াছড়ি! আশে পাশের ডোবাগুলিতে ব্যাঙের গোঙানি। এমন সময় হঠাৎ ঘ্যাচাং করে গাড়ী গেল এক নদীর ওপরকার সেতুর মাঝামাঝি জায়গায় থেমে। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ রৈ-রৈ চীৎকার।

একদল গুণ্ডা লাঠি সোটা রামদা প্রভৃতি নিয়ে জানালার ভিতর দিয়ে পিণ্টুদের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। পারুলের কানে তুল, গলায় হার, আর হাতের চুড়ি এ পর্যন্ত কেউ নেয় নি, সেইদিকে একটা গুণ্ডার চোখ পড়ল। সে লাফিয়ে পারুলকে বুড়োর কাছ থেকে টেনে নিতে গেল। কিন্তু বুড়ো মানুষটি হঠাৎ সিংহ-গর্জ্জনে লাফিয়ে উঠে পারুলকে আড়াল করে বল্লেন, আমি আমার মায়ের গায়ে কিছুতেই হাত দিতে দেবো না। তখন দুটো গুণ্ডা এক জোট হয়ে বুড়ো ভদ্রলোককে ধরে চক্ষের নিমেষে জানালার ভেতর দিয়ে নীচে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। অনেক তলায় ঝপাং করে একটা শব্দ শোনা গেল।

ওদিকে গোটা কামরায় লাঠির ঘায়ে কত মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

কামরার এক কোণে এক মুসলমান ভদ্রলোক আপন মনে বসে কি একটা বই পড়ছিলেন। গুণ্ডার দল যখন আবার পারুলের গা থেকে গয়না ছিনিয়ে নিতে গেল তখন তিনি হুঙ্কার দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন, এই মেয়ের গা থেকে তোমরা গয়না কেড়ে নিতে এসেছ? দেখি কার গায়ে কত শক্তি আছে! আমার সঙ্গে না লড়ে ওই দুধের বাচ্চার গায়ে হাত দিতে পারবে না।

মুসলমান ভদ্রলোকটি এক হাতে পারুলকে জড়িয়ে ধরে আর

এক হাতে গুণ্ডাদের একটি লাঠি কেড়ে নিয়ে সংহার মূর্তিতে চোখ বড় বড় করে দাঁড়ালেন।

তখন গুণ্ডার দল এগুতে সাহস করল না—সুট্‌সুট্‌ করে জানালা গলিয়ে পালিয়ে গেল। ভদ্রলোকটি তখন পিণ্টু আর পারুলকে পাশে ডেকে নিয়ে বল্লেন, খোকা-খুকু, তোমাদের কোনো ভয় নেই—আমিও কলকাতা যাচ্ছি—তোমাদেরও সেইখানে পৌঁছে দেবো।

গাড়ী আবার ধীরে ধীরে চল্‌তে সুরু করল। কিন্তু ভেতরটা একেবারে নিঝুম।

অনেককে জানালা গলিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ পালিয়ে গেছে সেই কামরা থেকে। যারা মারের চোটে আর ছুরির ঘায়ে মারা গিয়েছিল, তাদের মৃতদেহগুলি গুণ্ডারা টেনে নামিয়ে নিয়ে গেছে।

গাড়ীর ভেতর একটা রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে! আরোহীরা পা তুলে বেঞ্চের ওপর বসে দুর্গানাম জপ করছে! এককোণে মুসলমান ভদ্রলোকটি পিণ্টু আর পারুলকে নানারকম গল্প করে ভোলাবার চেষ্টা করছেন।

পিণ্টু বসে বসে সেই বুড়ো ভদ্রলোকের কথা ভাবছিল, পারুলকে বাঁচাতে গিয়েই ত তিনি এমন করে প্রাণটা দিলেন। তিনি যদি এভাবে বেঘোরে মারা না যেতেন তবে হয়ত ওরা ভাই-বোনে একটা আশ্রয় পেতো। পিণ্টু লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে উঠতে পারত! তারপর তার ছোট বোনটিকে বড় করে তুলতো। কোনো দুঃখের আঁচ তার গায়ে লাগতে দিত না।

দুটো রাত্তিরের ভেতর ছোট্ট পিণ্টুর জীবনে কি রকম ওলট্‌-পালট হয়ে গেল সেই কথা সে চোখ বুজে ভাব্‌তে চেষ্টা করল।

তাদের বাড়ী—আম, জাম,নারকেল গাছে ঘেরা ছবির মত বাড়ী। টল্‌টলে পুকুর, নরম সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি—নাটমন্দির, দোলমঞ্চ, গোয়ালঘর, ফুলের বাগান, পাখীদের দোল্‌না, মেনী আর বাঘা কুকুরের থাক্‌বার ঘর—এখনো সব চোখের ওপর ভাস্‌ছে।

ওদের সেই বাড়ীতে সব চাইতে মধুর ছিল মায়ের কোল, বাবার আদর আর দিদিমার সন্ধ্যেবেলার গল্প। এক কাল রাত্রে কেমন ভাবে সব কিছু তাদের হারাতে হল—আজ আলো-আঁধারী ট্রেণের কামরায় বসে একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে ; হয়তো তাদের বাবার ঘরের জানালার ঠিক নীচে—রজনীগন্ধার ঝাড়ে ফুল ফুটেছে, তারি সুবাস এলো-মেলো বাতাসে ভেসে বেড়ায়! গাছের ডালে যে টুনটুনিটা বাসা বেঁধে ছিল—তার হয়ত বাচ্চা হয়েছে! তাদের মা, বাবা ঠাকুমার দেহ রাতের আঁধারে শেয়াল-কুকুরে এসে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিনা তাই বা কে বল্‌তে পারে?

হঠাৎ কুলীদের চীৎকারে তার ভাব্‌নার সুতো ছিঁড়ে গেল! তারা শেয়ালদায় এসে পৌঁছে গেছে। একজন মুসলমান ভদ্র-লোকের সঙ্গে দুটি হিন্দু ছেলে-মেয়েকে দেখে ছুটে এলো কৌতূহলীর দল, ছুটে এলো খবরের কাগজের রিপোর্টার।

তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন, জেরার পর জেরা!

পিন্টু বল্লে, আপনারা ওঁকে মিছে হয়রাণ করছেন! উনি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। ভদ্রলোক কামরায় না থাক্‌লে আমার বোনকে গুণ্ডারা মেরে ফেল্‌তো।

মুসলমান ভদ্রলোক পিন্টু আর পারুলকে আশীর্ব্বাদ করে বিদায় নিলেন।

খবরের কাগজের লোকেরা ভাই-বোনকে দাঁড় করিয়ে নানা

ঢঙে ফটো তুল্‌লে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের সব খবর জেনে নিয়ে খাতায় টুক্‌লে, তারপর গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল !

পরদিন সেই খবর যখন ছবিসহ ছাপা হল—দৈনিক কাগজে— পিন্টু আর পারুলের গল্প তখন আলোচিত হ'তে থাক্‌লো রেষ্টুরেন্টে, বাজারে, মেসে, চৌরাস্তার মোড়ে, বড়লোকের বৈঠকখানায় আর খেলার মাঠে।

কিন্তু পিন্টু আর পারুল যে ক্ষিদের জ্বালায় কল্‌কাতার বিপুল জনতার ভীড়ে মিছে আশ্রয়ের জন্যে মাথা খুঁড়ে মরতে লাগ্‌লো— সে সন্ধান কেউ রাখল না !

যখন কোনো মানুষ তাদের আপনার করে কাছে টেনে নিলে না —তখন—আমরা যাদের ইতর প্রাণী বলি—সেই বাঘা কুকুর কিন্তু ওদের সঙ্গ কিছুতেই ছাড়লে না।

শেষ পর্য্যন্ত দুটি অনাথ ভাই-বোন আর একটি বুদ্ধিহীন পশু নগরের জনারণ্যে কোথায় যে হারিয়ে তলিয়ে গেল—কালের ইতিহাসে তার আর কোনো সাক্ষ্যই থাক্‌ল না !

পিদিম

বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর ঝিয়ের ছেলে 'জন্তু'। সবাই ওকে 'জন্তু' বলেই ডাকে। মানুষের পেটে হয়েও কি করে ওর 'জন্তু' নাম জুটে গেল, সে ইতিহাস হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না ; তবে একথা ঠিক যে, ওর আশে-পাশের মানুষরা ওকে সগোত্রীয় বলে স্বীকার করতে লজ্জা পায়।

কেউ কোন কথা জিজ্ঞেস করলে করলে সে তার ড্যাব্‌ডেবে দু' চোখ তুলে তাকায়; সে চোখে জিজ্ঞাসার জোয়ার-ভাঁটা খেলে কিন্তু বুদ্ধির অগ্নি-কণা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বোধ করি সবাই ওকে জন্তুর পর্য্যায়ে ফেলে দিয়েছে।

অন্য কেউ হলে নামটা নিয়ে আপত্তি তুলতো, হয়ত অনর্থ করত, কিন্তু জন্তু তার নামের সার্থকতা বজায় রেখে একেবারে নির্ব্বিকার!

'জন্তু' বলে ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে সে এমন চট্‌পট্‌ "আজ্ঞে" বলে তটস্থ হয়ে ওঠে যে, হঠাৎ মনে হয়, ডাক্‌টা শোন্‌বার জন্যে সে সর্ব্বক্ষণ কানখাড়া করেই আছে! বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর গোয়াল-ঘরের লাগোয়া কুঠরীটা খালি করে দেয়া হয়েছে ঝিয়ের সঙ্গে তার ছেলের থাকবার জন্যে। আগে এই ঘরে জ্বালানি কাঠ জমা করে রাখা হত, কিন্তু এদের দুটি প্রাণীর থাক্‌বার ঠাঁই চাইত! তাই গিন্নির আদেশে জ্বালানি কাঠের বোঝা গেছে অন্যত্র; জন্তু মায়ের সঙ্গে এই এই ঘরে আস্তানা গেড়েছে। ছোট্ট নড়বড়ে একটি তক্তপোষে মায়ে-পুতে শোয়; নইলে মাটিতে থাক্‌লে আরশুলা আর ইঁদুর মিলে একদিনেই ওদের ঘরছাড়া করে দিত।

এই ব্যবস্থাতেও দৌরাত্ম্য যে কিছু কম হয়, তা নয়; তবে সরাসরি গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে ইঁদুরগুলো আর কামড়াতে পারে না। আরশুলাগুলো সারাদিন যেন ওৎ পেতে থাকে। ওরা এসে বিছানায় গা গড়িয়ে দেয়া মাত্রই পুষ্পবৃষ্টির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে—মুখে, চোখে, বুকে। দু'হাতের কসরতে যতগুলো তাড়ানো যায়, ওরা তাড়ায়; শেষকালে জন্তু মরিয়া হয়ে যাকে পায় তাকেই টিপে মারতে থাকে। একটা বিশ্রী গন্ধ ঘরটাকে আরও বিষাক্ত করে তোলে।

জন্তুর মা বলে, থাক্, থাক্—অমন করে মারিস নে। আমাদের যেমন একটা থাক্‌বার জায়গা চাই, ওদেরও ত' তেমনি দরকার। কর্ত্তাবাবুর ছাপোর খাটে ত' ওরা বাসা বাঁধতে পারে না! আমাদের আশে-পাশেই ওদের ঠাঁই।

মায়ের কথায় জন্তু মারণ-যজ্ঞ থেকে নিরস্ত হয়। এমনি করে ওদের দিন কাটে।

সকালবেলা কিছুক্ষণের জন্যে ঘরের ভেতরটা সূর্য্যের সোনালী আভায় ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, তারপর সারাটা দিন যে অন্ধকার, সে অন্ধকার। রাত্তির হলে সব একাকার হয়ে যায়। ঘরের ভেতর কেউ চলাফেরা করলেও বোঝবার যো নেই যে, কোনো প্রাণী ওখানে আছে! অন্ধকার এমন সুন্দরভাবে ওদের দেহের সঙ্গে মিতালী পাতায় যে মনে হয়, একেবারে হরি-হর আত্মা!

তা ও ঘরে পিদিমের কি বা এমন দরকার? জন্তুর মা উদয়াস্ত বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর সংসারে খাটে। তার ওপর রাত্তির বেলা সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেলে বাসন-টাসন মেজে ওর ছুটি।

রান্নাঘরের দাওয়ায় জন্তুর তখন এক ঘুম হয়ে যায়।

সমস্ত চুকিয়ে রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে মা ছেলেকে জাগায়—তারপর দুটিতে যখন গোয়াল-ঘরের পাশের অন্ধকূপে এসে আশ্রয় নেয় তখন বাঁড়ুয্যে বাড়ী একেবারে নিঝুম হয়ে পড়ে।

তখন আর পিদিম জ্বালিয়ে এমন কি মহাভারত পাঠ হবে?

মায়ের তো' উঠ্‌তে হয় আবার শেষ রাতে। জন্তু আরও খানিকক্ষণ ঘুমোবার অবকাশ পায়, তারপর গরু নিয়ে চলে যেতে হয় মাঠে। সারাটা দিন ত' বাইরে-বাইরেই কাটে।

বিকেলে ফিরে এসে গরুর জাবনা কাট্‌তে হয়—ঘরে ঘরে

আলো জ্বালিয়ে দিতে হয়; তার ওপর ফাই-ফরমাস ত' আছেই।

কিন্তু এত কাজের মধ্যেও জন্তু ছোট দাদাবাবুর কাছ থেকে জোগাড় করেছে একটি প্রথম ভাগ; এর-ওর হাতে-পায়ে ধরে, অ-আ আর ক-খর পাতাটা কোন রকমে চিনে নিয়েছে। ওর বড় ইচ্ছে—টানা-পড়া শেখে, বাবুদের মতো খবরের কাগজ পড়ে, দেশ-বিদেশের নানান কথা জান্‌তে পারে।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, সারাদিনে সময় ওর এতটুকু নেই। টানা-পড়া শেখ্‌বার ফুরসুৎ করবে কি করে? ভারী ইচ্ছে করে ওর—রাত্তির বেলা নিজের ঘরটিতে এসে একটি পিদিম জ্বালায়। বাঁড়ুয্যে বাড়ীর সবাই যখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে তখন ও আপন মনে পিদিমের পাশে বসে পড়া-পড়া খেলা করে। আকাশের এক কোণের শুকতারার মতো জ্বলুক তার পিদিম, আর রাতের পর রাত জেগে সে জান্‌বার সব কিছু জেনে নিক্!

তারপর দিনের প্রখর আলোয়—সবাই তাকে ডাকুক জন্তু বলে, সারাদিন মাঠে মাঠে সে গরু চরিয়ে বেড়াক—তাতে এতটুকু আপত্তি নেই তার। তখন সে ভীড়ের মাঝখানে হাটুরে মানুষ!

কিন্তু রাত্তিরের অন্ধকারে তার তপস্বী মন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে তখন সে ধ্যানী-বুদ্ধ। পৃথিবীকে সে জানতে চায়। মানুষের অবজ্ঞা, মানুষের ঘৃণা তখন তাকে ছুঁতে পারে না—সে সবাইকার উর্দ্ধে বিচরণ করে; সপ্তর্ষি মণ্ডল তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। জ্ঞান-ভাণ্ডার কালো একটা ঢাক্‌নী দিয়ে ঢাকা; সে হাজার চেষ্টা করেও সেই অমানিশার আঁধার ভেদ করতে পারে না। মন যখন জান্‌বার পিপাসায় আকুলি-বিকুলি করতে

থাকে, একটি ছোট পিদিম তার অন্ধকার আঁখির কোণে জ্বলে জ্বলে নিভে যায়।

এই পিদিম তাকে কে জ্বালিয়ে দেবে? জন্তর মনে এমনি করে জেগে ওঠে জগতের চিরন্তন-জিজ্ঞাসা।

মাকে একবার কথাটা সে মুখ ফুটে বলেছিল। মা তার অতি সাদাসিদে মানুষ, একটু ভীতুও বটে। বল্লে, থাক্ গে। কাজ কি বাপু ওসব হাঙ্গামায়! গিন্নিমা জানতে পারলে একেবারে অনর্থ করবেন।

কাজেই কথাটা ওই খানেই এক রকম চাপা পড়ে যায়।

মুখের কথা চাপা দেয়া সোজা, কিন্তু মনের আগুন নেভানো ত' সহজ নয়। তাই জন্তর মনে থেকে থেকে এমন সব কথা জাগে, যার মানে সে নিজেও কিছু বুঝ্‌তে পারে না।

আচ্ছা, একি মুস্কিল! মনে যখন আলো জ্বলে, তখন আঁধার ঘরে একটি পিদিম কোন রকমেই জ্বালানো যায় না কেন?

ঠিক করলে, পিদিম তাকে জ্বালাতেই হবে।

দিন-কয়েক বাদে গিন্নিমা ডেকে বল্লেন, ওরে জন্তু, দোতলার কড়ি-কাঠের সঙ্গে লেপ-তোষকগুলো অনেক দিন থেকে ঝোলানো আছে, ওগুলো নামিয়ে একদিন ভালো করে রদ্দুরে দে—

লেপ-তোষক নামাতে গিয়ে কড়ি কাঠের সঙ্গে একটা পুঁটলি আবিষ্কার করলে জন্তু। খুলে দেখে, অনেকগুলি মাটির পিদিম ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে জড়ানো।

জন্তু বুঝ্‌তে পারলে, গত বছর দীপান্বিতা রাত্রে যে পিদিমগুলি ছাদের আল্‌সেয় দেয়া হয়েছিল, সেইগুলিই যত্ন করে বেঁধে রাখা হয়েছে, সাম্‌নের শ্যামাপূজার রাত আলোকিত করবে বলে।

জন্তু মনে মনে ভাব্লে, এর একটি পিদিম কি তার অন্ধকার ঘরে আলো জ্বাল্তে পারে না ?

বেশী জম্কালো আলো ত' সে চায় না, তার চার পাশ ঘিরে একটি ছোট্ট বৃত্ত রচনা করবে এই আলো, আর সে কাউকে না জানিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে গুপ্তধনের সন্ধান করবে। যে কোন অভিযান-মূলক উপন্যাসের চাইতে যে এই সন্ধান রোমাঞ্চকর, সে কথা বলে দেবার লোক জন্তুর আশে-পাশে কেউ নেই; তবু সে অনুভব করে কোন্ অজানা-আকাঙ্ক্ষায় তার মন গুম্‌রে-গুম্‌রে কেঁদে মরছে !

ফুল ফোটবার আগে সারারাত ধরে অন্ধকারে ঠিক এমনি করেই কি আলোর জন্য তপস্যা করে ? জন্তু সে কথা খুলে বল্‌তে পারে না।

একটি পিদিম কিন্তু সে আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে নিলে। কাজটা যে চুরি, সে কথা কিন্তু তার একবারও মনে হলনা। অতি সাবধানে পিদিমটা সে নিজের ঘরে খাটের তলায় লুকিয়ে রাখ্‌লে। এখন কিছু তেল জোগাড় করতে পারলেই আলো জ্বালা চলে।

কি করে তেল পাওয়া যাবে সেই হল আসল ভাবনা ! মার কাছে চাইবার ত' যো নেই ! কিছু বলতে গেলেই কইবে, গিন্নিমা একেবারে অনর্থ বাঁধাবে ! বামুন মাসি রান্না করে, তার কাছে অবশ্যি চাওয়া যায়; কিন্তু সে এমন বদ্‌মেজাজী যে কখন কি মূর্ত্তি নেবে, ঠাহর করা শক্ত। এক কথায় খানিকটা তেল ঢেলে দিতেও পারে, আবার এই নিয়ে এমন চ্যাচামেচি সুরু করতে পারে যে, বাড়ী শুদ্ধ সব লোক এসে জমা হবে। সে একটা কেলেঙ্কারী ব্যাপার !

অনেক ভেবে চিন্তে জন্তু একটা উপায় ঠিক করলে। দুপুর বেলা সে যখন পান্তা খেতে আসে, সেই সময় কর্ত্তাবাবুর গায়ে-পায়ে তেল মালিশ করে দিতে হয় রোজ। এই হচ্ছে উপযুক্ত অবসর। তেল মাখার সময় কর্ত্তাবাবুর বোধ করি ঘুম পায়, সেই জন্য তিনি অনেক সময় চোখ বন্ধ করে চুপ চাপ মোড়ার ওপর বসে থাকেন।

জন্তু ঠিক করলে, কালকেই তেল মাখাবার সময় কাজ হাঁসিল করতে হবে।

আগে থেকেই মাটির সেই পিদিমটা সে ট্যাঁকে করে নিয়ে এলো। নইলে তেল নিয়ে যাবে কিসে করে?

তেল মাখাতে-মাখাতে কর্ত্তাবাবু যখন সত্যি ঝিমিয়ে পড়লেন, জন্তু খানিকটা তেল পিদিমে ঢেলে নিয়ে সোজা চলে এলো নিজের ঘরে। তার বুকে যেন সেই সময় কে জোরে-জোরে হাতুড়ি পিট্‌ছিল।

আজ তার আঁধার মিশ্‌কালো ঘরে পিদিম জ্বল্‌বে! সারাটা দিন যে ওর কি করে কাট্‌ল, সে ওই জানে!

প্রখর সূর্য্যালোকে সে গরু চরাচ্ছে, কিন্তু মনে মনে দেখ্‌ছে বাড়ুয্যে-বাড়ী কোন মায়া যাদুকরের যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে! গোয়াল-ঘরের পাশের ছোট এঁদো স্যাঁতসেঁতে ঘরে জ্বলছে একটি ক্ষীণ প্রদীপ, আর তারই আলোয় বসে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে একটি ছেলে পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে! চোখে-মুখে তার কি বিস্ময়! পৃথিবীর সব-কিছু আশ্চর্য্য সে এক রাত্রে জেনে নিতে চায়! অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাক্‌বার পর সে চিন্‌তে পারল, ছেলেটির মুখ অনেকটা তারই মতো।

দিন শেষ হয়ে গেল···সূর্য্যিমামা তার শেষ আলোর জাল

গুটিয়ে নিয়ে গেল, ঘরে-ঘরে শঙ্খ-ঘন্টা-ধ্বনির সঙ্গে প্রদীপ জ্বলে উঠ্‌ল; বাঁড়ুয্যে বাড়ীর ছেলেরা বৈঠকখানা-ঘরে বসে, দেয়ালে লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে, দুলে-দুলে নামতা মুখস্থ করতে লাগলো।

বাঁড়ুয্যে মশায়ের পাশার আড্ডা আজ ভালো করে জমেছে, সেখানে অনেকগুলি মাথা আজ এক সঙ্গে জুটেছে।

জন্তু একবার তার নিজের ঘরের দিকে তাকালো। সেখানে আঁধার বেশ জমাট বেঁধে রয়েছে। যে ঘরে কোনোদিন আলো জ্বলেনি, জন্তু আজ সেইখানে আলো জ্বালাবে। জন্তু যদি ইতিহাসের খবর রাখ্‌ত তা হলে বলত, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চাইতেও এটা একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা! কিন্তু মজার কথা এই যে, একটি কিশোর-মনে হঠাৎ কখন পিদিম জ্বলে ওঠে, খবরের কাগজে তার সংবাদ ছাপা হয় না।

হঠাৎ জন্তুর মনে হল—মাটির পিদিম আর তেল ত' জোগাড় হয়েছে কিন্তু আলো সে জ্বাল্‌বে কি করে? বাড়ীর সরকার-মশাই ঘন-ঘন বিড়ি টানেন। তাঁর ফাই-ফরমাস খাটে বলে সরকার মশাই জন্তুকে একটু স্নেহের চোখে দেখেন। অনেক সাধ্য-সাধনা করে জন্তু তাঁর কাছ থেকে একটি খালি দেশালায়ের বাক্স আর একটি কাঠি জোগাড় করলে।

সময় যেন তার কাটতে চায় না! খাওয়ার পাট চুকেছে। মা কি আজ তার বাসন মাজা বন্ধ রাখ্‌তে পারে না?

অবশেষে বাঁড়ুয্যে বাড়ী সত্যি ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল। ওরা সবাই না ঘুমুলে ত' আলো জ্বালা চল্‌বে না!

মায়ের হাত ধরে জন্তু তাদের আঁধার অমরাবতীতে এসে ঢুক্‌লো। প্রদীপটা যেখানে রেখেছিল সেইখানে হাত দিয়ে দেখে, সর্বনাশ!

তেলগুলো বুঝি আর্শুলায় খেয়ে গেছে—আর একটা নেংটি ইঁদুর হয়ত পিদিমটাকে উল্টে ফেলে দু'আধখান করে রেখে দিয়েছে! এতগুলি ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীর কাছে এক পিদিম তেল রেখে দেয়াই ওর ভুল হয়েছে!

অন্ধকার ঘরে আলো আর সেদিন জ্বলল না!

আর একদিনের কথা।

রান্না ঘরে বসে বামুন-মাসির সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে ওর নজর পড়ল একটা পুরোনো মরচে-ধরা কুপির ওপর। বেশ মজা ত'!

এইটেকে পরিষ্কার করে যদি সে কেরোসিনে ভরতি করে নিতে পারে ত' রোজ রোজ ওর ঘরে আলো জ্বল্‌বে। কুপিটা ত' কারো কোনো দরকারেই লাগ্‌ছে না। বামুন মাসিকে সে বল্লে, মাসি, এইটে আমি নিই?

মাসি সেদিন ওর ওপরে সত্যি খুশী ছিল। অম্বলের জন্যে কাঁচা তেঁতুল এনে দিয়েছিল অনেকগুলি। তাই বল্লে, ও! খেলা করবি বুঝি! তা নে না। ওটা ত' অকেজো হয়েই পড়ে আছে!

জন্তুকে তখন পায় কে? মরচে পড়া কুপিটাকে নিয়ে সোজা চলে এলো নিজের ঘরে। আগে এটাকে তেঁতুল দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে—ঠিক রূপোর মতো।

সে কাজটা অতি সহজেই হল।

কিন্তু কেরোসিন?

কেরোসিন পাওয়া যাবে কোথায়?

আজকের দিনে কেরোসিন জোগাড় করা যে হাতের মুঠোয় চাঁদ ধরার মতোই শক্ত!

কেরোসিনের দোকানের সাম্‌নে যে দলে-দলে মেয়ে-পুরুষ রোজ লাইন দিয়ে দাঁড়ায়—আর বেঁটে, লম্বা, চ্যাপ্টা বোতল সাজিয়ে রাখে,—সেটা যাতায়াতের পথে জন্তু দেখেছে। আজ গরু চরানোর এক ফাঁকে এসে কেরোসিন জোগাড় করতে হবে! সকাল বেলা যাবার মুখে যদি একটা বোতল সাজিয়ে রেখে যায়, তবেই কেরোসিন পেতে কোন অসুবিধা হবে না।

জগন্নাথ ওদের সঙ্গেই গরু চরায়, তার ওপর আজ গরুগুলির ভার দিয়ে এলেই হবে।

সক্কালবেলা গরু নিয়ে বেরুবার মুখে বাঁড়ুয্যে বাড়ী থেকে সে একটা বোতল সংগ্রহ করে নিতে ভোলেনি।

সন্ধ্যের ঠিক আগে দোকানে কেরোসিন দেয়, কিন্তু তারই জন্যে সকাল থেকে লোকের আনাগোনা আর সার-বাঁধা চল্‌তে থাকে। বোতল আগে সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল বলে জন্তুর কেরোসিনের জন্য খুব বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হল না। বাঁড়ুয্যে-গিন্নি কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে ওকে দু'আনা পয়সা দিয়েছিলেন—তাই দিয়ে জন্তু কিন্‌ল কোরোসিন। ওর ভাগ্যে জুটল আধ-বোতল কেরোসিন। কেরোসিন বাগিয়ে নিয়ে সবে সে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, এমন সময় ও-পাড়ার বকুল-ফুল মাসি যেন হুম্‌ড়ি খেয়ে তার গায়ের উপর কেঁদে পড়ল!

সে ওর মায়ের সঙ্গে 'বকুল-ফুল' সম্পর্ক পাতিয়েছে, সেই জন্যই জন্তু তাকে বকুল-ফুল-মাসি বলে ডাকে।

জন্তু শুধোলে, একি! এমন করে কাঁদছ কেন মাসি? কি হয়েছে তোমার?

বকুল-ফুল মাসি আঁচলে চোখের জল মুছে বল্লে, কি আর

বল্‌ব বাছা, মেয়ে আর জামাই এসেছিল বেড়াতে—এখানে এসে জামায়ের শক্ত ব্যায়রাম্ হয়েছে। ডাক্তার বল্‌ছে 'টায়ফোট্' না কী! শক্ত নাম। ঘরে এক ফোঁটা কেরোসিন নেই। রোগী রেখে বেরুতেই পারিনে। যখন এলাম—দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিলে।

দূর থেকে দেখ্‌লাম, তুই আধ বোতল তেল পেয়েছিস। এমন রুগীকে আঁধার ঘরে কি করে রাখি বল্? মাথা খাস্—ওই তেলটা আমায় দে—আমি তোর মায়ের মতো—তোর হাতে-পায়ে ধরছি। আরে ছি-ছি—করো কি বকুল-ফুল মাসি! ব্যস্ত হয়ে জন্তু হাত সরিয়ে দেয়।

সত্যি—বকুল-ফুল মাসি তাকে মায়ের মতোই ভালবাসে, যখন--তখন ডেকে নিয়ে ভালো-মন্দ খাবার মুখে গুঁজে দেয় যেন নিজের কোলের ছেলে। আর তা ছাড়া, জামাইবাবুর এমন শক্ত অসুখ! ওর ঘর না হয় অন্ধকার থাকুক—এতদিন পিদিম জ্বলেনি, আর দুটো দিন না জ্বল্‌লে পৃথিবীর এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

আস্তে আস্তে বোতলটা বকুল-ফুল-মাসির হাতে তুলে দিয়ে, জন্তু ঘরের পানে পা বাড়ায়। আস্‌তে আস্‌তে শুন্‌তে পায়—মাসি বল্‌ছে, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক—আমার পাকা চুলের মতো তোর পরমায়ু হোক—

জন্তু আপন মনে হাসে।

এরই মধ্যে এক হপ্তা কেটে গেছে।

জন্তু কিন্তু পিদিম জ্বালাবার প্রতিজ্ঞা ভোলেনি। এবার সে নিজেই এঁটেল মাটি দিয়ে মাটির পিদিম তৈরী করেছে।

কর্ত্তার তেল-মাখার শিশি থেকে বেশ খানিকটা তেল দিনের

বেলা জোগাড় করেছে। সরকার মশায়ের কাছ থেকে দেশালায়ের নতুন একটা কাঠি সংগ্রহ করতেও তার বেগ পেতে হয় নি।

সরকার মশাই শুধু ঠাট্টা করে শুধিয়ে ছিলেন, কিরে, রোজ রোজ দেশলাইয়ের কাঠিতে কি হবে? বিড়ি-টিড়ি খেতে শিখিস্ নি ত'? খবরদার, আমার পকেটে হাত দিবি নে।

মাথা নীচু করে জন্তু জবাব দিয়েছিল, আজ্ঞে না, ঘরে ইঁদুর আর আরশুলা···একটু পিদিম জ্বাল্‌বো।

সরকার মশাই খানিকটা ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। গোয়াল-ঘরের পাশে পিদিম! এ রকম আশ্চর্য্যজনক কথা যেন তিনি জীবনে শোনেন নি! কিন্তু জন্তুকে তিনি সত্যি ভালোবাসেন। বল্লেন, জ্বালিস্, কিন্তু খুব গোপনে, কর্ত্তামশাই ঘুমোলে; দেখিস কেউ যেন টের না পায়।

সেই রাত্তিরে জ্বলল জন্তুর নিজের হাতেগড়া মাটির পিদিম। এতটুকু একটা মাটির পিদিম সারাটা ঘর আলো করে দিতে পারে। জন্তুর কাছে এ একটা মহা বিস্ময়! খাটের এক কোণে পিদিমটাকে বসিয়ে জন্তু পাতার পর পাতা উল্‌টে যেতে লাগলো।

একদিন কিশোর বিদ্যাসাগর পথ চল্‌তে চল্‌তে যে ঔৎসুক্য নিয়ে ইংরেজী সংখ্যাগুলো রাস্তার "মাইল ষ্টোন" দেখে শিখে নিয়েছিলেন, জন্তুর চোখে সেই জিজ্ঞাসা! সে বিশ্ব-জগৎ ভুলে পুঁথির পাতার দিকে তাকিয়ে রইল।

আনাড়ি হাতের তৈরী পিদিমটা ঠিক মতো বস্‌তে পারেনি। হঠাৎ কি করে কাত্ হতে তারই থেকে শুকনো ছেঁড়া-মাদুরে লাগলো আগুন। আলো উজ্জ্বলতর হল—জন্তু মনের আনন্দে

পাতা উল্টে যেতে লাগলো। এমন নিস্তব্ধ রাত—এমন উজ্জ্বল আলো—সেকি জীবনে আর পাবে ?

কিন্তু বাইরের একটা চ্যাঁচামেচিতে জন্তুর মার ঘুম ভেঙ্গে গেল। একি ! ঘরে আগুন লেগেছে যে !

সকলের আগে ছুটে এলেন সরকার মশাই। চীৎকার করে বল্লেন, ছোঁড়া সব মাটি করলে ! বল্‌লাম, দেখিস, কেউ যেন টের না পায়। তা সবাইকার ঘুম ভাঙিয়ে ছাড়লে হতভাগা ! সাধে কি আর ওর নাম হয়েছে জন্তু ! দেবেন কর্ত্তা দূর করে তাড়িয়ে !

জন্তুর কিন্তু কোন দিকে হুঁস নেই। আজ তার ঘরে পিদিম জ্বলেছে···তারই আলোতে সে পড়ছে প্রথম ভাগ।

ভুতুড়ে গল্প

নিশির ডাক

ঝণ্টু যখন একেবারে ছেলেমানুষ—মানে কোলের ছেলে, তখন তার মায়ের শক্ত অসুখ করে। সেই জন্যে সে আহ্লাদী পিসির কোলে মানুষ হয়। আহ্লাদী পিসি ঝণ্টুর বাবার দূর সম্পর্কের এক বোন, মাথায় একটু কেমন যেন ছিট্ আছে বলে শ্বশুরঘর করতে পারেনি। আবার কারণে অকারণে আহ্লাদীর মতো এলোমেলো কথা বলে, সেইজন্যে তার নাম হয়েছে আহ্লাদী। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সে তাই আহ্লাদী পিসি। মায়ের অসুখ থেকেই

ঝণ্টুকে সে কোলে তুলে নিলে। তার পরেই ছেলেটা ওর এমন ন্যাওটা হয়ে গেল যে, মায়ের অসুখ ভালো হলেও আহ্লাদী পিসি আর ওকে কোল থেকে নামাতে চায়নি। ঝণ্টু আহ্লাদী পিসি বলতে একেবারে অজ্ঞান। আহ্লাদী পিসি খাইয়ে দেবে, স্নান করিয়ে দেবে, জামাকাপড় পরিয়ে দেবে আর ঘুম পাড়িয়ে দেবে। পিসিকে না হলে ঝণ্টুর এক মুহূর্ত চলে না। ঝণ্টুর মা-ও সংসারের সাত ঝামেলায় দিবা-রাত্তির জড়িয়ে থাকেন, তাই আহ্লাদী পিসির কোলে ছেলে ফেলে দিয়ে তারও সকল রকমের নিশ্চিন্দি।

আহ্লাদী পিসি মাছ খেতে বড়ো ভালো বাসে, বিশেষ করে শোল মাছ। ঝণ্টু যখন একটু বড় হলো, সে পিসির জন্যে নানা রকম মাছ ধরে নিয়ে আসে। পিসি এক গাল হেসে বলে, "ভাগ্যিস আমার ঝণ্টু ছিল, তাই দুটো মাছ-ভাত খেয়ে বাঁচি।"

বর্ষার সময় যখন দেশের নদী নালা ভরাট হয়ে আসে—নিজেদের পুকুরে জল পড়ে, ঝণ্টু গভীর রাত্রে গিয়ে পোলো দিয়ে নানা জাতীয় মাছ ধরে নিয়ে আসে—বিশেষ করে আহ্লাদী পিসির জন্যে শোল মাছ যদি পায় তবে তার মুখে আর হাসি ধরে না।

আহ্লাদী পিসি ঝণ্টুর বাবার সংসারেই থাকে বটে তবে তার নিজের বেশ কিছু টাকা আছে। সেই টাকা আহ্লাদী পিসি যক্ষের মাতা আগলে রাখে। শুধু ঝণ্টুকে মাঝে মাঝে মিষ্টি কিনে খাওয়ায়। ঝণ্টুর মা ঠাট্টা করে বলেন, ঠাকুরঝি এমন করে তোমার টাকাগুলি নয়-ছয় করে ফেলো না।

আহ্লাদী পিসি রাগ করে উত্তর দেয়, আমার টাকা আমি

যা খুশী করবো, রাস্তায় ছড়িয়ে দেবো, তাতে কার কি! আসল কথা হচ্ছে, এই ব্যাপার নিয়ে বাড়ীর সবাই আহ্লাদী পিসিকে ক্ষ্যাপায়।

আহ্লাদী পিসি মরলে ঝণ্টুই যে গয়ায় তার পিণ্ডি দেবে এই কথাই সে গর্বে সবাইকে বলে বেড়ায়!

এই আহ্লাদী পিসি হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে মারা গেল।

দিব্যি শক্ত সমর্থ আহ্লাদী পিসি······দেহে রোগ বালাই নেই—এমনভাবে যে হঠাৎ মারা যাবে তা বাড়ীর কেউ ধারণাই করতে পারেনি! দুর্দান্ত দস্যি ছেলে ঝণ্টু······আহ্লাদী পিসির মৃত্যুর পর কে যেন তার মুখে বোবা কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। কারো সঙ্গেই কথা কয় না, খায় না, দায় না, উদাস চোখে একদিকে তাকিয়ে থাকে! ছেলে যেন দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল!

এই ব্যাপারে ঝণ্টুর মা বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঝাড়-ফুঁক—তাবিজ—কবচ কিছুতেই কিছু নয়! ঝণ্টুর দেহের রক্ত যেন কেউ শুষে নিতে লাগল! বাড়ী শুদ্ধ লোক ভেবে কিছু কূল-কিনারা পায় না।

রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে ঝণ্টু কখনো কখনো ধড়মড় করে উঠে বসে।

মা শুধোন, হ্যাঁরে ঝণ্টু, বিছানার ওপর উঠে বসলি কেন? এখনো ত অনেক রাত। ঘুমিয়ে পড়!

ঝণ্টু ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকায়, তারপর ফিস্ ফিস্ করে মাকে বলে, আহ্লাদী পিসি আমার কানের কাছে ডাকলো যে।

শুনে মা শিউরে ওঠেন। ঝন্টুর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। মুখে বলেন, রাম-রাম-রাম।

পাড়ার পাঁচজন বৌ-ঝি বলে, অ ঝন্টুর মা, ওর দিকে বেশ কড়া নজর রেখো, পোড়ামুখী আহ্লাদী মরেও ওকে ভুলতে পারে নি। তাই বুঝি এখনো আশে পাশে ঘুর-ঘুর করছে!

ঝন্টুদের বাড়ীর নীচে পুকুর পাড়ে একটা স্যাওড়া গাছ; গাঁয়ের লোকেরা হাট থেকে সওদা করে ফেরবার মুখে ওই স্যাওড়া গাছের ডালে কাকে যেন বসে থাকতে দেখেছে।

বৃন্দাবন গাঙ্গুলী একদিন নাকি একেবারে সামনা সামনি পড়ে গিয়াছিলেন। বল্লেন, ভাগ্যিস আমি বুদ্ধি করে পৈতেটা জড়িয়ে ধরে গায়ত্রী জপ করতে সুরু করলাম, নইলে ঝন্টুদের পুকুরের খালে আমার ঘাড় মট্‌কে রাখতো! এই ভাবে সারা গাঁয়ে একটা চাপা ফিস্‌ফাস্ আলোচনা! কেউ বিশ্বাস করে, কেউ হেসে উড়িয়ে দেয়!

তখন আষাঢ় মাস। আশে পাশের নদী নালা বর্ষার জলে ভরাট হয়ে গেছে। ঘোলা জল পাক খেতে খেতে ধানের জমি ভরিয়ে, মাঠ ঘাট ডুবিয়ে, উঁচু নীচু গাঁয়ের পথগুলিকে পিছল করে ঝন্টুদের বাড়ীর পুকুরের খালে ঢুকেছে।

তখন বোধ করি দুপুর রাত। এমন একটা আবছা জোছনা ফুটেছে যে, আশে-পাশে-দূরে সব কিছু নজরে পড়ে কিন্তু ভাল করে ঠাহর করা যায় না। মনে হয় যেন একটা পাতলা কুয়াশা জোছনার সঙ্গে মিশে গোটা গ্রামটাকে ঘিরে রেখেছে।

মায়ের পাশে ঝন্টু অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ওদের বাড়ীর রান্নাঘরের পিছন দিক দিয়ে একটা কালো বেড়াল বিকট ভাবে

ডেকে চলে গেল, কোথায় কোন ঝোপে বসে একটা ভূত-ভূত্তুম পাখী একটানা বেসুরো ভাবে ডেকে বিরক্তি জাগিয়ে তুলছে, একটা থম্‌থমে বিশ্রী ভাব।

এমনি সময় ঝণ্টুর মনে হল—ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আহ্লাদী পিসি ওকে ডাকছে। আহ্লাদী পিসি বলছে, ওরে ঝণ্টু, শীগ্‌গির আয়—তোদের পুকুরের খালে নতুন জল এসেছে, কত মাছ উঠেছে ......দেখবি আয়। তোর পোলোটা নিয়ে আসতে ভুলিসনি যেন।

আচম্‌কা ঝণ্টুর ঘুমটা ভেঙে গেল। সে বিছানার ওপর উঠে বসল। আশে-পাশে তাকিয়ে দেখল সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তার মায়ের ডান হাতটি ওর গায়ের ওপর ছিল। আস্তে আস্তে হাতটা সে সরিয়ে রাখল।

আহ্লাদী পিসি বলেছে পোলো নিয়ে যেতে। মন্ত্রমুগ্ধের মত ঝণ্টু পাশের ঘরে ঢুকল। ঐ খানেই পোলো থাকে। বেড়ালের মত সাবধানে পা টিপে টিপে সে পোলো নিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো।

কে যেন কানের কাছে বল্লে, দরজাটা ভেজিয়ে দে ঝণ্টু, নইলে ওরা জেগে উঠবে। ঝণ্টু বিনা প্রতিবাদে তাদের ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হন্ হন্ করে পুকুরের খালের ধারে চলে গেল।

নিশুতি রাত......কেউ কোথায়ও জেগে নেই......কল্ কল্ করে বর্ষার জল ঢুকছে খালে.... ঝণ্টু ঝপ্ ঝপ্ করে পোলো ফেলছে আর রাশি রাশি মাছ ধরছে! এত শোল মাছ এল কোত্থেকে ঝণ্টু ভেবে কুল কিনারা পায় না। ও যে খালৈ সঙ্গে এনেছিল,

সেটা মাছে ভর্তি হয়ে গেল। কিসের যেন একটা পোড়া গন্ধ ক্রমাগত তার নাকে আসছিল। কার আকর্ষণে ঝন্টু সেই মাছ ভর্তি খালৈ নিয়ে এগিয়ে চল্লো! এ কি! এ যে সেই স্যাওড়া গাছ।

ফিস্ ফিস্ কথা কানে এলো।

—আমায় শোল মাছ পোড়া খাওয়াবি ঝন্টু? ঝন্টু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, স্যাওড়া গাছের ডালে লাল শাড়ী পরে দিব্যি পা ঝুলিয়ে কে যেন বসে আছে। আহ্লাদী পিসি না? দেখতে ঠিক সেই রকম।

এতক্ষণে ঝন্টুর জ্ঞান ফিরে এল! আহ্লাদী পিসি ত মরে গেছে! ও তাহলে কার ডাকে এই নিশুতি রাতে মাছ ধরতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে? ভয়ে ওর মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। সে প্রাণপণে চেষ্টা করল পালিয়ে যেতে......কিন্তু পা দুটো কিছুতেই উঠছে না, মনে হচ্ছে এঁটেল মাটির কাদায় যেন বসে গেছে। শেষকালে মনে জোর এনে ঝন্টু মরিয়া হয়ে ছুটতে সুরু করে দিল। পেছন থেকে আহ্লাদী পিসির নাকি সুরে কান্না শোনা গেল, ওঁরে ঝন্টু, শোঁল মাছগুলো আঁমায় দিয়ে যাঁ আমি আঁর কিছু চাঁইনে—

যত আহ্লাদী পিসির কথা কানে আসে—ঝন্টু তত ছোটে! হঠাৎ সে দেখলে একটা বিরাট লম্বা হাত স্যাওড়া গাছের ওদিক থেকে এসে তার হাতের মাছের খালৈ ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

একটা আর্তনাদ করে ঝন্টু সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল! তার চীৎকার শুনে বাড়ী থেকে লোকজন এসে যখন পৌঁছুলো, ওর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে!

অনেক ভূত-তাড়ানো রোজা, বহু মন্তর, রাশি রাশি তাবিজ, কবচ—মাদুলি···কিচ্ছুতে কিছু না···ঝণ্টু অসাড় হয়ে পড়ে থাকে, —ডাকলে সাড়া দেয় না !

অবশেষে মায়ের বুক ভাঙ্গা কান্নায় তিনদিন পর ঝণ্টু চোখ চেয়ে তাকালো।

কিন্তু কি হয়েছিল, কোন কথাই সে মনে করে গুছিয়ে বল্‌তে পারে না, শুধু বোকার মতো ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে থাকে।

গাঁয়ের মাতব্বর, পাড়া প্রতিবেশী সবাই বল্লে, দেখ ঝণ্টুর মা, এখন থেকে ঝণ্টুকে একেবারে চোখে চোখে রাখতে হবে। পেত্নীরা ওই রকম করে নিশির ডাকে ভুলিয়ে জলার ধারে নিয়ে ঘাড় মট্‌কে রাখে।

শুনে ঝণ্টুর মার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। সারা রাত ধরে ছেলের শিয়রে জেগে থাকে মা। ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। ভাবে, আমার শান্তির সংসারে এ কী হলো! কি কুক্ষণেই পরের মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলাম।

এদিকে তার পর থেকেই বাড়ীর লোকে একটা অবাক কাণ্ড লক্ষ্য করতে লাগলো।

পাথরের মূর্তির মতো পাগ্‌লা-পাগ্‌লা চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে ঝণ্টু।

হঠাৎ সে বলে বসল, আমি পোড়া শোলমাছ খাবো।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একটা পোড়া মাছ ঘরের মাঝখানে এসে পড়ল। ভয়ে আঁৎকে উঠল সবাই।

ব্যাপার দেখে বাড়ীর মানুষরা ঘন ঘন রাম নাম জপ করতে লাগলো।

কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যাপারটা সহজ হয়ে এলো যখন দেখা গেল যে, ঝন্টু যখন যা চায় কোন্ অদৃশ্য হস্ত যেন সঙ্গে সঙ্গে তাই এনে হাজির করে।

সেদিন দুপুর গরমে আই ঢাই করতে করতে ক্ষীণকণ্ঠে ঝন্টু বল্লে, মা, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দাও না।

মুখের কথা খসাতে যতটুকু সময়।

দেখা গেল তার সামনে শ্বেতপাথরের সুন্দর একটি গেলাসে টল্‌টলে পরিষ্কার জল। ঝন্টু সেই জল খেতে যাচ্ছিল—কিন্তু ওর মা হাত দিয়ে সব টুকুন জল মেঝেতে ফেলে দিয়ে বল্লেন, কক্ষনো মুখে দিসনে ঝন্টু,...ওসব পেত্নীতে জোগাচ্ছে।

আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য করা গেল যে, এই জাতীয় ভৌতিক কাণ্ড রাত্তির বেলাই ঘট্‌ছে।

সন্ধ্যের পর পাড়ার গিন্নিরা দল বেঁধে আসতো ঝন্টুকে দেখতে। কথায় কথায় গাঙ্গুলী গিন্নি বল্লেন, আমার জর্দ্দা গিয়েছে ফুরিয়ে, কাশীর জর্দ্দা না হলে আমার মুখে রোচে না।

আপন মনে ঝন্টু বল্লে, তুমি কাশীর জর্দ্দা খাবে ঠানদি ? সঙ্গে সঙ্গে ঠন্ করে মেঝেতে পড়ল একটি কৌটো।

গাঙ্গুলী গিন্নী অবাক হয়ে চীৎকার করে বল্লেন, এই ত কাশীর জর্দ্দা ! একেবারে নতুন কৌটো। কোত্থেকে এলো ঝন্টুর মা ?

যারা আশে-পাশে ছিল—ব্যাপারটা জানতো তারা উত্তর দিলে, গাঙ্গুলী গিন্নি বুঝি জানো না ? ওই সব আহ্লাদী পেত্নীতে জোগাচ্ছে।

জর্দ্দার কৌটোটা গাঙ্গুলী গিন্নি হাতে তুলে নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যেই আহ্লাদী পেত্নীর কথা শুনলেন, অমনি রাম-রাম করতে করতে মোটা দেহ নিয়ে একেবারে নিজেদের বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলেন।

এইভাবে নানা রকম ঘটনা ঘট্‌তে লাগলো। হঠাৎ চাঁপা ফুলের গন্ধে গোটা বাড়ীটা ম' ম' করতে লাগলো, তার পর মুহূর্ত্তেই পচা মাছের গন্ধে লোকে নাকে কাপড় দিয়ে পালিয়ে যেতে পথ পায় না!

পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে ঘিরে রয়েছে ঝন্টুকে···কোথায়ও কিছু নেই···হঠাৎ রাশি রাশি ইট পাট্‌কেল পড়তে সুরু হল। কিন্তু মজা এই যে, একটি ঢিলও ঝন্টুর গায়ে লাগলো না। যে সব ছেলেরা ঘিরে রয়েছে শুধু তাদের মাথায় পিঠে ক্রমাগত ভাদ্রের তালের মতো এসে দমাদ্দম পড়তে থাকে! বাপ্‌রে-মারে করে তখন যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায় ওরা।

যতদিন ব্যাপারটা তামাসা থাকে···লোকে ভীড় জমায়··· কৌতূহলী হয়ে বসে থাকে পেত্নীর কাণ্ড দেখতে। কিন্তু কত রাত্তির লোকে এইভাবে না ঘুমিয়ে জাগতে পারে?

কাজেই আস্তে আস্তে ভীড় পাত্‌লা হয়ে আসতে লাগলো। গম্‌গমে বাড়ী আবার মানুষ জন শূন্যি···থমথমে হয়ে গেলো।

কিসের যেন দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝ রাত্তিরে ঝন্টুর ঘুম ভেঙে যায়। মা ছেলেকে বুকের কাছে প্রাণপণে টেনে নেন। বাঁশ ঝাড়ের পেছন দিকে যেখানে একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলে, সেখানে নাকী--সুরে কার যেন হাসির রেশ শুনতে পাওয়া যায়।

মা চমকে উঠে বসেন। ছেলের মাথায় হাত রেখে সারা রাত ধরে দুর্গা নাম জপ করতে থাকেন, কেবলি মনে হয় তার কোলের ছেলেকে কে যেন ছিনিয়ে নিতে আস্‌ছে!

সেদিন সন্ধ্যে থেকেই একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। দূর বনে

প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাক্‌ছে···মনে হচ্ছে যেন ওরাও খুব ভয় পেয়েছে। পাখ-পাখালীরা কখন যে গিয়ে যার যার বাসায় সেঁধিয়েছে···কেউ খবর রাখে না। গেরস্ত বাড়ীর গোয়ালগুলিতে গরুগুলো এমন ভাবে হামলাচ্ছে যে, মনে হয় তারা কোনো অশুভ ইঙ্গিত পেয়েছে। মাঝে মাঝে কাল-প্যাঁচার চ্যাঁচানি ভেসে আসছে। শ্মশানের দিক থেকে একটা শোঁ-শোঁ হাওয়া গাঁয়ের বুক চিরে উত্তর অঞ্চলের জলাভূমির ওপর দিয়ে বইছে। মনে হচ্ছে কোন প্রেতিনী বুঝি নিঃশ্বাস ফেলছে!

গাঁয়ের পথে আজ একটিও লোক নেই। কোনো বাড়ীতে একটি ছোট ছেলেও কেঁদে উঠছে না! হয়ত রুদ্ধ আতঙ্কে সবাই প্রহর গুন্‌ছে।

ঝণ্টুদের বাড়ীতে আজ সকলকে কি কাল-ঘুমে পেয়েছে—কে জানে! সন্ধ্যেবেলা উনুনে আগুন পড়েনি! বামুনদিদি ঘুঁটে কয়লা সাজাতে গিয়ে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরের ঘরে বাড়ীর কর্ত্তারা সন্ধ্যে থেকেই দাবা-পাশা খেলতে বসেন! তাদের চীৎকারে আশে-পাশের বাড়ীর লোকে ঘুমুতে পারে না। আজ আঁধার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দাবার ছক একপাশে সরিয়ে রেখে সবাই ফরাসের ওপর কেউ চিৎ, কেউ উপুড় হয়ে অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

ঝর-ঝর-ঝর—অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলছে—তারই একটানা শব্দের সঙ্গে তাল বজায় রেখে খানা ডোবায়ব্যাঙেরা আসর জমিয়ে তুলেছে। আকাশের সমস্ত তারা মেঘে ঢাকা পড়েছে। মাথার ওপর কাল-পুরুষ একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘট্‌বে বলে বুঝি এক চোখে দম বন্ধ করে প্রহর গণনা করছে। মায়ের পাশে অকাতরে ঘুমুচ্ছে ঝণ্টু। এমন ঘুম যে দেখে মনে হয়—ওর দেহে বুঝি প্রাণ নেই!!

আকাশের বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া, ঝিঁঝিঁর ডাক, ব্যাঙের শব্দ, প্যাঁচার চ্যাচানি আর কালপুরুষের নীরব ইঙ্গিত ওকে যেন এমন ঘুম পাড়িয়েছে যে, সে ঘুম আর ভাঙবে না।

কিন্তু হঠাৎ বেড়ার ধারে কার ফিসফিসে কথা শোনা গেল—ঝন্টু, উঠে আয়, জলার ধারে আজ মাছ থৈ-থৈ করছে! ঝন্টু এক মুহূর্ত্তে সচকিত হয়ে ওঠে।

আবার সেই ফিসফিসে চাপা গলার ডাক ভেসে এলো। উদাস দৃষ্টিতে ঝন্টু উঠে বসল।

কার ডাক—কোথায় যেতে হবে—কিচ্ছু জানে না, তবু সে মায়ের কোল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো পাগলের মতো। আবার সেই বাঁশ বনের কানাকানির মতো কার যেন আহ্বান! আজ আর পোলো নিসনে ঝন্টু; খ্যাপলা জালটা তাড়াতাড়ি নিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে আয়—

এই প্রহেলিকাময় নিশির ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। ঝন্টু খ্যাপলা জালটি কাঁধের ওপর তুলে নিলে, তারপর দরজার হুড়কোটা খুলে ফেলে উঠোনে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে কানে তালা লাগানো মেঘের গর্জ্জন—আর বাদুড়ের ডানার ঝট্‌পটি! কিন্তু মেঘের ডাকেও কারো ঘুম ভাঙলো না।

ছায়ামূর্ত্তির হাতছানিতে ঝন্টু জলার দিকে এগিয়ে যায়। পথে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে…তবু ওর পথ চল্‌তে কোনো অসুবিধে হয় না!

ওই যে, ওইখানে! কত মাছ ঘাই মারছে……। তুই দেখতে পারছিস নে ঝন্টু? এগিয়ে যা, ছুঁড়ে দে খ্যাপলা জাল—

অশরীরির নির্দ্দেশ শুনে ঝন্টু একেবারে জলের মধ্যে পা চালিয়ে দিলে। তারপর কচুরী পানার দামের মধ্যে তার দেহটা যে কোথায়

তলিয়ে গেল—কাক-পক্ষীতেও জান্‌তে পারলো না! শুধু ঝণ্টুর বাড়ীর কালো বেড়ালটা ওর মায়ের দরজার কাছে কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগলো! মায়ের কাল-ঘুম তবু ভাঙলো না!

পরদিন জেলেরা যখন ঝণ্টুর মৃতদেহটা টেনে তুল্লে, গোটা গাঁয়ের লোক একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

পাড়ার একজন বর্ষীয়সী মহিলা কপাল চাপড়ে বল্লেন, আহ্লাদী পোড়ারমুখী পেত্নী হয়েও ওকে ভুলতে পারে নি—তাই ত' রাহুর মতো ঝণ্টুকে কোলে টেনে নিলে।

বহু বছর পার হয়ে গেছে। এখনও গাঁয়ের লোকেরা একটু বেশী রাত্তিরে জলার ধার দিয়ে যেতে ভয় পায়!

শেষ রাত্তিরের দিকে কে যেন ওখানে কেঁদে-কেঁদে, এলো চুল উড়িয়ে, বুক চাপড়িয়ে ছুটোছুটি করে।